পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

নদের নিমাই।



আলোচনা সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।



প্রথম সংস্করণ।

 মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গাদাস লাইব্রেরী।

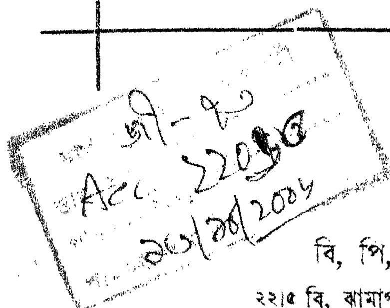
১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

গ্রন্থকার প্রণীত

ভক্তপ্রাণের অমিয় উচ্ছ্বাস

"প্রাণের ডাক"

(যন্ত্রস্থ)



বি, পি, এমস্ প্রেস।

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীআশুতোষ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

যে পবিত্র প্রাতঃস্মরণীয়
বর্দ্ধমান রাজবংশের নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিদিত,
যে রাজবংশ ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য নিস্কর-ভূসম্পত্তি দান করিয়া
ধন্য ও বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন ;—
মহামহিমার্ণব, মাননীয় মহারাজাধিরাজ

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ মহা[illegible]প বাহাদুর

সেই পবিত্রতম রাজবংশ সমলঙ্কৃত করিয়া
আজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং যাঁহার গুণ-গরিমায়
বিমুগ্ধ হইয়া
প্রবল প্রতাপান্বিত ভারত সম্রাট কে, সি, এস, আই, সি, আই, ই,
প্রভৃতি অশেষ সম্মানসূচক উপাধী-ভূষণে বিমণ্ডিত করিয়াছেন,—
যিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও বাণী-সেবায় প্রাণপাত করিয়াছেন,
সেদিন বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে যিনি অসীম ত্যাগ স্বীকার
করিয়া মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন,—
আমার

"নদের নিমাই"

তাঁহারই পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া
লেখনী ধারণ সার্থক করিলাম।

দুর্গাদাস লাইব্রেরী।
১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।
শুভ ১লা আশ্বিন রাধাষ্টমী,
সন ১৩৩০ সাল।

বিনীত—
শ্রী গ্রন্থকার।

উপহার

আমার পরম..

শ্রী..

....

করকমলে

নন্দের নিমাই

অর্পণ করিলাম।

....
....
তাং.......................

শ্রী..

নিবেদন।

যিনি বাঙ্গালার নিজস্ব অবতার, যাঁহার পবিত্র পদরেণু স্পর্শে এ দেশ ধন্য এবং নবদ্বীপ তীর্থে পরিগণিত হইয়াছে, আজ আমার সেই বড় সাধের—বড় আদরের গ্রন্থ "নদের নিমাই" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী উপন্যাসাকারে গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের অনেক প্রকার জীবনী ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের "নদের নিমাই" গ্রন্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহাতে আড়ম্বর কিছুই নাই। কেবল ভগবান শ্রীচৈতন্যের ভক্তিগাথা, অবতার-তত্ত্ব—যাহা শুনিতে ভক্তগণ সতত ইচ্ছুক, কেবল সেই সকল বিষয় প্রেম-ভক্তির ছাঁচে ঢালিয়া ভক্তগণের মনোরম করিয়া ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

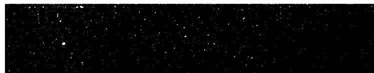
ইহা সকল সম্প্রদায়েরই আদরের বস্তু করিতে কিছুমাত্র পরিশ্রমের ক্রটী করি নাই। এক্ষণে আমার অন্যান্য পুস্তক—তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা প্রভৃতি সাধক-জীবনীর মত ইহার আদর হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমার "বর্ণাশ্রম", "সাধন মন্দির" প্রভৃতি প্রায় ৩০।৪০ খানি ধর্ম্মমূলক উপন্যাসও সাধারণের নিকট অতি প্রিয় হইয়া আমাদিগের

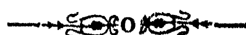
মধ্যেই চারি পাঁচ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমার এই "নদের নিমাই" ভক্তগণের প্রাণে তিলমাত্র ভক্তিভাবের উদ্রেক করিয়া সমাদৃত হইতে পারিলে, লেখনী ধারণ সার্থক মনে করিব। নিবেদন ইতি—

দুর্গাদাস লাইব্রেরী। ১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।	বিনীত— শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সংকীর্তনানন্দ ।



নদের নিমাই।



সূচনা।

ভাব বিনা ভাবনা হয় না। ভগবানকে ভাবিতে হইলে, ধ্যান-ধারণা উপাসনার দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে, ভাবের ভগবানে বিভোর হইয়া ডাকিতে না পারিলে, তাহাতে কোন ফল হয় না। ক ভাবের ঠাকুরকে হৃদয়স্থ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ সরোজের অমৃত ভক্তের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়ে, এই জন্য ভগবানের ভাবনায় ভ প্রধান। পরা-ভক্তিতেই ইহার জন্ম হইয়া থাকে।

ভক্তিশাস্ত্র এইজন্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পা ভাবের একভাবে মজিয়া ভক্তকে ভগবানের উপাসনা করিতে উপদে দিয়াছেন। একদিন শ্রীবৃন্দাবনধামে ব্রজগোপ গোপিগণ এই পা ভাবের ভাব-সাগরে ডুবিয়াই পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে, কেহ পুত্র ভাবে কেহ বন্ধু ভাবে, কেহ বা স্বামী ভাবে, আবার কেহ বা দাসানুদাস হইয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করতঃ জগতে ধন্য ও বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। তাই শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

ভগবানের লীলারসমাধুর্য্য শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেরূপ প্রকট হইয়াছিল, জগতে আর কোথাও তেমন হয় নাই। লীলারস-রসিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে যেরূপ ভাব-প্রমত্ত হৃদয়ে আপনার লীলাখেলা প্রচার করিয়া ব্রজবাসিকে তথা জগৎকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, ঐ সকল ভক্ত যমন করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়াছিল এবং তিনি তাঁহাদের ভক্তিডোরে াবদ্ধ হইয়া যেরূপ বাঁধা পড়িয়াছিলেন, জগতের কোথাও কোন ভক্ত ার তেমন করিয়া ভগবান্‌কে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। জগতের তিহাস আর কোনও দেশ বা জাতিকে তাহার জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান রিতে পারিবে না।

ৃন্দাবন ধামে ভগবানের এই প্রেম-লীলার মাধুর্য্য প্রকট করিবার হইয়াছিলেন—একমাত্র শ্রীরাধিকা। তাঁহার তুল্য ভাবময়ী চূড়ামণি বৃন্দাবনে আর কেহ ছিল না, কেবল একমাত্র তাঁহারই ঞ-সাধন, আপনা ভুলিয়া কেবল তাঁহারই ভজন-সাধন, শ্রীকৃষ্ণকে ণের প্রাণ মহাপ্রাণ বুঝিয়া মধুর ভাবে প্রেম-সাগরে তাঁহারই আত্ম- র্জ্জন কেবল শ্রীকৃষ্ণ লীলাকে এত মধুময়, এত ভাবময়, এত প্রাণময় রিয়া তুলিয়াছিল। নন্দ-যশোদা ও অন্যান্য ব্রজগোপী এবং রাখাল বালকগণের ভাব-সাধনা শ্রীমতীর আত্মভোলা ভাবের নিকট অতি তুচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তিনি জগতে আর কিছুই দেখিতেন না। শাশুড়ী-ননদী, আত্মীয়-স্বজন, স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধ একমাত্র সেই জগৎস্বামীতেই আরোপ করিয়া কৃষ্ণময় পুরুষ কেবল জগতে তিনি আর নিজেমাত্র রমণী ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সাগরে অস্তিত্ব হারাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণ-জ্ঞান, কৃষ্ণই জীবন, শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মস্পর্শী বাঁশীর স্বর শুনিলে শ্রীমতী

...া করিয়া আব স্থির থাকিতে পাবিতেন না, উধাও হইয়া বাটীর বাহি... পড়িতেন। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশীও আর কোন বুলি বলিতে জানিত না, সেও কেবল রাধাস্বরে বাঁধা থাকিয়া, যখন তখনই রাধা রাধা বলিয়া বাজিয়া উঠিত। শ্রীবাধাও সকল বাধা-বিপত্তি, লজ্জা-ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানেব শরণাপন্ন হইতেন।

শ্রীবাধা মহাশক্তি, শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। অগ্নি আর তাহার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ, তেমনি শ্রীরাধা ও শ্রীভগবানে অভেদ আত্মা, কেবল লীলা বিস্তারের জন্য স্বতন্ত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তিনি শক্তি না দিলে তাঁহাকে বুঝিতে বা জানিতে পারে কে? এইজন্য বাধা-শক্তিব দ্বাবা শ্রীবৃন্দাবন লীলা এত মধুময় হইয়াছিল। ভগবানের ভাব সাগবে ডুবিয়া আপনাহাবা হইয়া কেমন করিয়া সাধনা ক... হয়, শ্রীমতী তাহাই দেখাইয়াছিলেন। যাহারা বুঝেনা, সাধন-ভজ... ক্রম-বিকাশ যাহাদের হৃদয়ে হয় নাই, তাহারাই কেবল এই অমৃত-ম... লীলাকে স্ত্রীপুরুষ প্রসঙ্গ বলিয়া নিন্দা করে।

ভক্ত ভিন্ন ভগবানকে বাঁধিতে পারে না। ভক্তের ভক্তি...রে বাঁধা হইয়া তিনি নন্দের বাধা মাথায় বহিয়াছিলেন, আর শ্রীমতীর প্রেম ঋণে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"। বাস্তবিক ভক্তের হৃদয় বৃন্দা...' পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের যাইবার ক্ষমতাই কি, আর স্থানই বা কো...।

...ন এই শ্রীকৃষ্ণ লীলার ... ভক্ত যখন প্রাণের ... দথিতে ন... ন প্রাণ ছট্ ফট্ করে,

ভবন শূন্যময় দেখে। একদিন শ্রীমতী তাঁহার প্রাণ পুতলীকে হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে না পাইয়া বাহিরে দেখিবার জন্য পুরুষ সন্ন্যাসীর বেশে গোষ্ঠের পথে আসিলেন। প্রাণ যায় যায়, মন হু হু করিতেছে, দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যা বিবশা শ্রীমতী বিভোর চিত্তে আনমনে পথপার্শ্বে দাড়াইলেন।

ভক্তাধীন ভগবান পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীমতীর আবেগ-ভরা ভাব দেখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সোণার কমলকে নিভৃতে গোষ্ঠের পথে তেমনি করিয়া ফুটিতে দেখিয়া প্রেমাকুলিত কণ্ঠে আবেগ ভরে বলিলেন—কিশোরি! প্রেমময়ী! তোমার মত ভক্তকে পরীক্ষা করিতে গিয়া আমি নিজেই পরীক্ষিত হইলাম। এখন বুঝিলাম—তোমার তুল্য ভক্ত এ ব্রজধামে আমার আর কেহই নাই। তুমি মধুর ভাবে বিভোর হইয়া, নিজের নিজত্ব ভুলিয়া আমাকে যেরূপ ভাবে বাঁধিয়াছ, আমাময় হইয়া আমাকে যেভাবে আবদ্ধ করিয়াছ, এযুগে সে প্রেমের প্রতিদান করিবার কিছু নাই। ভক্তের ঋণ অপরিশোধ্য হইলেও দারুণ কলিযুগে যখন জীব পাপে মগ্ন হইবে, ধর্ম্মের গ্লানী করিবে, তখন তোমারই নাম ইষ্টমন্ত্র করিয়া তোমারই স্বরূপে নব ব্রজধাম নদীয়ায় গৌরাঙ্গরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া তোমারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। একাধারে রাধাশ্যাম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর সাজে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইব। হৃদয় তো[illegible] করিয়া বাহিরে তোমার ঐ মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখি[illegible] আরাধ্য হরি নাম বি[illegible]ইয়া জীবের উদ্ধার সাধন ক[illegible] করিলাম।

দ্বাপরযুগে শ্রীমতীর নিকট এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত তিনি যাহা বলিয়াছেন ঃ—

পরিত্রাণায় সাধুণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

এই বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য যখন ভারতে হিন্দু লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, যখন মুসলমানগণের অত্যাচারে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, খোল করতালের আওয়াজ শুনিলেই যখন কাজীর কোটালগণ আসিয়া দারুণ অত্যাচার করিত, ভক্ত বৈষ্ণবগণকে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের নাম-সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিত, অশেষ প্রকারে ধর্ম্মের গ্লানি করিত; সেই সময় শ্রীভগবান মহাপ্রভু নদীয়ায় গৌরাঙ্গরূপে অবতার গ্রহণ করতঃ মহাশক্তি শ্রীরাধার শক্তিতে পূর্ণ শক্তিমান হইয়া কিরূপে ধার্ম্মিকগণকে অভয় দান করিয়াছিলেন, প্রেমময় হরি নামের প্রবল বন্যায় কিরূপে দিকদেশ প্লাবিত করিয়া ধ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আজ আমরা শ্রীভগবানের সেই অমিয় লীলামৃত বিবৃত করিতে অগ্রসর হইতেছি।

ত্রিলোকারাধ্য ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করি এমন ক্ষমতা ত নাই। অতি দীন, ভক্তিধনে নিতান্ত হীন হইলেও আমার ভরসা আ প্রকৃতি অধম, পতিত জনের প্রতি পতিত-পাবন ভগবানের কৃপাঃ নাই। তাঁহার কৃপা-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র লাভ করিয়া যখন দুরাচারী ও মাধাই সমস্ত পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া কত অসাধ্য সাধ গিয়াছে; কত মহাপাপী তাঁহার কলিকলুষ-নাশন যখন জগতীতলে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইয়া

র নিমাই।

বল তাঁহার। সেই মুক্তি-মূলাধার, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর পাদপদ্ম
। তাঁহারই চরিত-কথামৃত লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।
। বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তথাপি যাঁহাব
গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, যাঁহার কৃপায় মূখ বাচাল হয,
রই কৃপায় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য লীলা "নদের নিমাই" চরিত্র
চনা করিয়া ধন্য হইবার বাসনা করিয়াছি। শক্তি আমার নহে, সেই
মহাশক্তিরই শক্তি, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু"।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিশ্রের বিবাহ।

নবদ্বীপ যখন ভারতের বিদ্যাপীঠ, যখন দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র এই বিদ্যাপীঠের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞান-গৌরব-সৌরভ মণ্ডিত হইয়া যখন 'নবদ্বীপ' ভারতের শিরোভূষণরূপে সমস্থিত, তখন শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা গ্রাম হইতে জগন্নাথ মিশ্র নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ছাত্র পাঠার্থী হইয়া এখানে রামভদ্র ভট্টাচার্য্যের টোলে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আসিলেন।

নবদ্বীপ তখন বিদ্বজ্জন সমাজের শিরোমণি ছিল। যিনি যেখানেই বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসুন না কেন, নবদ্বীপে আসিয়া পরীক্ষা না দিলে, তিনি পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন না, তাঁহার পাঠ পরিসমাপ্তিও হইত না। এসময় নবদ্বীপের যেরূপ অবস্থা ; যেরূপ উন্নতি, যেরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি ; সেরূপ অবস্থা, সেরূপ উন্নতি কোন দেশের কোন কা[illegible] বলিয়া শুনা যায় না। বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপ উঠিয়াছিল ; বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জ্ঞানলাভ কর[illegible] লাভের আর অন্য উপায় নাই। ইহাই তাঁহাদের [illegible] তাই তাঁহারা উন্মত্ত হইয়া মানবজীবনের প্রধ[illegible] প্রাণপাত করিয়াছিলেন।

র নিমাই’ই।

বল বদ্বীপের চারিদিকে টোল, প্রত্যেক স্বনামখ্যাত অধ্যাপকেরই ।নজ চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতে দেশী ও বিদেশী ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত। কত দেশদেশান্তর হইতে ছাত্র আসিয়া এখানে বাসা করিয়া থাকিত, অনেকানেক বৃদ্ধও আসিয়া এখানের পবিত্র মাটিতে বাস করিয়া পূজনীয় অধ্যাপকগণের নিকট শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিয়া ধন্য হইত। সে সময় নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধবনিতা, শাস্ত্রালাপ ব্যতীত আর কিছুই জানিত না, জীবনে যে আর কোন মুখ্য কার্য্য আছে, তাহাও তাহারা বুঝিত না।

বিদ্যাশিক্ষা না করিলে জীবন ব্যর্থ। হাজার রূপবান, গুণবান ও অর্থবান হইলেও বিদ্যাহীনের কোন প্রকার আদর ছিল না। বিদ্যাবান হইলেই সে সকল গুণের আধার, তাই সকলেরই ইচ্ছা তখন পুত্র পণ্ডিত হয়, বিদ্যাহীন হইয়া অন্যরূপ উন্নতি তখন কাহারও পছন্দ হইত না। একজন দীন দরিদ্র পণ্ডিতকে ধনীগণ কন্যাদান করিয়া কৃতার্থতা বোধ করিত কিন্তু বিদ্যাহীনে কন্যাদান করিতে কেহ রাজী হইত না, বিত্ত-বিভবশালী হইলেও সে জামাতা করিবার উপযুক্ত বলিয়া কাহারও বোধ হইত না।

’দ্বীপে লোক সংখ্যা অত্যধিক। পূর্ব্বে বলিয়াছি দেশবাসী
’দেশী ছাত্র আজ নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছে।
ত্ত যখন ছাত্রগণ গঙ্গার ঘাটে আসিত, তখন অপর
’ন হইত না। স্নানের পর ভিন্ন ভিন্ন টোলের
’লে বাস্তবিক মনে হইত, ভারত ভিন্ন বিদ্যাচর্চ্চার
এই বিদ্যাযুদ্ধে এত বাক্‌চাতুর্য্য হইত

যে সময়ে সময়ে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। ন্যায়শাস্ত্র শাস্ত্র, ইহার তর্কযুদ্ধ বড় ভয়ানক; ইহার জটিল বিষয়ের ' . সহজে মীমাংসিত হইবার নয়, কাজেই মনোমালিন্য পদে পদে। ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার জন্যই নবদ্বীপ তখন বিশেষ বিখ্যাত ছিল।

অন্যান্য শাস্ত্রও যে এখানে পড়া হইত না—এমন নহে। যখন নানা শাস্ত্রীয় পণ্ডিত টোল করিয়া বসিয়াছেন, তখন অপরাপর শাস্ত্রও সম্যক্‌রূপ অধীত হইত। তবে ন্যায়শাস্ত্রের মর্য্যাদাই বেশী ছিল, কারণ তখন মিথিলা ভিন্ন অপরস্থানে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা হইত না। পুঁথিও ছিল না। মিথিলার পণ্ডিতগণ এদেশীয় ছাত্রকে পড়াইতেন বটে, কিন্তু পুঁথি দিতেন না। রামভদ্রের চতুষ্পাঠীতে সামান্যরূপ ন্যায়ের অধ্যাপনা হইত বটে কিন্তু গ্রন্থাভাবে সময়ে সময়ে বহু বিঘ্ন সমুপস্থিত হইত। এই টোলে তখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি অনেক সুবিখ্যাত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। তখন মিথিলা ভিন্ন বিশিষ্টভাবে ন্যায় চর্চ্চা আর কোথাও হইত না। এই অভাব দুরীকরণার্থ বাসুদেব মিথিলায় গমন করিলেন। এবং ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে টোল খুলিলেন। বহু ছাত্র জুটিল বটে কিন্তু বাসুদেব বেশীদিন নবদ্বীপে অবস্থান করিতে পান নাই। উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা শ্রীপ্রতাপ রুদ্র গজপতি তাঁহাকে সমাদরে লইয়া নিজ দেশে টোল স্থাপন করাইয়া বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম পুরীধামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেও নবদ্বীপের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হইল না, রঘুনন্দন, রঘুনাথ, ভবানন্দ — জগন্নাথ প্রভৃতি ছাত্রগণ স্থানমাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে রক্ষ

র নিমাই।

বঙ্গভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও তখন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ...বিশারদ, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ইহাঁরাও পণ্ডিত বড় কম ছিলেন না। কবির পর ভবানন্দ ও রঘুনাথের মত ন্যায়ের অধ্যাপক জগতে আর কেহ হইতে পারে নাই। স্মৃতির অধ্যাপক রঘুনন্দনের তুল্য স্মার্ত্ত আর কয় জন ছিল? ইনি স্মৃতিশাস্ত্রকে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বিভাগ করিয়াছিলেন। ইহাঁরই ব্যবস্থা এখনও বাঙ্গালা দেশে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বৈদিক ব্রাহ্মণ। টোলের দ্বারাই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, তাঁহার দুই পুত্র, দুই কন্যা। কন্যা দুইটী বড় হওয়ায় নীলাম্বর বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ তাঁহাদের স্বঘর ও সুপাত্র পাওয়া বড় কঠিন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁহারই সমব্যবসায়ী রামভদ্রের টোলে পড়িত, ছাত্রটী খুব মেধাবী, সামান্যদিন পড়িয়া সকল শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পাণ্ডিত্যের জন্য পুরন্দর উপাধিও লাভ করিয়াছে। যুবক বিদ্যাবুদ্ধিতে যেমনি গুণবান, রূপেও তেমনি অতুলনীয় ছিল। নবদ্বীপে তাহার মত সুপুরুষ আর কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এবং তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে জাত্যংশে ভরদ্বাজ বংশীয় মহা কুলীন ছিলেন।

নীলাম্বর এই পাত্রকেই নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যা শচীদেবীকে সম্প্রদান করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট এই ...স্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনিও জগন্নাথকে ইহার জন্য অনুরোধ ... রাজী হইলেন। কারণ নবদ্বীপে থাকিতে হইলে একটা ...ব এখানকার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। সমাজে

যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, কাজেই জগন্নাথ তাহাতে সম্মতি দান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শুভদিনে শুভক্ষণে নীলাম্বরের জ্যেষ্ঠাকন্যা শচীদেবীর সহিত জগন্নাথ মিশ্রের শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। জগন্নাথ অপরূপা ভার্য্যা পাইয়া মায়াপুর নামক ভিন্ন পল্লীতে তাঁহার স্বদেশবাসিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তখন বহু শ্রীহট্টীয় নদীয়ার মায়াপুরে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পত্নীসহ তাহাদের নিকট বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া জগন্নাথ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন নামক আর একটী সুপাত্রে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

এখনকার মত তখন খাওয়া পরার জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না সংসার কেমন করিয়া চলিবে—সে চিন্তা কাহারও ছিল না; কারণ তখন মানুষ এত বাবু হয় নাই, বিলাসিতা দেশবাসীকে এত দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরে নাই। তখন মোটাভাত, মোটা কাপড়েই লোক সন্তুষ্ট থাকিত, অভাব বলিয়া কিছু জানিতে পারিত না, তাই জড়বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতি মন না দিয়া, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিত। বিদ্যা অধ্যয়নে অবিদ্যা নাশ করিয়া ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত করা তখন প্রায় অধিকাংশ মানবেরই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

জগন্নাথ মিশ্র ছন্দানুবর্ত্তিনী পত্নী লাভ করিয়া মনের আনন্দে জ্ঞানানুশীলনে এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেশে পিতা মাতা সকলেই ছিলেন কিন্তু তিনি

করিয়া পুত্রটী রূপের আধার হইয়াছিল, এক্ষণে জন্মপত্রিকার গণনায় নামও ঠিক হইল—বিশ্বরূপ। শিশু ক্রমশঃ বালক অবস্থা প্রাপ্ত হইল, নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিল। অল্প বয়সেই বালক ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল। তারপর ক্রমশঃ নবম বর্ষে পদার্পণ করিলে জগন্নাথ তাহার উপনয়ন প্রদান করিলেন।

এই সময়ে নবদ্বীপে বৈষ্ণব সমাজকে হীনবল করিয়া তান্ত্রিকগণের প্রবল প্রতাপ সূচিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে, বড় বড় পণ্ডিতের প্রাদুর্ভাব হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিকে টলাইয়া দিয়াছিল। তখন জ্ঞান ও কর্ম্মকে অবহেলা করিয়া "সহজ ভজন" ও নারীসঙ্গ দ্বারা বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। এদিকে তান্ত্রিকগণের মধ্যেও পণ্ডিতের অভাব ছিল না; তাহারা এই সময় মাথা নাড়া দিয়া উঠিলেন। যাগ যজ্ঞ, মন্ত্র, মূর্ত্তি প্রভৃতি দ্বারা ভগবতীর উপাসনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। বাড়ী বাড়ী দুর্গোৎসব হইতে লাগিল। ভদ্রলোক মাত্রেই শক্তি-উপাসনায় মত্ত হইলেন। এই শক্তি-উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের পরাধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন করা। অন্যান্য উপাসক যাহারা ছিলেন, সংখ্যায় তাঁহারা অল্প, কাজে কাজেই তাঁহাদের প্রভুত্ব সমাজে থাটিল না।

ব্রাহ্মণগণই সমাজের কর্ত্তা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সকলেই মহা পণ্ডিত, যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা তাহার কূটতর্কে, বিচার-বুদ্ধির বাক্যবিন্যাসে সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দিতে লাগিলেন। বেশী পণ্ডিত হইলে যুক্তিতর্কে প্রায়ই নাস্তিক হইয়া পড়িতে হয়। ধর্ম্মকর্ম্মে

জগন্নাথের পিতা উপেন্দ্র মিশ্র এবং জননী শোভাদেবী পরম রূপবান, আনন্দবর্দ্ধন পৌত্রকে পাইয়া পুলকিতচিত্তে মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিলেন, কোলে পীঠে করিয়া কত আদর করিলেন, বুকের ধন বুকে করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূমাতাকে প্রাণের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"মা! জন্মায়তী হইয়া ধর্ম্মের সংসার স্থাপন কর; স্বামীপুত্র লইয়া স্বর্গের সুখ মর্ত্তে অনুভব কর।" তারপর পুত্রকে ডাকিয়া বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার কৃতকার্য্যতার সংবাদ লইলেন। পুত্র ভূস্বর্গ জন্মভূমির পবিত্র ক্ষেত্রে, আবাধ্য জনক জননীর পদতলে শিক্ষার সাফল্য জ্ঞাপন করিয়া পদধূলি লইলেন।

কয়েক দিন খুব আনন্দ-কোলাহলে কাটিল। উপেন্দ্রের পৌত্র ও পুত্রবধূকে দেখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলেই সুখী হইল, আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—"জগন্নাথ যেমনি, বধূটীও ঠিক তাহার অনুরূপা হইয়াছে, এতদিন পরে ভগবান স্বর্গের চাঁদ ধরিয়া তাদের কোল যোড়া করিয়া দিয়াছেন, আহা! বিশ্বরূপ আমাদের বেঁচে থাক, আমাদের চুলের মত পরমায়ু লাভ করুক!"

জগন্নাথ বহুদিনের পর দেশে যাইয়া বন্ধুবান্ধবের আনন্দ বর্দ্ধ করিতে লাগিলেন। শ্রীহট্টবাসী সকলেই জগন্নাথের পাণ্ডিত্য; তাঁহ শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, তাঁহার জ্ঞান-গরিমা ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সকলেই তাঁহা ধর্ম্মকর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তন্ত্রের প্রাধান্যই স্বীকার ক এবং আশু সিদ্ধি লাভের জন্য সকলকেই তন্ত্র মতে দেবদেবী করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশামৃত

সকলেই যার-পর-নাই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু এই আনন্দপূর্ণ ভোগ তাহাদিগের ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

জননী শোভা দেবী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার বধূমাতার গর্ভে শ্রীভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, সমস্ত রাত্রি আনন্দে তাঁহার নিদ্রা হইল না। পরদিন তিনি স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া জগন্নাথকে সস্ত্রীক নবদ্বীপে যাইতে বলিলেন, কারণ এ গর্ভে যখন ভগবান স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নদীয়ার মত পবিত্র স্থানে প্রসব হওয়াই কর্ত্তব্য। এখানে লোকজনের অভাব, তিনি একে বৃদ্ধা, তায় রোগগ্রস্তা, পাছে গর্ভের কোন অনিষ্ট হয়, নদীয়ায় বধূর পিতামাতা সকলেই বর্ত্তমান; সেখানে লোকজনের অভাব হইবে না। আর রমণীগণের প্রসব কার্য্যটা জননীর নিকট হওয়াই ভাল, তাহা হইলে গর্ভিণী সমস্ত দুঃখকষ্ট জননীর নিকট খুলিয়া বলিতে পারে, সঙ্কোচের কোন কারণ থাকে না, তাই শোভাদেবী পুত্রকে নবদ্বীপে আসিতে সৎপরামর্শ দিলেন। দেশ ছাড়িয়া এত শীঘ্র গন্নাথের আসিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পত্নীর এই সঙ্কট সময়ে জননীর পদেশে, তিনি পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিমাইয়ের জন্ম।

১৪০৬ শকের মাঘমাসে পূণ্যপ্রতিমা, পরম সৌভাগ্য-শ।।. গর্ভধারণ করিয়া ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূণ্যদা দে. তিথিতে, যে দিন সুনীল অম্বরে পূর্ণচন্দ্র যোলকলায় আবির্ভূত রূপেরহাটে আপনাপনি রূপের বিকিকিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, চা্দি সুবিমল শোভায় সুশোভিত হইয়া, যখন ধরার শ্যামাঞ্চল শোভা মণ্ডিত করিয়াছিল। আবার চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে যখন প্র' হরি-নাম ধ্বনিত হইয়া গ্রামখানিকে আনন্দ মুখর করিতে ঠিক সেই সময়ে, সন্ধ্যাসুন্দরী সুনির্ম্মল পবিত্র বেশে মাটীতে নামিব কিয়ৎক্ষণ পরে বিজ্ঞজন পরিশোভিত, পুণ্যতোয়া জাহ্নবী পুলিনস্থ নবদ্বীপ নগরের মায়াপুর গ্রামে, পুণ্য-প্রবীণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া অকলঙ্ক গৌরাঙ্গদেব ভুভার হরণ করিতে জননীর গর্ভচ্যুত হইলেন। শ্রীরাধার কলঙ্ক মোচন করিয়া যিনি অকলঙ্ক করিয়াছিলেন যিনি নিজে সকল পবিত্রতার আধার—নিস্কলঙ্ক, তিনি স্বয়ং অবতী হইয়া জীবের সমস্ত কলঙ্ক মোচন করিবেন, পৃথিবীর জীবকে নবজীবন দ করিবেন। এইজন্য জগতে সকলঙ্ক চন্দ্রের প্রয়োজন হইবে না বা বুঝি দৈত্যধর্ম্মী রাহু রোষ পরবশ হইয়া, সেদিন ক্ষিপ্ত আক্রমণে ধবল জ্যোতিঃ শশধরকে আক্রমণ করিয়া তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করি

'ার নির্দ্দিষ্টকাল কিন্তু আদরের দুহিতা
হইল, তথাপি প্রসব হইলেন না দেখিয়া, সকলেই
পিতা নিলাম্বর চক্রবর্ত্তীও সাতিশয় চিন্তিত হইয়া
তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। গণনা
-ভাগ্যবতী শচীমাতার গর্ভে ভগবান জন্ম লইয়াছেন।
তার সৌভাগ্যে পিতার আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল। তিনিও
ধন্যজ্ঞান করিয়া জন্মতিথির প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং
বর দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া নবপ্রসূত দৌহিত্রের অনুপম
নশশাঙ্ক দর্শন করতঃ কৃতকৃতার্থ হইয়া জাতকফল গণনা করিয়া
লেন—পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্রে, সিংহরাশিতে, দেবগণে শিশু ভূমিষ্ট
ছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এমন শুভযোগ মহাপুরুষ না হইলে
হার ভাগ্যে হয় না।

জগন্নাথ মিশ্রের আঙ্গিনায় একটী সুবৃহৎ নিম্ব বৃক্ষ ছিল, তাহার তলদেশেই আতুর ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু ভূমিষ্ট হইয়াই অচৈতন্য হইয়াছিলেন। ধাত্রী ও উপস্থিত পরিপক্কা গৃহিণী সকল শশব্যস্তে শিশুর জীবন সঞ্চারের জন্য দুই একটী সামান্য টোট্‌কা প্রয়োগ করিবামাত্রই শিশুর চৈতন্যোদয় হইল। বেশীদিন গর্ভে ছিলেন বলিয়া, শিশুর আকৃতি কিছু বড় এবং বর্ণ ঠিক কাঁচা সোনার মত দেখিয়া কলে বড়ই আনন্দিত হইলেন। মৃতবৎসা জননীর পুত্র হইলে কত কে কতপ্রকার নাম রাখিয়া থাকে। জগন্নাথ আনন্দ-আপ্লুত হৃদয়ে বাহিত নয়নে, গদগদবচনে পুত্রের নাম রাখিলেন—বিশ্বম্ভর, কিছু ষতনে পত্নীকে কষ্ট দিয়া প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পুত্রের

এই নাম রাখিলেন এবং মনে মনে বিশ্বম্ভর নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার দাদা ও আত্মীয়গণ তাঁহাকে এই নামেই ডাকিত। শচীদেবী পুত্রের চন্দ্রবদন, তাহার সেই অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া [illegible] কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। সোণার শিশুকে কোলে লইয়া, পাছে তাঁহার সেই প্রাণকুমারের প্রতি কেহ নজর দেয়, হিংসা করে, এইজন্য নিম্‌তিক্ত আর সেই বৃক্ষ তলায়ই তিনি এই শিশু প্রসব করিয়াছেন, বলিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য পুত্রের নাম রাখিলেন,—"নিমাই"। নবদ্বীপে প্রভু এই নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

প্রতিবেশী রমণীগণ শিশুর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া নাম রাখিলেন —"গৌর"। মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী এই সুলক্ষণযুক্ত শিশুর নাম রাখিলেন—"শ্রীগৌরাঙ্গ"। যে ছেলে বাপমায়ের যত আদরের, তার নাম তত বেশী হয়। কখন যে কি নামে ডাকিলে তাঁহাদের আশা মেটে, প্রাণে আনন্দ সঞ্চার হয়, তাহার স্থিরতা নাই। শিশুর সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধুর্য্য, তাহার সেই অনুপম সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া মনে যখন যে ভাব উদয় হইত, তখন তাঁহারা সেই অনুরূপ একটী প্রতি বাক্য দিয়া ডাকি আনন্দ অনুভব করিতেন, সেই বিম্বাধর সদৃশ ওষ্ঠাধরে আপন ওষ্ঠা স্থাপন করিয়া স্বর্গের সুখানুভব করিতেন। মাতৃদত্ত নাম "নিমাই" বলিয়াই সকলে পুত্রটীকে ঐ নামে ডাকিত এবং আদর করিত।

কোলের ছেলেটীর উপর জননীর স্নেহ কিছু বেশী হয়। এইজন্য শচী দেবী শিশুকে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতেন না। এই শিশুটীর বাল্যকাল হইতেই অনেক অলৌকিক গুণ দেখা গিয়াছিল। তাহার মধ্যে এসময়কার একটী বিস্ময়কর গুণ এই যে, শিশু অত্যন্ত রোদন

করিতেছে, কোন প্রকারে তাহাকে থামাইতে পারা যাইতেছে না, এমন সময় হরি নাম করিলেই বা রাধা নাম করিলেই শিশু ক্রন্দন ভুলিয়া যাইত, হাস্য আস্তে ছোট ছোট হাত পা গুলি ছুঁড়িয়া খেলা করিত। এইভাব দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইত। শচীদেবী আহারাদির পর পুত্র কোলে লইয়া আদর করিতেন। জগন্নাথ ও বিশ্বরূপ কাছে বসিয়া "যশোমতি" কোলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সহিত নিমাইয়ের জন্মের সৌসাদৃশ্য অনেক। পুত্র গর্ভকোষে থাকিবার সময়, যখন ভুমিষ্ট হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইতেছিল, সেই সময় জগন্নাথ কোন কোন দিন ভাবিত হইলে, শচী-দেবী স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঠিক দ্বাপরে কংশ কারাগারে দেবকীর গর্ভসঞ্চারের মত অলৌকিক কাহিনী সকল চুপে চুপে বিবৃত করিতেন। সময়ে সময়ে নিদ্রোত্থিতা হইয়া স্বামীকে ডাকিয়া বলিতেন—"দেখ, আমি নিদ্রা যাইতেছিলাম, স্বপ্নে দেখিলাম—যেন কে চতুর্মুখ, কে পঞ্চমুখ, কে ষড়মুখ, কে গজমুখ প্রভৃতি পুরুষমূর্ত্তি অপূর্ব্ব প্রভাজালে মণ্ডিত হইয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া শিশুর স্তুতি-পাঠ করিতেছেন। শুধু কি পুরুষ, ...ত দেবীস্বরূপিনী রমণীগণ কেহ অষ্টভূজা, কেহ দশভূজা, কেহ চতুর্ভূজা, তাঁহারা যেন স্তন বাড়াইয়া আমার গর্ভস্থ শিশুর মুখে দিয়া ধন্য হইতেছেন। আর একটি পরমা সুন্দরী চম্পকবরণী দ্বিভূজা রমণী আমার গর্ভকোষে অনন্তশয়নে নারায়ণের মত পদ্মাসনস্থ শিশুর পদযুগল হাসি হাসিমুখে নয়নের জলে ভাসিয়া সেবা করিতেছেন। স্বামীন্! প্রভূ! এই সকল অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে (অভাগিনী আমি) ভয় হয়, পাছে গর্ভস্থ শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়?" পত্নীর মুখে জগন্নাথ শিশুর এই সকল

অপূর্ব্ব লক্ষণ শুনিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া জন্ম সার্থক করিবার প্রার্থনায় ভগবানের চরণে কোটী কোটী মানসীক প্রণাম করিতেন এবং ভীরুস্বভাবা পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন—"ও সকল অমূলক চিন্তামাত্র, ইহার জন্য তুমি কিছু ভেবোনা বা ভয় করো না।", শচীদেবী এই স্তোকবাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া কিছুদিন পরে, নবদ্বীপ চন্দ্র নিমাইচাঁদকে পাইয়া, এক কালে সকল শোক, সকল সন্তাপ বিস্মৃত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাল্যলীলা।

নিমাইয়ের বাল্যলীলা অতি অদ্ভুত রকমের ছিল। সাধারণ বালকের সরূপ দেখা যায় না। নিমাই দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৰ্দ্ধিত হইয়া পিতামাতার আনন্দবৰ্দ্ধন করিতে লাগিল। যখন করচরণে শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখিল, তখন তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখা দায় হইল। শচীদেবী গৃহে রন্ধন করিতেন, শিশু আঙ্গিনায় খেলা করিয়া বেড়াইত। একটু চক্ষের আড়াল হইলেই সে বাহির হইয়া পলায়ন করিত, জননী সমস্ত কাজ ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে আটক করিতেন, বলিতেন—দুরন্তছেলে, এখনও তোমার পা হয় নাই, তবু এত প্রতাপ, চলিতে পারিলে না জানি কি করিবে, বলিয়া কোলে করিতেন এবং আদর করিয়া মুখচুম্বন করতঃ ঘরের মধ্যে পুরিয়া রাখিতেন। শিশু মধুর অধরে মৃদুহাস্য করিয়া মায়ের প্রাণে স্বর্গের সুধা ঢালিয়া দিয়া গৃহ মধ্যে খেলা করিত। সে খেলা বড় বিষম প্রকারের, জননী একটু সরিয়া যাইলেই, সে ঘটি গেলাস ফেলিয়া দিত, বড় বড় জলপূর্ণ কলস, গাড়ু ফেলিয়া ঘর জলময় করিত, জননী পুত্রের দুরন্তপনা দেখিয়া মাথা কুটিতেন। শিশু তাহাতে অতিশয় আনন্দানুভব করিয়া খল খল হাস্য করিত, দেখিয়া জননী যখন তাহাকে আদরের তাড়না করিতে যাইতেন,—অমনি দাদা বিশ্বরূপ আসিয়া "মা মেরোনা, মেরোনা," নিমাই চীৎকার করিলে থামান দায়

হইবে, এখনি হরি নাম করিয়া তাহার রোদন থামাইতে হইবে। তুমি স্থির হও, আমি দেখিতেছি” বলিয়া, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে কোলে লইয়া বলিতেন—“নিমাই, দাদা আমার, অত অন্যায় করিয়া কি বাপমাকে জ্বালাতন করিতে হয়, তা'হলে যে তোমাকে সকলে নিন্দা করিবে?” নিমাই এই অল্প বয়সেই দাদাকে বড ভয় করিত—ভালও বাসিত, বিশ্বরূপ কোলে করিলে শিশু আর কোন প্রকার দুরন্তপনা করিত না, দাদার কোলে উঠিয়া, কত অঙ্গভঙ্গি করিয়া খেলা করিত। বিশ্বরূপ বাড়ীতে থাকিলে নিমাই অনবরত দাদার কাছে কাছে ঘুরিত, আদৌ দৌরাত্ম্য করিত না কিন্তু বিশ্বরূপ ত আর সকল সময়ে ঘরে বসিয়া থাকিতেন না। তিনি সমস্ত দিন টোলে পড়িতেন, তারপর বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত শাস্ত্র-চর্চ্চায় দিন কাটাইতেন, বাড়ীতে মাত্র আহারের সময় আসিতেন। বিশ্বরূপ নিমাইকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—নিমাইয়ের বাল্যলীলা অতি আশ্চর্য্য। ছয়মাসে যখন নিমাইয়ের অন্নপ্রাশনের দিন ধার্য্য হইল, তখন আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়া জগন্নাথের বাড়ী আসিলেন। সকলে নানাপ্রকার সামগ্রী আনিয়া শিশুর খেলার জন্য রাখিয়া দিলেন। উত্তম বস্ত্র-অলঙ্কারে সজ্জিত নিমাই শয্যায় উপবেশন করিল, মাতামহ নীলাম্বর তাহার নাম-করণ করিলেন—“গৌরহরি”। সকলে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বালককে বসাইয়া তাহার নিকট ঐ সকল খেলনা দিলেন। সেই খেলনার মধ্যে একখানি “শ্রীমদ্ভাগবত” গ্রন্থ ছিল। সকলে দেখিতে লাগিল,—শিশু ইহার মধ্যে কোন্ দ্রব্যটী গ্রহণ করে। সেই ক্ষুদ্র শিশু সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া অগ্রে “ভাগবত” গ্রন্থখানি লইয়া নাড়া চাড়া করিল,

খুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাহা দেখিতে লাগিল। ক্ষুদ্র শিশুর এই কাণ্ড দেখিয়া পিতা-মাতা ও উপস্থিত জনমণ্ডলী অবাক্ হইলেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ বিদ্যাবুদ্ধিও ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শিশু চলিতে শিখিল। জননী শচীদেবী প্রতিদিন যশোমতীর মত পুত্রের বেশভূষা করিয়া দিতেন, পুত্র সুন্দব সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ ঠিকভাবে থাকিত, তার পব ধূলা মাটী মাখিয়া সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত করিয়া ফেলিত, দেখিয়া জননী আপুশোষে মৃদু তিরস্কার করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—নিমাইয়ের সমস্তই অলৌকিক ছিল। তাহাব রূপ অতি অপরূপ, হস্ত ও পদতল হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, চলিবাব সময় যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িত। নযনেব দৃষ্টি, মুখেব হাসি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব জ্যোতিঃ সমস্তই মধুময়, দেখিলে নয়ন ফিরাইতে পাবা যাইত না। যে তাহাকে একবার দেখিত, সেই অবাক হইয়া ভাবিত—মিশ্রের এ শিশুটী মানুষ না দেবতা?

নিমাই মাতাকে গ্রাহ্য কবিত না, মাতা ধম্‌কাইলে সে হাসিব চোটে .হা উড়াইয়া দিত, তবে পিতাকে একটু ভয় করিত আর ভয় কবিত—াদাকে। এইজন্য শচীদেবী তাহার দুরন্তপনা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রায়ই তাহাকে স্বামীব কাছে, না হয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে শয়ন করিতে দিতেন। পুত্রেব প্রতি শচীর বড় মায়া, এমন সুন্দর শিশুটীর পাছে কোন অমঙ্গল হয়, পাছে কোন অপদেবতায় আক্রমণ করে, এই জন্য শচীদেবী রাত্রে পুত্রকে নিজের কাছে রাখিতেন না। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণেব নিকট ত কোন অপদেবতার প্রভাব খাটিবে না,

এই জন্য প্রায়ই স্বামীর নিকট পুত্রকে শুইতে দিবার ব্যবস্থা করিতেন পুত্র যখন উঠিয়া পিতার নিকট যাইত, তখন তিনি পুত্রের শূন্যপায়ে সুমধুর নুপুর-ধ্বনি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, অপর দিক হইতে জগন্নাথ পুত্রকে লইতে আসিয়া ঐরূপ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন এবং নিমাই নিদ্রিত হইলে স্বামী-স্ত্রীতে পুত্রের কথা কহিতেন; জগন্নাথ বলিতেন—"তোমার স্বপ্ন দেখার বিষয় চিন্তা করিয়া এখন বোধ হইতেছে, নিমাইয়ের দেহে গোপালের আবির্ভাব হইয়াছে।" এ কথায় শচীদেবী আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে না করিয়া পুত্র স্নেহে অধীরা হইয়া বলিতেন—"যিনিই দয়া করুন, তাহার দেহে যিনিই বিরাজ করুন—আমার বাছার যেন কোন অনিষ্ট না হয়। বাছা যেন আমার সকল দেবতার দাস হয়ে 'হাড়াস্থি গোড়াস্থি' হয়ে বেঁচে থাকে।"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের দৌরাত্ম্য বাড়িতে লাগিল। সে কাহারও শাসন মানে না, প্রতিবেসী সকলের বাড়ীতে যাইয়া অত্যাচার করিতে লাগিল। পাড়ার সকলে বিরক্ত হইয়া পিতামাতার নিকট অভিযোগ করিলে, শচী ও জগন্নাথ তাহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পুত্রকে শাসন করিতেন। কিন্তু "চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" যখনকার তখনি—তার পরই নিমাই সমস্ত ভুলিয়া গিয়া আবার স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইত।

নিমাইয়ের বাটীর কাছেই গঙ্গার ঘাট। সকলেই প্রাতঃস্নান করিয়া গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যাহ্নিক করিত, স্ত্রীলোকেরা শিবপূজা করিত; নিমাই সেই সময় তাহাদের কাছে গিয়া পূজার দ্রব্যাদি নষ্ট করিত, ফুল-তুলসী

বিল্বপত্র লইয়া আপনি মাথায় দিয়া বলিত—"তোমরা আমার পূজা কর, আমি তোমাদের ঠাকুর।" সকলে বিরক্ত হইয়া মারিতে যাইলে—নিমাই এমন দৌড় দিয়া বাড়ী আসিত যে, কেহ তাহাকে ধরিতে পারিত না। মাতা শুনিয়া পুত্রকে শাসন করিতেন—নিমাই কাঁদিয়া অধীর হইলে শচী কোলে তুলিয়া মুখ চুম্বন করত বলিতেন—"হ্যারে নিমাই! তোর কি প্রাণে ভয় নেই বাবা, ঠাকুর দেবতার জিনিস কি অমন করে উচ্ছিষ্ট কর্ত্তে আছে, তাতে যে অমঙ্গল হবে, তুই প্রাণে বাঁচবি না?" বলিয়া মধুর বচনে বুঝাইয়া দিতেন। পুনর্ব্বার যাহাতে হ য়ার না করে, তাহার জন্য কত ভয় দেখাইতেন, প্রতিবেসীর বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিতেন। ইহাতেও আবার বিষম বিপদ হইত, নিমাইকে দুই একদিন দেখিতে না পাইলে পাড়ার সকলে জগন্নাথ ও শচী দেবীর নিকট বলিত—"কইগো, নিমাইকে যে আর খেলাতে দেখি নাই—তার কোনও অসুখ করে নাই ত"? সকলে নিমাইয়ের অত্যাচারে যেমন বিরক্ত হইত—দুই একদিন না দেখিলেও তেমনি আবার অস্থির হইয়া বাড়ীতে দেখিতে আসিত। নিমাইয়ের দর্শন, স্পর্শন, সঙ্গলাভ সকলের এমনি সুখকর, এমনি আনন্দদায়ক ছিল। সেই দেব শিশুকে দেখিলে সকলের প্রাণই আনন্দে নাচিয়া উঠিত—তাহার সুমধুর কথা শুনিলে কর্ণকুহর পবিত্র হইত, তখন সকলেই বলিত—ছেলেটা দুরন্ত হউক, কিন্তু দেখ্‌লে প্রাণ শীতল হয়, সে বাটীতে না আসিলে যেন সব ফাঁকা বোধ হয়,—এবার সে বাড়ীতে আসিলে আদর করো—আর তাড়না করো না। দুরন্তপনা করলে সকলে একটু সাবধান হইলেই সব গোল চুকিয়া যায়—দুধের ছেলে, বড় লোকের উপর কত বল

প্রকাশ করিবে? এইরূপে সকলে আসিয়া আবার নিমাইকে আদর করিয়া ঘরে লইয়া যাইত।

একদিন একটী বিদেশী ব্রাহ্মণ মিশ্রের বাটীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথ ও শচী দেবী এ সকল বিষয়ে বড়ই আগ্রহান্বিত ছিলেন। ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া সাদরে ঘরে তুলিয়া লইলেন এবং তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি বহু দূরদেশ হইতে আসিতেছি; দুই তিন দিন কিছু আহার হয় নাই; আমি স্বপাকে আহার করিব—তোমরা তাহার উদ্যোগ করিয়া দাও।" শচী দেবী তাঁহার প্রাণকুমারের মঙ্গল কামনায় ব্রাহ্মণের আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন—তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতঃ ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া দিয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। এমন সময়ে শচীনন্দন নিমাই অতি ধীরে ধীরে আসিয়া তাহা উদরস্থ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—নিমাই সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিয়াছে। তিনি জগন্নাথকে সমস্ত কথা বলিলেন—জগন্নাথ পুত্রকে তিরস্কার করিয়া পুনরায় ঠাকুরের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণও বালকের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় রন্ধন করিলেন—সেবারেও নিবেদনের সময় নিমাই আসিয়া তাহা উচ্ছিষ্ট করিল। এইরূপে তিনবার অন্ন প্রস্তুত হইল, নিমাই তিন বারই তাহা নষ্ট করিল, দেখিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণ ধ্যানস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলেন—এ বালক সামান্য নহে, তাঁহারই ইষ্টদেবতা আজ জগন্নাথের গৃহ আলোকিত করতঃ বালক বেশে তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করিতেছেন। বারবার তিনবার প্রীতিপূর্ব্বক

অন্ন ভোজন করিয়া তাঁহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণ ভগবানের চরণে অশেষ মিনতি-প্রণতি জানাইয়া সেই দেবদুর্লভ প্রসাদ ভক্ষণ করতঃ কৃত কৃতার্থ হইলেন।

জগন্নাথের গৃহে শালগ্রাম শীলা ছিলেন। প্রতিদিন তিনি তাহার পূজা করিতেন। তখন যে গৃহে নারায়ণ শীলা, চণ্ডীমণ্ডপ, তুলসী বৃক্ষ এবং গোশালা না থাকিত, তাহা হিন্দুর গৃহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত না। পূর্ব্বে হিন্দুগৃহস্থালীর এইরূপ নিয়ম ছিল, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের গৃহে এ সকল থাকা চাই—নতুবা সমাজে তাহার সম্মান রহিত হইত। প্রতিদিন জগন্নাথ গৃহ-দেবতার পূজা-ভোগ সমাপন করিলে—শচী দেবী গাত্র ধৌত করিয়া অতি পবিত্র ভাবে আসিয়া পূজা-গৃহে ইষ্টজপ করিতেন, পুত্রের মঙ্গল কামনায় কত প্রার্থনা করিতেন। শচী দেবীর অত্যন্ত শুচিবাই ছিল—তিনি একস্থান দশবার ধৌত করিতেন—গোময় দিয়া সমস্ত আঙ্গিনা পরিষ্কার করা, তাহার প্রাত্যহিক কাজ ছিল। তারপর ঠাকুর ঘর তিনি এমন প্রাণপণ যত্নে পরিষ্কার করিতেন—যাহা দেখিলে অতি বড় নাস্তিকেও সে গৃহে প্রবেশ করিয়া পূজা না করুক, কিছুক্ষণ বসিয়া প্রাণ জুড়াইতে ইচ্ছা করিত।

আজ স্বামীর পূজার পর শচীদেবী অতীব পবিত্র হইয়া দেবগৃহে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থা হইয়াছেন। এমন সময় নিমাই চুপে চুপে তথায় আসিলেন এবং শালগ্রাম শীলাটীকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া আপনি তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। জননীর ধ্যানভঙ্গ হইলে পুত্রের এই কাণ্ড কারখানা দেখিয়া তিরস্কার ও তাড়না করিতে গেলেন কিন্তু নিমাইয়ের সেদিনকার ভাব দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া তাহার

গায়ে হাত তুলিতে বা কোনরূপ তিরস্কার করিতে পারিলেন না, তাহার এক দৈব শক্তির আকর্ষণে তিনি অভিভূতা হইয়া স্বামীকে সং পরিচয় দিলেন। নিমাই

জগন্নাথ আসিয়া পুত্রের ভাব দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাহার এইভাব দর্শনে তিনি মনে মনে কত কি চিন্তা করিয়া পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করতঃ আশ্বস্ত হইলেন, নিমাইকে কিছু না বলিয়া পুনরায় দেব-শিলাকে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া, নানাবিধ স্তুতি-মিনতির দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া পুত্রের দোষ প্রশমনের জন্য আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বিশ্বরূপ বাটীতে আসিয়া ছোট ভাইয়ের ঐশ্বরিকতার আভাসে ব্যাকুল হইলেন, তাহাকে কোলে করিয়া বলিলেন—"নিমাই ভাই! তুমি এমন দুরন্ত হচ্ছ কেন, তোমার কি প্রাণের ভয় নেই? ঠাকুর দেবতার কাছে কি অমন দুষ্টামী করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পাপ দিবেন—তোমার কষ্টের একশেষ হইবে।"

অগ্রজের কোলে উঠিয়া নিমাই যেন চোরটীর মত শান্তভাব ধারণ করিল, নীরবে দাদার কাঁধে মাথা রাখিয়া যেন কত লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি—নিমাই কেবল দাদাকেই অতিশয় ভয় করিত, আর বিশ্বরূপ প্রাণের ভালবাসায় অনুজের এই অমানুষিক ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে তাহার সুন্দর বদনের স্বর্গীয় ভাব মণ্ডিত সৌন্দর্য্যের পানে তাকাইয়া আপনহারা হইতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যারম্ভ।

নিমাই পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ যথারীতি তাহার হাতে খড়ি দিলেন এবং প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বাল্যকালে যে বালক যত চঞ্চল হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেধাশক্তির পরিচয় তত বেশী পাওয়া যায় এবং চঞ্চলতা কমিয়া ক্রমশঃ শান্ত শিষ্টভাবে পরিণত হইতে থাকে।

নিমাইয়ের ও সেইরূপ হইয়াছিল। সংস্কৃত শিক্ষার নিয়মানুসারে প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথমে ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিতে হয়; নিমাইয়ের বিদ্যারম্ভ হইবার কিছু দিন পরে তাহার অলোক সামান্য প্রতিভার প্রকাশ হইতে লাগিল। সে এই অল্প বয়সে এই নীরস ব্যাকরণ, এমন সুন্দর ভাবে কণ্ঠস্থ করিতে লাগিল—যাহা দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

গৌরাঙ্গের স্বাস্থ্য খুব ভাল। একদিনের জন্যও তাহার শরীর কোন প্রকার অসুস্থ হইত না—এইজন্য সে প্রতিদিন প্রফুল্লচিত্তে পাঠাভ্যাস করিত—পাঠের সময় তাহার আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না। জগন্নাথ ও শচী দেবী পুত্রকে লেখা পড়ার জন্য তত বিরক্ত করিতেন না;—নিমাই বাঁচিয়া থাকুক, লেখা পড়া শিখিবেই—এই ত ভাবিলেন দুখের ছেলে।

অগ্রজ বিশ্বরূপ অনুজকে লইয়া সময়ে সময়ে বসিতেন—তাহার পাঠের পরীক্ষা করিতেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য মনে বলিতেন—এই দুর্ব্বোধ্য কঠিন ব্যাকরণ শাস্ত্র নিমাই এত ছোট বয়সে কেমন করিয়া এরূপ ভাবে আয়ত্ত করিল? আশীর্ব্বাদ সহকারে বলিতেন—নিমাই নিরোগ হইয়া বাঁচিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে যে একজন বড় পণ্ডিত হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সাধারণ মনুষ্য-শিশু এত অল্প বয়সে এরূপ কঠিন বিষয় সমাধান করিতে পারে না।—নিমাই কি তবে ক্ষণজন্মা?

পিতামাতা পুত্রকে হাতেখড়ি দিয়া পাঠারম্ভ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাহার জন্য যে কিছু চেষ্টা করা—নিমাই পড়িল কি না, বিদ্যালয়ে যাইতেছে কি ফাঁকী দিতেছে, সে বিষয় তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। কেবল বিশ্বরূপ সময়ে সময়ে বালককে কাছে বসাইয়া একটু আধটু নাড়া-চাড়া করিয়া বিশেষ সুখবোধ করিতেন, কোনরূপ জোর জবরদস্তি করিতেন না। এত ছোট বেলায় পাঠের জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিলে বালক বিগড়াইয়া যাইবে, হয়ত কোমল মস্তিষ্ক গুরুজনের অতিরিক্ত ভার সহ্য করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, স্বাস্থ্যহানী হইয়া শরীর নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নহে। এইজন্য নিমাই অহরহঃ দাদাকে পড়াইতে বলিলেও, তিনি বলিতেন—"সমস্ত দিন পড়া ভাল নয়,—তুমি এখন খেলা করগে।" দাদার অনুমতি পাইয়া নিমাই সঙ্গীগণের সহিত খেলাইতে যাইত।

এদিকে পিতামাতাও নিমাইকে অতিরিক্ত আদর দিতেন—কিছু বলিতেন না। কাজেই নিমাই আর তত পাঠে মন দিত না, সমবয়স্ক

বালকগণের সহিত আনন্দে নানা প্রকার খেলা করিয়া সময় কাটাইয়া দিত। নিমাইয়ের রূপ কাঁচা সোণার মত, গঠন প্রণালীও নিখুঁত। তাহার উপর তাহার জননী আঁটিয়া সাঁটিয়া কাপড় পরাইয়া, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদনখানি অলকা-তিলকাবৃত করিয়া দিতেন এবং বড় বড় কেশগুলির সংস্কার করিয়া তাহাতে চূড়া বাঁধিয়া দিতেন।

বালক এইরূপে যখন নাচিয়া নাচিয়া বয়স্যগণের সহিত গান গাহিতে গাহিতে আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইত, শচীদেবী তখন সমস্ত কাজকর্ম্ম ভুলিয়া অন্যান্য রমণীগণের সহিত হাততালি দিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেন। নিমাই হেলিয়া দুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিত, আর সকলেই মুগ্ধ নেত্রে দেখিত—জগন্নাথের আঙ্গিনায় একটী অপূর্ব্ব সোণার পুতুল নাচিতেছে, যেন ব্রজধামে নন্দের বাটীতে নন্দ-নন্দনের মধুর নৃত্য! তাহা দেখিয়া সকলে ভাবাবেসে চক্ষের জলে বুক ভাসাইত।

কখনও কখনও বয়স্যগণের সহিত এই ননীর পুতুল হরিবোল বলিয়া উদ্দাম নৃত্য করিত, শেষে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া রুদ্ধশ্বাস হইবার উপক্রম করিত। শচীদেবী শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া মৃদু মধুর তিরস্কারে বুকে তুলিয়া লইতেন, শ্রীঅঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে ঘরে লইয়া যাইতেন।

নিমাই বড় আবদারে ছেলে—বড় একগুঁয়ে। একবার যাহা আবদার ধরিত—তাহা না পাইলে আর রক্ষা রাখিত না। ননী দে, ননী দে, বলিয়া মায়ের আঁচল ছিঁড়িত—সময়ে সময়ে রাগে মাথার সুন্দর চাঁচর-চিকুর ছিড়িয়া রক্তপাত করিত। মাতা বলিতেন—"খোকা

করিস্ কি বাবা। তোর একদণ্ড তর্ সয় না, কাপড় চোপড় ছাড়ি দাঁড়া?" শচী চিরদিন বিষম শুচিবাই গ্রস্তা, নানা প্রকারে শুচি না হইলে, তিনি কোন কাজ করিতেন না। কিন্তু দুরন্ত পুত্রের জ্বালায় অস্থির হইয়া, আঁচড় কামড় খাইয়া শশব্যস্তে তিনি সেই ননীর পুত্তলী নিমাইয়ের হাতে নবনী প্রদান করিতেন। দিতে বিলম্ব হইলে, কোন বাধা না মানিয়া নিমাই স্বহস্তে তাহা গ্রহণ করতঃ ব্রজের গোপালের ন্যায় ছুটিয়া পলাইত এবং এক একবার পাছু ফিরিয়া দেখিত—জননী ধরিতে আসিতেছেন কি না।

পুত্র হাঁড়ি ছুঁইল—কোন বাধা মানিল না দেখিয়া, শচী বিষম রাগান্বিত হইয়া বলিতেন—"আচ্ছা যাও, একথা হয় কর্ত্তা আসিলে, না হয় তোমার দাদা আসিলে আমি নিশ্চয় বলিয়া দিব, তখন তোমার কি শাস্তি হয় দেখিও।" নির্ভীক শিশু মধুর অধরে লজ্জা-ভয়-মিশ্রিত একটু মুচ্‌কি হাসিয়া পলায়ন করিত। নিমাই বাড়ীতে যেমনি, পাড়ায়ও তেমনি কাহার হার্ দার মানিত না, সকল গৃহস্থকেই জ্বালাতন করিত। কিন্তু তাহারা এখন আর শচীদেবীর কাছে কোন প্রকার অভিযোগ উপস্থিত করিত না, কারণ তাহা হইলে যদি জগন্নাথ তাহার শ্রীঅঙ্গে সাট মারেন, আর শচীদেবী বিরক্ত হইয়া যদি তাহাকে বাঁধিয়া রাখেন—তাহা হইলে ত নিমাই বিষম কষ্ট পাইবে—আর এমন করিয়া তাহাদের আঙ্গিনায় নাচ-গান করিয়া খেলা করিতে আসিবে না। এইজন্য প্রতিবাসীরাও নিমাইয়ের অত্যাচার যে অবাধে সহ্য করিত না—এমন নহে।

পড়া শুনায় আর কিছুমাত্র মন নাই—কেবল খেলা। নিমাই

গঙ্গাতীরে বালক বালিকাদিগের সহিত কেবল খেলা করিত। এই সময় বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীও তাহার সহিত খেলাইতে আসিতেন—দুইজনে বড় ভাব হইয়াছিল।

একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিত জগন্নাথের সহিত পথে দেখা হইলে বলিলেন—"নিমাই আর পড়িতে আসে না কেন? আজ প্রায় মাসাবধি হইল সে এদিক মাড়ায় নাই। পিতা যদিও পড়ার জন্য পুত্রকে বেশী চাপ দিতেন না—তথাপি তিনি জানিতেন, নিমাই প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়, কামাই করে না। শিশু বয়সে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হওয়াটা বড় দোষ। বালক যত পড়ুক আর নাই পড়ুক, বিদ্যালয়ে যাওয়া চাই, তাহাতে আসক্তি বাড়ে এবং উত্তর কালে পাঠে মনোযোগ দিবার সুবিধা হয়।

পিতা যখন শুনিলেন—পুত্র আজ একমাস অনুপস্থিত—বিদ্যালয়ে যায় না, তখন তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বাড়ী গেলেন এবং পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নিমাই কোথায়? শচী দেবী কৃত্রিম রাগে বলিলেন—আমি ঘরের কাজ করিতেছি—কেমন করে জানবো? ছেলে উদা...লি বেলা বেরিয়েছে, হয়ত পাড়ার কারু বাড়ী, নয় গঙ্গার ঘাটে আছে, তোমরাত আর কেউ দেখবে না?

জগন্নাথ শুনিয়া বড়ই রাগিয়া গিয়াছেন—একটা সাট লইয়া পাড়ার দুই এক বাড়ী ঘুরিলেন। হাতে সাট দেখিয়া সকলে বুঝিল—জগন্নাথ যেরূপ রাগিয়াছে, তাহাতে নিমাইকে আজ মারিয়াই ফেলিবে। তাহারা ভিন্ন পথ দিয়া গঙ্গাতীরে নিমাইকে সংবাদ দিল। নিমাই পিতার ভয়ে ভীত হইয়া অন্য দিক দিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। একজন

বালক বলিল—নিমাই গঙ্গাতীরে নাই, ঐ যে ঘরে দৌড়াইতেছে। জগন্নাথ সাট লইয়া অগ্রসর হইলেন—নিমাই ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। শচী দেবী গৃহের মধ্যে রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রাণের নিমাইকে এমন ভয়চকিত নেত্রে উৰ্দ্ধশ্বাসে গৃহে আসিতে দেখিয়া বাহির হইলেন, দেখিলেন—স্বামী সাট লইয়া পুত্রের প্রতি ধাবিত হইয়াছেন। নিমাই ভয়ে জননীর কোলে গিয়া লুকাইল, শচী স্বামীর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—হঁ্যাগা! তুমি কর কি, ছেলে ডরাইয়া মরে—তুমি হাতের ছড়ি ফেলে দাও; দেখ দেখি ছেলে ভয়ে কেমন হয়ে গেছে। নিমাই পিতার মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—জগন্নাথের হাতের ছড়িও অমনি ভূপতিত হইল, গৌরাঙ্গ সুন্দরের সেই শুষ্ক বদন দেখিয়া জগন্নাথ কাতর প্রাণে কোলে করিয়া বলিলেন—হাঁ নিমাই, তুমি এত দুষ্ট হলে কেন? একদিনও বিদ্যালয়ে যাও না; পণ্ডিত মহাশয় তোমার কত নিন্দা করলেন—তাই শুনে আমার প্রাণ বড় খারাপ হয়েছে।

নিমাই কোন উত্তর করিল না, কেবল হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিমাইয়ের চাঁদমুখ মলিন দেখিলে পিতা মাতার মাথা ঘুরিয়া যাইত—কাঁদিতে দেখিলে ত কথাই নাই—তখন তাহাকে সান্ত্বনা করা দায়! ফুকারিয়া কাঁদিতে দেখিয়া শচী শশব্যস্তে বাহু প্রসারিত করিয়া আসিয়া নিমাইকে কোলে করিলেন, চাঁদ মুখে শত চুম্বন দিয়া স্বামীকে বলিলেন—তোমার কি একটুও মায়া নেই—কেঁদে কেঁদে ছেলের মুখ কত শুকিয়ে গেলো দেখ দেখি, দুধের ছেলেকে এত তাড়না করা ভাল নয়।

জগন্নাথ বুঝিলেন—আজিকার তাড়নাটা বড় বেশী হইয়াছে, নিমাই আমার ভয় পাইয়াছে, ক্ষুদ্র শিশুর প্রতি রাগে এতটা করা ভাল হয় নাই। তিনি স্ত্রীর ক্রোড় হইতে পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন—খোকা, আর তোমাকে মারবো না, তুমি চুপ কর। বালক পিতার স্নেহমধুর সান্ত্বনায় সুস্থির হইয়া তাঁহাদের আসেপাশে ঘুরিয়া খেলা করিতে লাগিল। সেইদিন হইতে তিনি আর পুত্রকে কিছু বলিতেন না, কাজেই নিমাই সেইদিন হইতে নিশ্চিন্তচিত্তে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নিমাইয়ের অতিরিক্ত জ্বালাতনে সময়ে সময়ে পাড়ার কেহ কিছু বলিলে, শচীদেবী মনে করিতেন—ছেলে আমার তেমন নয়। তবে পাড়ার কুলোকের সঙ্গে এই রকম করে, তাঁহার আরও বিশ্বাস—নিমাই খুব সুছেলে, নিমাইয়ের কোন দোষ তিনি দেখিতে পাইতেন না।

পুত্র জননীকে কত জ্বালাতন করিত। শচীদেবী শুচিবাইগ্রস্তা ছিলেন বলিয়া নিমাই আব্দার করিয়া যখন কিছু পাইত না, তখন যে দ্রব্য ছুঁইলে মাতা রাগিবেন, নিমাই তাহাই স্পর্শ করিত। শচীদেবী অমনি রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতেন, বলিতেন—"তোর জন্য সমস্ত আচার-বিচার নষ্ট হ'লো দেখছি, হাঁরে, তুই ব্রাহ্মণের ছেলে—এ কি করিস্? সব মজালি দেখছি।" তখন পুত্রকে ধরিয়া স্নান করাইয়া বলিতেন—"ছি বাবা, অমন কর্ত্তে নাই", বলিয়া নিজে আবার স্নান করিয়া আসিতেন। শচীদেবী নিমাইয়ের যেরূপ আব্দার সহ্য করিতেন, আজকালকার জননী হইলে যে কি হইত, তাহা বলা যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ।

জগন্নাথের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল না, কাজেই অন্নের চিন্তায় তাঁহাকে বিব্রত হইয়া থাকিতে হইত। তাঁহার দুইটি পুত্র বিশ্বরূপ ও নিমাই কিন্তু একটিও উপযুক্ত হয় নাই, কাজেই তাঁহাকে সংসার চিন্তার জন্য শিষ্য-যজমানের বাড়ী নানা প্রকার কাজকর্ম্ম করিয়া না বেড়াইলে চলিত না। এই জন্য পুত্র দুইটির বেশী তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না, তথাপি নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ, এই সবেমাত্র ষোল বৎসরে পদার্পণ করিয়া বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছেন। আর নিমাই ত অতি শিশু, হাসিখেলায় দিন কাটায়। পিতা নিজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, কাজেই পুত্রদের সহিত সম্বন্ধ বড় কম, যাহা করেন—জননী শচীদেবী।

বিশ্বরূপের সহিতও পিতার দেখা হয় না। তিনি টোলে পড়িতেন, তাঁহার পাঠে একাগ্রতা অত্যন্ত অধিক ছিল। তিলমাত্র সময় তিনি বৃথা কাজে নষ্ট করিতেন না। কেবল সময়ে সময়ে তাঁহার মাতুলপুত্র লোকনাথের সহিত ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতেন, ইহাদের দুইজনে বড় সদ্ভাব ছিল। নিজের কোন ভ্রাতা-ভগ্নী ছিলনা বলিয়া বিশ্বরূপ মাতুলপুত্রের প্রতি বড়ই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর যখন নিমাই জন্মগ্রহণ করিল, তখন বিশ্বরূপের আনন্দের সীমা রহিল না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—এই সময় নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা বড় কম ছিল,

.। ছিলেন, তাঁহারাও শাস্ত্রমতে কোন কাজ করিতেন না, অনেক ...ায়ে অনাচার করিয়া ফেলিতেন। এইজন্য তান্ত্রিকের দল খুব প্রবল হইয়াছিল।

এই সময় শান্তিপুরে একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম কমলাক্ষ মিশ্র, ইনি মাধবেন্দ্রপুরী নামক একজন কৃষ্ণভক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল, যোগযাগে তিনি অশেষ শক্তিমন্ত হইয়া যথার্থ বৈষ্ণবপদবাচ্য হইয়া সাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই কমলাক্ষ শেষে ভক্তিবলে শ্রীগুরুর নিকট অদ্বৈতাচার্য্য উপাধি লাভ করিয়া শান্তিপুরে অবস্থান করিতেন।

অদ্বৈতের নিবাস শান্তিপুরে হইলেও নবদ্বীপে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি সময়ে সময়ে তথায় আসিয়া অবস্থান করিতেন, এইসূত্রে বিশ্বরূপের সহিত তাঁহার মিলন হয়। বিশ্বরূপ অতুলনীয় যুবা, রূপগুণের আধার, এইজন্য অদ্বৈতাচার্য্য এবং তাঁহার ভক্তগণ বিশ্বরূপকে দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন, এই অল্প বয়সে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিশ্বরূপ কখন তন্ত্রতত্ত্ব লইয়া, কখন বেদান্তের মায়াবাদ লইয়া আলোচনা করিতেন। এই কঠোর শাস্ত্র আলোচনায় তিনি অদ্বিতীয় হইলেও তর্ক-যুক্তিতে কেবল অশান্তি ভোগ করিতেন, প্রাণের একটা যথার্থ শান্তি তিনি একদিনের জন্যও উপভোগ করিতে পারেন নাই। এই সময় বৈষ্ণবচূড়ামনী অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় প্রবেশ করিয়া, তিনি ভক্তিশাস্ত্রের রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। কঠোর মায়াবাদের অসার যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া, তিনি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে

এবং সাধুভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের উপদেশ শ্রবণে ক্রমশঃ প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য যখন গঙ্গাজলে, তুলসীদলে ভক্তি-চন্দন মিশ্রিত করিয়া প্রেমাশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে পূজা করিতেন, আর ভক্তিবিজড়িত কণ্ঠে প্রাণের ডাক দিয়া বলিতেন—"হে দীনবন্ধু! পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ, আমাদের অধোগতির চূড়ান্ত হইয়াছে, আর কেন ঠাকুর! আমাদিগকে উদ্ধার কর।" এক একদিন তিনি স্বয়ং আশ্বাস দিয়া বলিতেন—"প্রভু আসিয়াছেন, আর জীবের কোনও চিন্তা নাই। আমি স্বপনে তাঁহার রূপ দেখিয়াছি, তিনি মহাশক্তি শ্রীরাধার শক্তিতে শক্তিমন্ত হইয়া, তাঁহারই স্বরূপে মর্ত্তে আসিয়াছেন, আর কোন চিন্তা নাই।" এই কথা শুনিয়া বিশ্বরূপের মনে হইত, আমার ছোট ভাই নিমাই কি তবে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইয়া জন্মাইল? তাহারই ত কাঁচা সোণার পারা রূপ, শক্তিও অসীম, রাধা ও কৃষ্ণ নামেই ত সে এই বয়সে মাতোয়ারা; মনে মনে এই চিন্তা করিতেন, আবার পাছে কনিষ্ঠের অকল্যাণ হয় ভাবিয়া ঝাট্ ঝাট্ করিয়া, সে ভাব ভাবের তরঙ্গে ভাসাইয়া দিতেন।

এদিকে পিতা, পুত্রের প্রতি নজর রাখিতেছেন না। বড় ভাইও সর্ব্বদা শাস্ত্রপাঠ লইয়া ব্যস্ত থাকায়, নিমাই যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়া দিন দিন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সে এখন আর কাহার শাসন মানে না, মাকে ... ই করে না—পিতাকে একটু করে, তবে তিনি সংসারের
... র্ব্বদাই বাড়ী ছাড়া, কে তাহার পাছু লাগিয়া থাকে?
... ন্ত ভয় ও মান্য করে বটে কিন্তু তিনিও নিজের
... র্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত, কাজেই বালক শাসনাতীত হইয়া

উদ্ভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার দৌরাত্ম্যে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। বোধহীন বালককে ভাল মন্দ বুঝাইয়া শিক্ষা না দিলে যেরূপ হয়, নিমাইয়ের তাহাই হইল।

একদিন অনধ্যায়, টোলে পড়া বন্ধ, অদ্বৈতাচার্য্য সেদিন কোথায় গিয়াছেন, বৈষ্ণব সভায় কেহ নাই, কাজেই বিশ্বরূপ আজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে লইয়া বাড়ীতেই আছেন, নিমাইকে লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, এই বয়সে তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া মনে মনে কতই আনন্দিত হইতেছেন। পিতা জগন্নাথও আজ কোথাও যান নাই, বাড়ীতে বসিয়া স্ত্রীর সহিত সংসারের নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বলিতেছেন—"খেটে খেটে তোমার শরীর দিন দিন বড় খারাপ হচ্ছে দেখছি, একা এত পরিশ্রম কর, কাজেই এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হইতেছে।"

শচীদেবী বলিলেন—"দেখ, আমি খাটুনিকে ভয় পাই না, নিজের সংসারে খাটছি, টানাটানির সংসার কি হবে বল, কিন্তু দুরন্ত নিমাইয়ের জন্য খাটুনি যে বড় বেশী, উহাকে আর পারিয়া উঠি না; যদি তুমি বা বিশ্ব একজন ঘরে থাক, তা হলে নিমাই আর অত দৌরাত্ম্য করিতে পারে না।"

জগন্নাথ বলিলেন—"নিমাইয়ের দুরন্তপনার কথা পাড়ায় খুব শুনছি, কিন্তু কি করি, ছেলের জন্য বাড়ী বসে থাকলেও ত চ[illegible] আর বিশ্বরূপের এই পড়ার সময়, ও ভগবানের কৃপায় ক্রম[illegible] হয়ে উঠছে, এখন পাঠ বন্ধ করে ঘরে বসিয়েও ত রা[illegible]

শচীদেবী বলিলেন—"তা কি হয়, ছেলেকে ম[illegible]

এতে যদি খেটে খেটে মরে যেতে হয় তাও ভাল; তবে এক কাজ কর না?"

জগন্নাথ। কি কাজ তুমি কর্ত্তে বল?

শচী। বিশ্বরূপ ত বড হয়েছে, এইবার একটা বিয়েব যোগাড কব না? তা হলে ঘবে একটী হাতঙ্গুডকুৎ ছোট বউ হয়, বাহিরেব ফাই ফরমাইস্ অনেক সে খাট্তে পাবে, কিছু না পাবে, নিমাইকে নিযে ঘবেব মধ্যে খেলা কবলেও আমাব অনেকটা নির্ভাবনা হয়, পবিশ্রমও কম হয়।

বহুদিন পিতাপুত্রে দেখা হয় নাই। জগন্নাথ উপার্জ্জনেব চেষ্টায় অতি প্রত্যুষে বাটীব বাহিব হইয়া দূববর্ত্তী গ্রামে শিষ্যবাড়ী যাইতেন। বিশ্বরূপ তাহার পব শয্যাত্যাগ কবিয়া গুরুগৃহে যাইতেন, কোনদিন মধ্যাহ্ন সময়ে আসিতেন, কোনদিন আসিতেন না। অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আহাব কবিয়া অনেক বাত্রে গৃহে আসিতেন, জগন্নাথ তখন আহারাদি করিয়া দুরন্ত নিমাইকে লইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অতিরিক্ত পরিশ্রমেব পব স্বভাবতঃই অবসাদ আসিয়া তাঁহাকে তন্দ্রামগ্ন করিত। বিশ্বরূপ আসিয়া আহারাদি কবিতেন, পবিশ্রান্ত পিতাকে আর জাগাইতেন না, এইরূপে পিতাপুত্রে দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হইত না। আজ তিনি বিশ্বরূপের সেই সৌন্দর্য্যময় ব্রহ্মচর্য্যজ্যোতিঃসম্পন্ন নিটোল শরীব দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন; পত্নীর অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে রাজী হইয়া জগন্নাথ মনোমত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পিতামাতাব মনোগত ভাব জানিতে বিশ্বরূপের বিলম্ব হইল না।

বিবাহের কথা শুনিয়া তিনি প্রমাদ গণিলেন। নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিশ্বরূপ সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব বহুদিন হইতে জাগরিত ছিল, গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার আকাঙ্খা তাঁহার হৃদয় বিশেষ বলবতী হইয়াছিল। এক্ষণে পিতামাতা যদি তাঁহাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করেন, তাহা হইলেত সর্ব্বনাশ হইবে? পিতৃমাতৃ ভক্ত পুত্রত কিছুতেই তাঁহাদের কথা অবহেলা করিতে পারিবেন না, অথচ শৃঙ্খলে জড়িত হইয়া চিরদিন সংসারে বাঁধা থাকিতে হইবে। তিনি জানিতেন—বংশে একজন ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসী হইলে তাহার সপ্তম পুরুষ উর্দ্ধগতি লাভ করে। পুত্র হইয়া পিতৃপুরুষের একার্য্য করা বিশেষ কর্ত্তব্য বোধে, তিনি অচিরে গৃহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং একদিন জননীর হস্তে একখানি পুঁথি দিয়া বলিলেন—"মা, নিমাই বড় হইলে এই পুঁথিখানি তাহাকে দিয়া বলিও, তোমার দাদা তোমাকে এই পুঁথিখানি পড়িতে দিয়াছেন।" জননী বলিলেন—"বাবা, আমি কেন দিব, তুমিই দিওনা।" পুত্র বলিলেন—"কি জানি মা, জীবনের কথাত কিছু বলিতে পারা যায় না, যদি বেঁচে থাকিত আমিই দিব, নতুবা তোমাকে বলিয়া রাখিলাম, তুমিই দিও।" জননী কি করিবেন, পুঁথিখানি লইয়া একস্থানে তুলিয়া রাখিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিশ্বরূপের মাতুলপুত্র লোকনাথের সহিত তাঁহার বড় সদ্ভাব ছিল। লোকনাথও একদণ্ড বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, তাহাকে সে গুরুর মত ভক্তি ও মান্য করিত। যখন বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় তাহার কর্ণগোচর হইল, তখন সেও তাহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

সবেমাত্র ষোল বৎসর বয়স, বিশ্বরূপ বালক বলিলেই হয়, ইহার মধ্যে তাঁহার হৃদয় জ্ঞান-বৈরাগ্যে এতদূর বিব্রত যে সংসারধর্ম্ম তাঁহার আদৌ ভাল লাগিল না। একদিন শীতকালের গভীর রজনীতে লোকনাথের সঙ্গে কেবলমাত্র পথের সম্বল একখানি পুঁথি লইয়া বিশ্বরূপ প্রাঙ্গনে আসিয়া প্রথমে নিদ্রাতুর পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। তারপর প্রাণের নিমাইকে গৃহদেবতা রঘুনাথের পদে সমর্পণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রাণ যখন উদাস হয়, মন যখন সংসারের মায়াপাশ ছেদন করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, ভগবদ্ প্রাপ্তির বলবতী ইচ্ছা যখন মানব-হৃদয় অধিকার করিয়া বসে, তখন বালক-বৃদ্ধ বলিয়া কোন পার্থক্য থাকে না, তখন কি এক মহাকর্ষণে জীব উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে। এই আকর্ষণ-বলেই পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব, মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া বনে ছুটিয়াছিল। আর আজ সেই আকর্ষণবলেই পরম সুখে লালিত পালিত বিশ্বরূপ এই অল্প বয়সে সংসার ছাড়িয়া কঠিন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। ভগবান যাহাকে আপনার ভাবিয়া পাদপদ্ম দানে ধন্য করেন তাহার মনের গতি বাল্যকাল হইতেই ফিরিয়া পড়ে, বয়সের বশে কেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

যখন দুই ভাইয়ে গঙ্গাতীরে আসিলেন, তখন পারঘাট তরণীবিহীন। পরপারে যাইবার কোন উপায় নাই কিন্তু প্রাণের এমনি আগ্রহ, মনের এমনি তেজ, তাঁহারা সেই স্রোতসঙ্কুল গঙ্গা পার হইতে কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। পাছে কেহ দেখে, তাহাদের গমনে বাধা দেয়, এই ভয়ে বামহস্তে পুঁথিখানি উত্তোলন করিয়া তাঁহারা সন্তরণে নদী পার হইলেন।

পরপারে আসিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে একদিন এক সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এই সন্ন্যাসী ইতিপূর্ব্বে একদিন নবদ্বীপে মায়াপুর গ্রামে জগন্নাথের বাটী অতিথি হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ সেইদিন হইতে ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। সন্ন্যাসীর উপদেশ তাঁহার প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিল। আজ আবার সেই সন্ন্যাসীই এই অপরূপ বালকের পাণ্ডিত্য, তাহার একাগ্রতা দেখিয়া তাহাকে দীক্ষা দান করিলেন। লোকনাথও অবশেষে বিশ্বরূপের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উভয়ে গুরুর আদেশে তীর্থ ভ্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

মন্ত্র গ্রহণের পর হইতে তাঁহাদের মনের বল যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল, তাঁহারা একান্ত মনে তীর্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুইজনে একত্র কার্য্য করিলে সুবিধা হয় না, কারণ বিশ্বরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে অনেক অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। শুনা যায়—প্রায় দুই বৎসর উভয়ে একত্র ভ্রমণ করিয়া পুনা নগরের নিকটে একটী গ্রামে আসিয়া বিশ্বরূপ এমন অলৌকিক ভাবে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, যাহা মানব ধারণার অতীত। লোকনাথও তখন ভক্তিবলে বলীয়ান—তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসী; গুরুদেবের অদর্শন আর তাঁহাকে কাতর করিতে পারিল না। তিনি দুই একদিন তথায় অপেক্ষা করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে আপনার গন্তব্য পথে ধাবমান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোক।

পরদিন আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি বিশ্বরূপ গৃহে আসিল না দেখিয়া জগন্নাথ নিমাইকে অদ্বৈত সভায় পাঠাইলেন। পিতা জানেন—বিশ্বরূপ হয় অদ্বৈত সভায় কোন ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবে গদ গদ হইয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়াছে, নয় অন্য কোথাও গিয়াছে, যাইলেই সংবাদ পাওয়া যাইবে। নিমাই তখন বিদ্যালয় হইতে আসিয়াছিল। সে দাদাব সহিত একত্র ভোজন করে, তাই জননী বলিলেন—"বাবা, তোমার দাদা এখনও ঘরে আসে নাই, একবার খোঁজ করে এসতো।" পিতাও পূজা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাই আদেশ করিলেন। নিমাই দাদার অনুসন্ধানে চলিয়া গেল।

নিমাই কোন কোন দিন বিশ্বরূপের সহিত অদ্বৈত সভায় গমন করিলে, অদ্বৈতাচার্য্য এই বালকটির ভাব ভক্তি দেখিয়া কি যেন কি মনে করিতেন। একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিতেন—এই কি আমার প্রেমের ঠাকুর নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন? সাধারণ মানব-শিশুর এমন আকৃতি প্রকৃতি, এমন রূপত দেখা যায় না? হায়! ভগবান, তবে কি তুমি তোমার বাক্য সত্য করিতে নদীয়ায় আসিয়া শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীকে ধন্য করিয়াছ, দেখো ঠাকুর; আমার অনুমান যেন সত্য হয়?

আজ বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে নিমাইকে আসিতে দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য্য পুলকিত প্রাণে বলিলেন—"নিমাই, তোমার দাদার জন্য এত অনুসন্ধান করছো কেন, জান নাকি সে কোথায় গিয়াছে? একটু ভাল করিয়া আত্মস্থ হও না, তাহা হইলে আর খুঁজিতে হইবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন স্থান কোথায়, যাহা তোমার অজানিত? এই বলিয়াই তিনি নিমাইকে বুকে তুলিয়া লইলেন, আচার্য্যের সমস্ত অঙ্গ কি এক মধুর ভাবে ভরিয়া গেল।

নিমাই বলিল—"আপনারা কি দাদার কোন সংবাদ জানেন না? তবে আমাকে আর ধরিয়া রাখিবেন না, ছাড়িয়া দিন, আমি বাবাকে গিয়া বলিগে?"

আচার্য্য মনে মনে বলিলেন—তুমি ধরা না দিলে তোমাকে ধরে রাখে জগতে এমন সাধ্য কার? কৃপা করিয়া ধরা দিয়েছ, তাই একবার বুকে লইয়া প্রাণ শীতল করিলাম। তারপর ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—"নিমাই তোমার দাদাত আজ এখানে আসে নাই।"

নিমাই তাড়াতাড়ি যাইয়া পিতাকে সংবাদ দিল। জগন্নাথ বিশেষ চিন্তিত হইয়া বেলপুখুরিয়ায় তাঁহার শশুরবাড়ীতে লোক পাঠাইলেন। লোকনাথের সহিত তাহার বড় ভাব, যদি সেইখানেই গিয়া থাকে।

লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"সেখানেও মহা বিভ্রাট, লোকনাথও বাড়ীতে নাই। তাঁহারা লোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন—লোকনাথ ও বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গত রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে; অনুসন্ধানের জন্য তাঁহারাও চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছেন।"

এই বজ্রসম সংবাদ শুনিয়া শচীদেবী বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হারাইয়া তিনি নয়নের জলে ভাসিতে লাগিলেন। আমার পুত্র অকৃতজ্ঞ নহে—সে পণ্ডিত, গুণী ও জ্ঞানী, নবদ্বীপের রত্নস্বরূপ, সে যে আমাদিগকে কাঁদাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে, সংসারের এ অতুল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে—তাহা নহে। আমাদের উপর রাগ করিয়া বা অকৃতজ্ঞতার জন্য সে গৃহত্যাগ করে নাই, বৈরাগ্যের বিষম আকর্ষণে সে এই সকল ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে। বিশ্বরূপের বয়স অতি অল্প, এ সময় তাহার বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনের সময় নয়, তাহাকে কোন প্রকারে ফিরাইয়া আনা উচিত, জগন্নাথের মনে এরূপ কোন ভাবের উদয় হইল না। তিনি জ্ঞানী, তিনি বেশ বুঝেন—ঈশ্বর ভাবে বিভোর হইবার সময়-অসময় নাই; সৌভাগ্যশালী হইলে অতি অল্প বয়স হইতেই মানবের প্রাণে এভাব জাগা অসম্ভব নহে। পুত্র ঘরে ফিরিয়া আসুক, জগন্নাথ ভগবানের নিকট এ প্রার্থনা করিলেন না, বরং প্রার্থনা করিলেন—দয়াময়, আমার বালক পুত্র তোমার জন্য পাগল হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

স্বার্থপর পিতা হইলে তাহার প্রাণ হইতে স্বতঃ বাহির হইত—ছেলেটা আমাদের প্রতি তাকাইল না, ধর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু জগন্নাথ পুত্রের গৃহত্যাগে, সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনে, আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। তবে শচীদেবী স্ত্রীলোক, পুত্রগতা প্রাণা, বিশেষতঃ বিশ্বরূপ প্রায় উপযুক্ত হইয়াছিল, লেখাপড়ায় এবং চরিত্রগুণে সে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সকলেই বলিত—মিশ্রের পুত্রটি

নবদ্বীপের রত্ন, যেরূপ রূপ, গুণও তেমনি, এহেন পুত্রকে আর দেখিতে পাইব না, ভাবিলে কোন জননী নীরবে সে শোক সহ্য করিতে পারেন? শচীদেবী হৃদয় বিদারক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নিমাই এত তত্ত্ব কিছু বুঝে নাই; সে আব্‌দার করিয়া আহারাদি করতঃ পাড়ায় খেলাইতে গিয়াছিল। যখন জননীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল, পাড়ার লোক যখন বিশ্বরূপের জন্য হায় হায় করিতে লাগিল, তখন সে বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিল, পিতাকে বিষন্ন এবং মাতাকে তদবস্থ ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া সে প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর সকলের মুখে দাদার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল, দাদার অদর্শনজনিত দুঃখে সে একেবারে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

বিশ্বরূপ ত গিয়াছে, শেষে কি তাঁহাদের সবে ধন নিলমণি নিমাইকেও হারাইবেন? সদা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে মূহ্যমান দেখিলে পাছে নিমাই দাদার শোকে আরও কাতর হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে, এইজন্য জনক জননী অন্তরে গুমরিয়া মরিলেও বাহ্যিক আর কোনও-প্রকার শোক প্রকাশ করিলেন না। মূর্চ্ছিত নিমাইকে শুশ্রূষা করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, প্রগাঢ় ভ্রাতৃবৎসল নিমাই যাহাতে আর শোকাভিভূত না হয়, তাহার জন্য নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের বয়স এখন ছয়-সাত বৎসর। ইহার মধ্যে নিমাই অতিশয় লেখা পড়া শিখিয়াছে, ছেলে ঠিক তোতাপাখী, একবার যা শুনে তাই শিক্ষা করে; পুস্তক একবার পড়িলে আর দ্বিতীয়বার পড়িতে হয় না, সমস্তই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়।

নিমাই যেন জাতিস্মর, পূর্ব্বজন্মের কথা সমস্ত তাহার মনে উদয় হয়, তাই এই অল্প বয়সে যাহা পড়ে, যাহা শুনে, তাহা একেবারে পাষাণে অঙ্কিত হইয়া যায়। নিমাইয়ের মেধাশক্তি দেখিয়া অধ্যাপকেরা আশ্চর্য্য হন, বলেন—এমন বুদ্ধির প্রাখর্য্য, এমন মেধাশক্তি, তাঁহারা মানুষে কখনও দেখেন নাই। এই অল্প বয়সে নিমাই অনেক বয়স্থ পণ্ডিতকে হার মানাইয়া দিয়াছে। বিশ্বরূপের বুদ্ধি বৃত্তিও প্রায় এইরূপ ছিল, সেও অল্প বয়সে বেদ উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ করিয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে। নিমাইও কি আবার তাই হইবে, এ যে তাহা অপেক্ষাও মেধাবী! পণ্ডিত জগন্নাথ পুত্রের বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন—ইহাকে আর বেশীদিন লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে এও আমাদিগকে কাঁদাইবে।

একদিন বহির্বাটীতে আসিয়া জগন্নাথ নিমাইকে ডাকিলেন, পুত্র কাছে আসিলে পিতা তাহাকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন—"বিশ্বম্ভর! আমিত প্রায়ই বাড়ীতে থাকি না, তোমাকে আর বিদ্যালয়ে গেলে চলিবে না; পাঠ বন্ধ করিয়া তোমার গর্ভধারিণীর কাছে ঘরে থাক, আমার মাথার কীরে বাবা, তুমি একথা অবহেলা করো না।"

পিতৃভক্ত নিমাই পিতার কথা এড়াইতে পারিল না। সে বিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়িয়া দিল, ঘরে রহিল কিন্তু খেলায় উন্মত্ত; জননীর নিকট বসিয়া থাকা, কি জননীর কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করা, কি শোকে সান্ত্বনা দেওয়া, তাহা হইত না। প্রথম প্রথম দুই একদিন সে বাড়ীর নিকট সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করিল, তারপর

যতদিন যাইতে লাগিল, নিমাই ততই এ পাড়া সে পাড়া করিয়া বেড়াইত, গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এমন জলকেলী করিত যে, অন্যান্য স্নানার্থীগণ অস্থির হইয়া পড়িত। সে জলে ডুবিয়া কাহারও পা ধরিয়া টানিত, কাহারও কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিত, কাহারও পূজার দ্রব্য কাড়িয়া নিজে খাইত, অপর বালককে দিত। কেহ আসিয়া সে বিষয় জননীর নিকট অভিযোগ করিলে, শচী বাৎসল্যভাবে বলিতেন—"হাঁরে নিমাই, একে জ্বলে মরছি, তার উপর তোর জন্য লোকের কত কথা শুনবো, হাড় যে কালী হলোরে" এই বলিয়া বেত লইয়া যেমন মারিতে আসিতেন, নিমাই অমনি দৌড়িয়া গিয়া ছুতা হাঁড়ির উপর বসিত, গায়ে ভাত মাখিয়া জননীকে আরও জ্বালাতন করিত। নিমাই জানিত—তাহার জননী শুচিবাইগ্রস্তা, কিছুতেই তাহাকে ছুঁইবেন না।

নিমাইয়ের এই সকল অত্যাচার দেখিয়া শচীদেবী বলিতেন—"এতদিন পরে একটা পাগ্‌লা ছেলে হয়ে, আমার হাড় কালী কল্লে, হাঁরে নিমাই! তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, পণ্ডিতের ছেলে, তোর এমন আচার; —ছি ছি, লোকে কি বল্‌বে, তুই জাতিকুল খেতে এসেছিস্ বুঝি? নেমে আয়, চল গঙ্গায় ঘাটে স্নান করে আস্‌বি।" নিমাই জননীকে কিছু নরম হইতে দেখিয়া বলিত—"তুমি হাতের বেত আগে ফেল, তবে যাব।"

শচীর ইচ্ছাত নয় যে পুত্রের কোমল অঙ্গে আঘাত করেন, ও সোণার অঙ্গে কুসুমাঘাতই সহ্য হয় না—তা বেত্রাঘাত; তবে ভয় না দেখাইলে ছেলে বশ হয় না, আর প্রতিবেশীরাও শাসন দেখিতে পায়

এই জন্য। জননী বেত ফেলিয়া দিলে নিমাই গঙ্গাভিমুখে দৌড়াইত, শচী সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া গায়ে কোথায় ভাত লাগিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিতেন, নিমাই তাহা ধুইয়া স্নান করিয়া উঠিলে, শচী নয়নানন্দ পুত্রকে মুছাইয়া দিয়া কোলে লইয়া মুখচুম্বন করতঃ বলিতেন—"এত দুরন্তপনা কেন কর বাবা। দেখছ না, সোণার অঙ্গ ক্রমশঃ ধূলামাখা হচ্ছে।" জননীর এইরূপ স্নেহের তিরস্কার শুনিয়া শিশু অভিমান ভরে স্কন্ধে শিরঃসংস্থাপনপূর্ব্বক ক্রন্দন স্বরে বলিতেন—"তোমরা ঘরে বসিয়ে রেখেছ, পড়তে যেতে দাও না, আমি মূর্খ হচ্ছি, তাই তার মত কাজ কর্‌ছি।" প্রতিবেশী রমণীগণ সোণার চাঁদ নিমাইয়ের মুখে এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া বলিত—"ঐ দেখলো শচী ছেলে কি তোর যে সে, তবে তোরাই ওর মাথা খাচ্ছিস্, সত্যিতো, ছেলে ঘরে বসে থাক্‌লে দৌরাত্মি কর্ব্বে নাত কি? ও যখন পড়তে চাইছে, তখন তোদের পড়তে না দেওয়া ভাল নয় ভাই।"

"হারে, যদি এত পড়বার ঝোঁক, তা কর্ত্তাকে বলনি কেন বাবা", বলিয়া জননী পুত্রের ছল ছল নেত্র অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া বলিলেন—'আচ্ছা, আজ তিনি আসুন, আমি পুনরায় তোমার পড়ার বন্দোবস্ত করছি, তাহা হইলে দুরন্তপনা ছাড়বে ত?" নিমাই সেই কাঁদ কাঁদস্বরে বলিল—"ছাড়ি কিনা দেখ না!"

জননী পুত্রকে কোলে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। সমস্তদিন দৌড়াদৌড়ি করিয়া নিমাই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জননীর সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল। বাৎসল্য প্রতিমা সৌভাগ্যবতী শচীদেবী, নিমাইয়ের সেই অতুলনীয় মুখচন্দ্রমা

দর্শন করিয়া বিশ্বরূপের শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইতেন। এইজন্য জগন্নাথ তাহাকে পড়া ছাড়াইয়া পত্নীর সান্ত্বনার জন্য ঘরে রাখিয়াছিলেন, কোলের ছেলে কাছে কাছে থাকিলে শচী বিশ্বরূপের শোকে অধীরা হইবেন না। কিন্তু একি সেই ছেলে, এ ছেলের যে চিরকালই পিতা-মাতাকে জ্বালাতন করা অভ্যাস। অভ্যাস কি সহজে ভুলা যায়?

নিমাইয়ের মুখ দেখিলেই সকলে মুগ্ধ হইত, সেই মুখের মধুর বুলি শুনিলেত কথাই নাই। শচী যখন রাগাইয়া চাঁদ বদনের মধুর বুলি শুনিবার সাধ করিতেন, নিমাই তখন মূক হইয়া থাকিত, কিছুতেই কথা কহিত না। চাঁদ দেখিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার সাধ ও মিটিত না, পুত্র ধরা দিত না, কেবল এ পাড়া, সে পাড়া করিয়া বেড়াইত, তাই কতক্ষণে সে নিদ্রা যায়, শচী তাই প্রার্থনা করিতেন। নিমাই ঘুমাইয়াছে, জননী পুত্রের অতুলনীয় মুখ খানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছেন। বিশ্বরূপের শোক হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলেই শচীদেবী যেমন করিয়াই হউক নিমাইকে ধরিয়া আনিয়া এইরূপে ঘুম পাড়াইতেন। অনলে জলসেকের ন্যায় তাঁহার পুত্রশোকও ক্ষণিকের জন্য নির্ব্বাপিত হইত।

পুত্র বলিয়াছে—"বিদ্যালয়ে দিলে আর সে দুরন্তপনা করিবে না, শান্তশিষ্ট হইয়া ঘরে থাকিবে।" আশা পাইয়া শচীদেবী স্বামীর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, যাহাতে পুত্র পুনরায় টোলে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিলেন।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগে জগন্নাথ নিজকে ধন্য মনে করিলেও বাৎসল্য স্নেহের নিমিত্ত দারুণ শোকের আবেগ তাঁহার হৃদয়কে সময়ে সময়ে

এমন যন্ত্রণা প্রদান করিত যে, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। গৃহবহির্গমন করিয়া, বন্ধুবান্ধবগণের নিকট যাইয়া, নানা প্রকার শাস্ত্র-চর্চ্চায় কাল কাটাইয়া আসিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়া জগন্নাথ প্রাণের পুত্র নিমাইকে লইয়া শচীর সহিত কত সুখ দুঃখের কথা কহিতেন।

আজও সেইরূপ সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়া প্রথমে সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করতঃ নিমাইকে ডাকিলেন। পিতার ডাক শুনিয়া নিমাই আনন্দের পূর্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নাচিতে নাচিতে নিকটে গমন করিল, শচীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বলিলেন—"ছেলের কথা শুনেছ?" জগন্নাথ নিমাইকে বুকে তুলিয়া বলিলেন—"না কি বলে পাগলা ছেলে?"

শচী। নিমাই বলে কি, আমাকে পড়িতে দিলে আর কোন বদ্‌মায়েসী কর্ব্বো না, নতুবা আরও বাড়াবো।

জগন্নাথ। সত্যি, হাঁরে নিমাই, এইজন্য এত দৌরাত্ম্য কর বাবা?

পুত্র পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া নীরব রহিল। শচী বলিলেন—"আমি প্রতিশ্রুত হয়েছি, কাল সকালে তোকে বিদ্যালয়ে পাঠাব, তাই আজ বৈকালে আর কিছুই করে নাই, কোথাও যায় নাই, বাড়ীতেই ছিল।

জগন্নাথ। যদি তাই একান্ত ইচ্ছে, তবে কাল থেকে আবার পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে যেও। পিতার আজ্ঞা পাইয়া বালক আশ্বস্ত হইল; যেন কত সুধীর ছেলেটির মত রাত্রে পিতামাতার কোল আলো করিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উপনয়ন।

পরদিন হইতে নিমাই আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। এইবার নিমাই প্রাণপণ যত্নে পাঠে মনোযোগ প্রদান করিয়া অতি সামান্য দিনের মধ্যে এক অসাধারণ ব্যুৎপত্তিশালী পণ্ডিত হইয়া উঠিল। নিমাইয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী চমকিত হইয়া উঠিলেন। এই বয়সেই নিমাইয়ের প্রতিভা এত সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, কালে যে সে একজন দিক্‌গজ পণ্ডিত হইয়া নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিবে, সে বিষয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল। পুত্রের সুযশ-মহত্ত্বে পিতামাতারও প্রাণ আনন্দে বিভোর হইয়া গেল।

এইরূপে আরও তিন বৎসর অতীত হইয়া নিমাই যখন নবম বৎসরে পদার্পণ করিল, সেই সময় জগন্নাথ তাহার উপনয়ন দিবার ব্যবস্থা করিয়া পূজনীয় শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে নিজের অভিপ্রায় অবগত করাইলেন। জগন্নাথ সমাজে হাজার প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেও নীলাম্বরকে না জানাইয়া কোন কার্য্য করিতেন না, কারণ নবদ্বীপধামে তাঁহার এ প্রভাব প্রতিপত্তির মূল একমাত্র নীলাম্বর ভিন্ন আর কেহ নহে।

নীলাম্বর দৌহিত্রের উপনয়নে কিছু ব্যয় বাহুল্য করিবেন—কারণ তিনি এই সোণার খোকাটিকে বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

হ্বে উভয় পক্ষে নানাপ্রকার মনোকষ্টের জন্য তিনি জামাতার নিকট এ কথা উত্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। এক্ষণে জগন্নাথ যখন নিজেই পুত্রের উপনয়ন দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন তিনিইবা এই শুভ ঘটনায় আনন্দ উপভোগ করিতে ছাড়িবেন কেন? তাহার অবস্থা ত অসচ্ছল নহে?

দেখিতে দেখিতে আবার মায়াপুরে জগন্নাথের পবিত্র প্রাঙ্গনে আনন্দের হুলুধ্বনি পড়িয়া গেল। শচীদেবী দুই একবার জ্যেষ্ঠপুত্রের শোকে মুহ্যমান হইয়া শোকাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রতিবেশী রমণীগণ "নিমাইয়ের এ সুখের দিনে চক্ষের জল ফেলিয়া অমঙ্গল করিতে নাই" বলিয়া নিষেধ করিল, তখন শচীদেবী সমস্ত শোকদুঃখ ভুলিয়া প্রাণের পুত্র নিমাইয়ের উপনয়নোৎসবে যোগদান করিয়া দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে আত্মীয় কুটুম্বগণ আসিয়া এ আনন্দে যোগদান করিল। গুরুদেব বিষ্ণু শর্ম্মা ও পুরোহিত সুদর্শন ভট্টাচার্য্য আসিয়া এ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের মাতামহ এবং মাতুলদ্বয় যজ্ঞেশ্বর ও হিরণ্য পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ পুত্রের উপনয়ন দিবার মনস্থ করিয়া পিতামাতার নিকট শ্রীহট্টে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাতিশয় বার্দ্ধক্য হেতু তাঁহারা এ দূরদেশে আসিতে রাজী হন নাই, কায়মনে আদরের পৌত্র নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জগন্নাথকে এ শুভকার্য্য সমাধা করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

নদের নিমাই।

আদরের দৌহিত্র নিমাইয়ের উপনয়নে নীলাম্বর খুব জাঁকজমক, উৎসবামোদের খুব ঘটা করিয়াছিলেন। যখন নিমাইয়ের গাত্রহরিদ্রা হইল, পাড়ার পাঁচজন স্ত্রীলোকে যখন নিমাইকে অঙ্গনে আল্পিনা দেওয়া পীড়ির উপর বসাইয়া শ্রীঅঙ্গে তৈল-হরিদ্রা মাখাইতে লাগিল, তখন সেই কাঁচা সোণার মত গৌর অঙ্গ, নিমাইয়ের রূপের যে কি ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল—তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করা অসাধ্য। চারিদিকে বাদ্যোদ্দম হইতে লাগিল, তারপর কর্ণবেদ ও উপনয়ন দানের নিয়মানুসারে নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডন করতঃ রক্তবস্ত্র পরিধান করান হইল। নবীন ব্রহ্মচারীর সেই অপরূপ রূপ যে দেখিল, সেই বিমুগ্ধ চিত্তে বার বার দেখিবার জন্য এদিক ওদিক উঁকি মারিতে লাগিল। যেন সে সুষমামণ্ডিত অপূর্ব্ব রূপ নয়নের অন্তরাল করিতে কাহার ইচ্ছা হইতেছে না। এ ভুবনমোহন রূপ যে দেখিল—সেই মজিল, গৌরচন্দ্রের এ রূপ সাগরে ডুবিয়া আপনহারা হইল।

"শাক্তএব দ্বেজা সর্ব্বে" তারপর যখন গলদেশে উপবীত প্রদান করিয়া জগন্নাথ পুত্রের কর্ণে মহাশক্তি স্বরূপা বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন কি জানি কি ভাবাবেশে নিমাই বিভোর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শক্তিমন্ত্রের প্রবল শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বুঝি তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল, মহাশক্তি শ্রীরাধার প্রেমঋণ সুধিবার জন্য তাঁহার এ জন্মের জন্মবৃত্তান্ত বুঝি মনে পড়িয়া গেল? এই শক্তিমন্ত্রই যে তাঁহার এ জন্মের প্রধান আরাধ্য ধন, ইহাইত তাঁহার ইষ্ট, ইহাইত তাঁহার জপমালা। অসীম শক্তিতে শক্তিমান হইয়া নিমাই তর্জ্জন

গর্জ্জন করিয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িলেন। এই ভাব দেখিয়া সকলে শশব্যস্তে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

নিমাই চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করতঃ দুই একবার "ভবতী ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ব্রাহ্মণের স্ববৃত্তি অবলম্বন করিলেন। সেই সময় দেশের লোক আসিয়া এই অতুলনীয় নবীন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা প্রদান করিয়া ধন্য হইল। এইবার জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে কোলে করিয়া একটি নিভৃত কক্ষে লইয়া গেলেন। তখনকার নিমাইয়ের মুখভাব দেখিয়া নিমন্ত্রিত অধ্যাপক মণ্ডলী আশ্চর্য্য হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—আমরা ত অনেক উপনয়ন দিয়াছি, কিন্তু উপনীত বালকের এমন ভাব ভঙ্গি ত কখনও দেখি নাই ? আজ যেন কশ্যপের গৃহে বামনদেবের উপনয়ন দেখিয়া জন্ম সার্থক করিলাম।

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই রাধা ভাবে গড়া বালকটীর দেহে রাধাশক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া, সেই শ্রীঅঙ্গে শ্যামাঙ্গের পূর্ণ মিলন দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে, কেহ "রাধাশ্যাম", কেহ গৌরহরি, ইত্যাদি নানাপ্রকার রুচিপ্রদ নামকরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ আনন্দে আত্মহারা হইতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যত বহুদিন হইতেই এই অনুমান করিয়া নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিতেন। ভগবান যে তাঁহার প্রাণের ডাক শুনিয়া নববৃন্দাবন নদীয়ায় গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই বালককে দেখিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার সেইরূপ ভাবোচ্ছাস হইত, আবার সময়ে সময়ে দিশাহারা হইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে বলিতেন—সত্য কি তাই ?

উপনয়নের পর নিমাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বেদমাতা গায়ত্রী

মন্ত্রজপে অসীম শক্তিশালী হইয়া পড়িলেন—তাঁহার ব্রহ্মতেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। মহাশক্তি গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও মহাশক্তি শ্রীরাধার ধ্যান এবং ইষ্টরূপে ঐ মন্ত্র জপ করিয়া নিমাই বিভোর হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

পুত্র এখন খুব সৎ হইয়াছে। তাহার সে পাগ্‌লামী, সে দুরন্তপনা আর নাই দেখিয়া জগন্নাথ ও শচীর দিন বড় সুখে কাটিতে লাগিল। পুত্রের যশে নবদ্বীপ ভরিয়া গিয়াছে, আজকাল আর নিমাইয়ের সুযশ-সুনাম ব্যতীত, কুযশ-কুনাম কেহ কীর্ত্তন করে না। সকলেই বলে—নিমাই ছেলে বেলায় যেমন দুরন্ত ছিল—এখন তেমনি মাটীর পুতুল হইয়াছে; সাত চড়ে একটী কথাও কয় না।

নিমাই গুরু-পুরোহিতের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ছাত্র যাহা ছয় মাসে শিখিতে পারে না, নিমাই কয়েকবার দেখিবামাত্র তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে। অধ্যাপকগণ সকলে তাঁহার এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে বলিতে লাগিলেন—আমরা জীবনে কখন এমন ধীশক্তি সম্পন্ন ছাত্র দেখি নাই—নিমাই নিশ্চয়ই কোনও শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ। অসীম কষ্ট সহ্য করিয়াও পিতামাতা যদি পুত্রের সুখ্যাতি শুনিতে পান—তাহা হইলে স্বর্গসুখও তাঁহাদের কাছে তুচ্ছ। পুত্রের এমন হিতকারী বন্ধু জগতে আর কে আছে?

শচী-জগন্নাথের আনন্দের সীমা পরীসীমা নাই। পুত্রের প্রস্ফুটিত পদ্মের মত রূপ, চুয়া-চন্দন ম্রক্ষিত গাত্রের আঘ্রাণ ও অমানুষিক বুদ্ধি ও তেজপ্রভা দেখিয়া জগন্নাথ প্রতিদিন গৃহদেবতা রঘুনাথের নিকট প্রার্থনা করিতেন—"ঠাকুর! পুত্রটীকে সংসারী কর—তাহাকে

দীর্ঘজীবী করিয়া বংশের মান বৃদ্ধি কর—যেন তাহাকে কোন অপদেবতায় স্পর্শ করিয়া আমাদের এ সাধের নন্দনে, জীবন-প্রীতিকর এ শোভন উদ্যানে বিষের বাতি জ্বালিয়া না দেয়।" নিমাই এক একদিন অলক্ষিতে পিতার এই কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করতঃ লজ্জার হাসি হাসিয়া চুপে চুপে স্থান ত্যাগ করিতেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পিতৃবিয়োগ।

মানবের ভাগ্যে সুখ চিরকাল থাকে না। চক্রবৎ পরিবর্ত্তনে সুখের স্থান দুঃখের দারুণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া মর্ম্মদাহের করুণ আর্ত্তনাদ মুখরিত করিয়া ফেলে।

নবদ্বীপে নিমাইয়ের প্রগাঢ় যশঃপ্রতিষ্ঠায় শচীদেবী যখন জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের শোক-যন্ত্রণা একরূপ বিস্মৃত হইতেছিলেন, কনিষ্ঠের যশসৌরভ যখন তাঁহার হৃদয় হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনজনিত শোকানল ধীরে ধীরে মন্দীভূত করিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে এক বিষম দুর্দ্দৈব আসিয়া শচীর অন্তর কন্দর দারুণ তমসাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সকল উদ্যম, সকল উৎসাহ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল—সে দুর্দ্দৈব জগন্নাথের মৃত্যু।

যখন নিমাইয়ের বয়স প্রায় একাদশ বৎসর এবং শচীদেবী পঞ্চাশের কোঠা পার হইয়াছেন—জগন্নাথের বয়স তখন আন্দাজ ষাট বৎসর হইবে। এই সময়ে তাঁহাদের সংসারে আবার বড়ই অভাব—অনাটনের সূত্রপাত হয়। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে এতটা ছিল না, কারণ গ্রামে কোন কাজ পড়িলে তিনি দেখিতে পারিতেন—সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধ্যয়নও হইত কিন্তু বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিলে জগন্নাথকে নিজ গ্রাম ও ভিন্ন গ্রাম এবং দূরবর্ত্তী স্থানে কোন কাজকর্ম্ম

পড়িলেও করিতে হইত ; কাজেই অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইত, সময়ে স্নানাহার হইত না ; বিশ্রাম করিবারও তত সময় পাইতেন না।

এক হিসাবে পরিশ্রম যেমন স্বাস্থ্যেরও উপকারী, আর এক হিসাবে অতিরিক্ত পরিশ্রমও তেমনি অনুপকারী—ইহাতে অকালে মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহার উপর চিন্তার আধিক্য থাকিলে ত কথাই নাই। "চিন্তা জরো মনুষ্যানাম্" চিতা যেমন মৃত দেহকে পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে—চিন্তা তেমনি জীবিত দেহকে ধীরে ধীরে অস্থিচর্ম্ম সার করিয়া কালের কোলে তুলিয়া দেয়।

ভাবিয়া ভাবিয়া জগন্নাথের দেহ ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে ভীষণ জরাসুর তাঁহার সুন্দর বপু আশ্রয় করিয়া দিন দিন ক্ষয় করিতে লাগিল। জগন্নাথ উত্থানশক্তি রহিত হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসক ডাকিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করা হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অকালে জগন্নাথের অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া সকলে প্রমাদ গণিল, শচীদেবী কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু নিমাই তখন একপ্রকার মুখধরা হইয়াছেন ; ভালমন্দ, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সে এখন বেশ বুঝিতে পারেন—পিতার এই শেষ সময়ে তিনি জননীকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার অন্তিমের মঙ্গল কামনার জন্য পরামর্শ দিলেন, বলিলেন—"মা ! কাঁদিতে ত হইবেই—যাহা যাইতেছে, তাহার বিহনে কান্না ত সঙ্গের সাথী ; তবে পিতা যে আমাদের জন্য আজীবন পরিশ্রম করিলেন, এত করিয়া আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ বিধান করিলেন, এখন তাঁহার এই অসময়ে কিছু পথের সম্বল দাও,

কাঁদিবার সময় এ নয়—চল, তাঁহার পারত্রিক শুভকর্ম্মের আয়োজন করি।" এই বলিয়া নিমাই পিতার রোগজীর্ণ দেহ বক্ষে করিয়া খাটের উপর তুলিলেন; তার পর মাতা-পুত্রে ধরাধরি করিয়া পরকাল সম্বল হরিধ্বনি করিতে করিতে পতিত পাবনী সুরধুনীর কুলে আনয়ন করিলেন।

পরম পণ্ডিত ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য জগন্নাথের অন্তিম ক্রিয়া সমাধা করিতে লোকজনের অভাব ছিল না। যে শুনিল, সেই মর্ম্মাহত প্রাণে জগন্নাথের মহাযাত্রার অনুগমন করিল কিন্তু নিমাই সে পবিত্র দেহ আর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেন নাই। জননীসহ নিজেই তাহা সুরতরঙ্গিনী গাঙ্গিনী তীরে বহন করিয়া লইয়া গেলেন।

তখন নদীতে জুয়ার আসিয়াছে, গঙ্গা কুলে কুলে ভরিয়া যেন জগন্নাথের পবিত্র দেহ বক্ষে করিবার জন্য তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন; পরম জ্ঞানী জগন্নাথ মায়ের কুলে আসিয়া করযোড়ে সেই যোগীজন নিসেবিত পদে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রয়াণের কথা ভাবিয়া, এ মায়াময় সংসারের এমন পতিব্রতা স্ত্রী, এমন কুলপাবন পুত্র ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া জগন্নাথের কিছুমাত্র মালিন্য নাই, বদন সেইরূপ পূর্ণ দীপ্তিমান, হাস্যলাস্যযুক্ত। পরম জ্ঞানী জগন্নাথ জানেন—মৃত্যু জীবের অবস্থান্তর মাত্র, বাল্য যৌবন-প্রৌঢ় যেমন অবস্থা—এক যায়, এক আসে; আসবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করে—ইহাও সেইরূপ।

গর্ভধারিণী জননীর কোলে নিদ্রা আর পরম পাবনী প্রকৃতি জননীর কোলে চিরনিদ্রা। জননীর কোলে নিদ্রার জাগরণে এই আকাশ,

এ বাতাস, এই দেহ, এই গেহ, এই সব দেখা যায়; আর বিশ্বপ্রকৃতির নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে নূতন আকাশ, সে দেশের নূতন বাতাস—আর মণিময় গৃহে পরম প্রকৃতি বিশ্বপ্রসূতির কোটী পূর্ণচন্দ্রসম প্রভামণ্ডিত বদন দেখিয়া জীব ধন্য হয়। যাহার হৃদয়ে এ পরম জ্ঞানের দৃঢ়তা জন্মিয়াছে, যে বুঝিয়াছে—মৃত্যু নবজীবন লাভ ব্যতীত আর কিছুই নয়—তবে সে তাহার ভয়ে ভীত হইবে কেন? ক্রমশঃ দ্বিতীয় প্রহরের সময় জগন্নাথের শেষ মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিল। তিনি প্রাণের নিমাইকে চক্ষের সম্মুখে বসিতে বলিলেন—স্নেহের আলিঙ্গন দান করিয়া—তাঁহার হাতটী নিজের বুকে রক্ষা করিলেন। নিমাই পিতার অবস্থা দেখিয়া আর শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পার্থিব দেবতা, পরম গুরু পিতার চরণ দুইটী ধারণ করিয়া সজোরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন—"বাবা! সত্য সত্যই যদি অভাগাকে ফেলিয়া চলিলেন, তবে আমার দশা কি হইবে? আমি যে এত দুরন্তপনা করিয়াছি, আপনাকে এত কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্য স্নেহ অভিভূত হইয়া আমাকে একটী দিনের জন্যও শাসন করেন নাই—কেবল ভয় দেখাইয়াছেন মাত্র। পাছে আমার কিছু অমঙ্গল হয়, তজ্জন্য দেবতার স্থানে কত প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এখন আপনার সেই দুরন্ত নিমাইকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন?"

শেষ নিশ্বাস পড়িতে আর বেশী বাকী নাই, তথাপি জগন্নাথ অতি ধীরে ধীরে নিমাইকে বুকে করিয়া বলিলেন,—"অশান্ত বালক সুশান্ত হইয়াছে, নিজের জননী, জন্মভূমি বুঝিয়াছে, তাই তাহাকে গৃহদেবতা রঘুনাথের পদে সমর্পণ করিয়া চলিলাম, বাবা! তুমি আমাকে বিস্মৃত

হইও না।" তারপর পতিব্রতা সতী শচীদেবী যখন পদে ধরিয়া অশ্রুনীরে শেষ অভিষেক করিতে লাগিলেন, জলভরা নেত্রে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া যখন স্বামীর বদনের প্রতি চাহিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন, তখন জগন্নাথ প্রণয়পূত সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন—"সতী, আমি আজীবন তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, কখন কোনও দোষ দেখি নাই, তোমার পবিত্র সহবাসেই আজ আমার স্বর্গ লাভ হইবে, ভয় কি দেবী, জগতের দুর্লভরত্ন নিমাই রহিল।" এই বলিয়া ধার্ম্মিক জগন্নাথ সকলের নিকট শেষ বিদায় লইয়া মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

জগন্নাথের বিয়োগে নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ বণিতা শোক-সমাচ্ছন্ন হইল। স্বামী বিয়োগে পতিব্রতা পত্নীর অবস্থার বিষয় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। শচীদেবী চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি বহু শোক পাইয়াছেন, পুত্রকন্যার শোকে তিনি জর্জ্জরিভূতা হইয়া রমণীর পরমবল স্বামীর বলে একপ্রকার দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু আজ এই দুর্ব্বিসহ স্বামীশোক তাঁহার অমন সুন্দর দেহ ভাঙ্গিয়া চূড়মার করিল, শচীদেবী একপ্রকার কুব্জভাব ধারণ করিলেন। তথাপি পাছে দুধের বালক নিমাই এই দারুণ পিতৃশোকে অধীর হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে, এইজন্য অন্তরে বিষম আঘাত পাইলেও তিনি বাহ্যিক কিছু প্রকাশ করিলেন না। স্বামীর আজ্ঞায় নিমাইকে বুকে লইয়া শোকজ্বালা জুড়াইতে লাগিলেন।

যাটু বাষাট্টি বৎসরে মৃত্যু তখনকার খুব অকাল মৃত্যু ধরিতে হইবে। জগন্নাথের এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই মর্ম্মাহত, তাঁহার

বহু বয়োজ্যেষ্ঠ এখন বর্ত্তমান, কাজেই জগন্নাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বড় সুখের হইল না। তবে শচী ও নিমাইকে শুচি করিবার জন্য সামান্য রকম বৈদিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হইল। নিমাই ও শচী তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করিয়া দশম দিবসে অশৌচান্ত করিলেন. অবস্থানুসারে বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থা করিয়া ব্রাহ্মণাদি ভোজন কার্য্যও যথাসম্ভব সমাধা করা হইল।

শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধার পর শচী পিতৃভক্ত পুত্রকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কোথায় তিনি কাঁদিয়া কাটিয়া হৃদয়ের দারুণ ব্যথা নিবারণ করিবেন, না নিমাইকেই দারুণ শোকে মুহ্যমান দেখিয়া, হৃদয়ের দ্বারা তাহার হৃদয় চাপিয়া অশেষ সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন; কোমল হৃদয় নিমাইকে নানা প্রকার সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পুত্রের সেবা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিলেন না।

তখনকার কালে তাঁহাদের সংসারের ব্যয় অতি অল্প ছিল। জগন্নাথের মৃত্যুর পর অতিথি অভ্যাগত বড় কেহ আসিত না, কাজেই এক প্রকার দুঃখে কষ্টে কাল কাটিয়া যাইত। তবে নিমাইকে আর ঘরে বসাইয়া রাখা হইবে না, তাহা হইলে শোক আরও বেশী হইবে; কিন্তু তিনি পতিহীনা নিঃসহায়া স্ত্রীলোক কি করেন, একদিন অধ্যাপক মহাশয়কে অনুনয় বিনয় করিয়া ধরিলেন। অধ্যাপক গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য অতীব আহ্লাদের সহিত পুনরায় পিতৃহীন বালকের ভার গ্রহণ করিলে জননী নিশ্চিন্ত হইলেন।

নিমাই এখন খুব অমায়িক প্রকৃতির বালক হইয়াছে। তাহার মৃত

ছাত্রকে পড়াইতে পারিলে অধ্যাপকের খোস্ নাম হইবে, নিমাই এখন পড়ায় যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে; তাহাতে শীঘ্রই সে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইবে, অধ্যাপকের মুখোজ্জ্বল করিবে। জননীর আজ্ঞায় নিমাই গঙ্গাদাসের নিকট আসিয়া প্রণাম করিলেন, গঙ্গাদাস তাঁহাকে অভয় দিয়া "তুমি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য।

.যাগযুক্ত হইয়া কার্য্য কবিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। নিমাই পিতৃবিয়োগেব পব জননীব সাহায্যে পুনবায গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রবিষ্ট হইয়া এমন মনোযোগ সহ পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত লইযা উঠিলেন।

ব্যাকবণ শাস্ত্রে গঙ্গাদাসের মত পণ্ডিত আব কেহ ছিল না, কিন্তু তিনিও সময়ে সময়ে নিমাইয়েব তর্ক-যুক্তিতে বিপন্ন হইয়া পড়িতেন। নিমাইযের বয়স সে সময ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, টোলে তাঁহার অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র ছিল। অলঙ্কারে কমলাকান্ত, তন্ত্রশাস্ত্রে কৃষ্ণানন্দ বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। নিমাই ইঁহাদের সহিত তর্ক কবিতে অগ্রসর হয়েন কিন্তু তাঁহারা নিমাইকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেও তিনি ছাড়িতেন না। রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তিনি বয়সে কিছু ছোট বলিয়া নিমাই তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, মুরারিগুপ্ত নামক আর একজন ছাত্রের সহিত নিমাইয়ের অহরহঃ তর্কযুদ্ধ চলিত, মুরারি তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিতেন না; লজ্জিত হইয়া হার মানিলে নিমাই সান্ত্বনাচ্ছলে তাহার গায়ে হাত বুলাইলে মুরারির দেহ কণ্টকিত হইত, কি এক স্বর্গীয় প্রেমপুলকে

মন প্রাণ পুলকিত হইত। কত লোকের কত কোমল হস্ত তাহার দেহে স্পর্শিত হইয়াছে ; অধ্যাপকগণের কত সুন্দর হস্তের স্পর্শে সুখানুভব তিনি করিয়াছেন, কিন্তু কই এমন শান্তি, এমন আনন্দ, প্রাণে এমন একটা উন্মাদনা ত কাহার স্পর্শে পান নাই ; তবে এ বালক কে ? বাল্যকালে নিমাইয়ের সহিত তাহার সময়ে সময়ে কত কলহ, কত বিবাদ হইত, এখনও তাহাই হয়। মুরারি ভাল করিয়া বুঝিলেন, ভাল করিয়া দেখিলেন, নিমাইয়ের সেই অম্লান সরোজ সন্নিভ বদনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ভাবিলেন—একি মানুষের মুখ ? এত সুন্দর, এত মনোরম!

যে দিন হইতে মুরারি নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেইদিন হইতে নিমাই মুরারিকে আর কোন কথা বলিতেন না বা তাহার কাছে কোন তর্কযুক্তির বিষয় উত্থাপন করিতেন না। তিনি এখন অহোরাত্র অধ্যয়ন করেন, কোন শাস্ত্রই বাদ দেন না, দেখিতে দেখিতে তিনি সকল শাস্ত্র বিশারদ ও সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। নবদ্বীপে এত অল্প বয়সে আর কাহাকেও এমন সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে দেখা যায় নাই।

বৈকালে নিমাই সুরধুনীর তীরে পদচারণা করিতেন, বহু পণ্ডিতের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইত, সকলেই সুন্দর বালকটির সৌজন্যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রীতিলাভ করিয়া প্রাণের আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেন। তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন, নিমাই হিন্দুর সকল শাস্ত্র এমন সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, লোকের মনোমধ্যে ধর্ম্মের ভাব এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, যাহা অপরাপর কোনও পণ্ডিতের ছিল না। সমপাঠী ছাত্রগণের সহিত তিনি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেন, তর্কেরছলে কোনপ্রকার

দোষ করিলে বারান্তরে তিনি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। বৈষ্ণবগণের সহিত নিমাই কেবল তর্কযুদ্ধ করিতেন, তান্ত্রিকদের সহিত বয়সের অধিক্য বশতই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক, তর্কযুদ্ধ বা কলহ করিতে যাইতেন না। কৃষ্ণানন্দ, কমলাকান্ত, মুরারি প্রভৃতি তাহার সহপাঠী কিন্তু মুরারি ব্যতীত অপর কাহারও সহিত তিনি শাস্ত্রের কুটতর্ক করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হইতেন না।

নিমাই যখন ঘরে বসিয়া থাকিতেন, কাজকর্ম্ম বেশী কিছু থাকিত না ; তখন তিনি ব্যাকরণের একখানি টিকা রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়িয়া তিনি যে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন—এই টিকাই তাহার নিদর্শন।

নবদ্বীপে কাহারও কোন পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করা কঠিন ব্যাপার হইলেও নিমাইয়ের এই টিকা অতি অল্পদিনের মধ্যে টোলসমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। তাহা এত সরল ও সুন্দর হইয়াছিল যে, ছাত্রগণ সহজেই তাহা বোধগম্য করিয়া ব্যাকরণের কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারিত।

সকল শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া নিমাইয়ের ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার বড় ইচ্ছা হইল। মিথিলা প্রত্যাগত ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেই সময় নদীয়ার বিদ্যানগর গ্রামে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিমাই আপনার অসাধারণ প্রতিভার প্রোজ্জ্বল মহিমায় ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, দর্শন, অলঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাসুদেবের

টোলে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইকে অতিশয় বালক দেখিয়া সার্ব্বভৌম প্রথমে কিছু অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন—নিমাই বালক, এত অল্প বয়সে সে ন্যায়ের কুটতর্ক কি উপলব্ধি করিবে? কিন্তু টোলের ছাত্রগণ তাঁহাকে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ন্যায়ের প্রধান ছাত্র রঘুনাথ এই বালকের অসাধারণ ক্ষমতা, তাহার মধুর চরিত্রের অমায়িকতা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, নিমাই সামান্য ছাত্র নহেন। জগতে সর্ব্বপ্রধান হইবার জন্য তাঁহার যে আশা এতদিন হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, নিমাইকে দেখিয়া, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া সে আশা তিরোহিত হইল, চতুষ্পাঠীতে নিমাইকে সকলে বিশ্বম্ভর বলিয়া ডাকিত, মনের আশা মনে লয় হইলেও রঘুনাথ বিশ্বম্ভরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন।

ক্রমে ক্রমে নিমাইয়ের উপর সার্ব্বভৌমের নজর পড়িল, তিনি দিন তাঁহাকে পাঠ দিতে আসিয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা য়া বুঝিলেন—বিশ্বম্ভর সামান্য বালক নহে, সেইদিন হইতে বাসুদেব বিশ্বম্ভরকে নিয়মিত পড়াইতে লাগিলেন। এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে নিমাই নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া এমন পরিপক্কতা লাভ করিল যে, সময়ে সময়ে সার্ব্বভৌমও তাঁহার সহিত যুক্তিতর্কে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেন।

নিমাই তখন টোলের প্রধান ছাত্র মধ্যে গণ্য হইয়া অধ্যাপকের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। রঘুনাথও বহুদিনের পুরাতন ছাত্র, ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, দুইজনে অত্যন্ত প্রণয় হইল। নিমাই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের

সময় তাহার একখান টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মনেব ইচ্ছা, এই বিষম কঠিন শাস্ত্র সবল কবিয়া বাখ্যা করতঃ তাহাব ব্যাকবণের টীকাব ন্যায় সমাজে চালাইতে পাবিলে ছাত্রবর্গেব অনেক উপকার হইবে। কিন্তু ইহাব পূর্ব্বে বঘুনাথ দধিতি নামে ন্যায়েব একখানি সবল ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন।

যখন তিনি শুনিলেন—বিশ্বম্ভব ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতেছেন, তখন তাঁহার প্রাণে বড়ই দুঃখ হইল, বিশ্বম্ভব ইহাতে মনোযোগ দিলে তাহার পবিশ্রম যে ব্যর্থ হইবে, তাঁহাব টিপ্পনী যে চলিবে না, তাহা বুঝিতে পাবিয়া একদিন বিশ্বম্ভবকে তাহাব সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবিলেন। বিশ্বম্ভব বলিলেন—"হাঁ চেষ্টা করিতেছি।" বঘুনাথ একবার তাহা শুনিতে চাহিলেন, বিশ্বম্ভব বলিলেন—"কল্য শুনাইব।"

পরদিন গুরুদেবেব কোনও কার্য্যোপলক্ষে যখন দুইজনে গঙ্গা পার হইতেছেন। তখন বিশ্বম্ভব বলিলেন—"ভায়া! আমাব ন্যায়ের টিপ্পনী শুনিবে কি?" বঘুনাথ তাহাই চাহিতেছিলেন, আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"শুনিব বৈকি।"

নিমাই পাঠ করিতে লাগিলেন, বঘুনাথ নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিয়া বিষাদে মুখ ম্লান কবিলেন। বঘুনাথ পণ্ডিতের বড় আশা ছিল—তাহারই কৃত গ্রন্থ জগতে সমাদৃত হইবে, কিন্তু বিশ্বম্ভর যদি ইহা প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ কেহই স্পর্শ কবিবে না। বিশ্বম্ভরের তুলনায় তাঁহার গ্রন্থ নগণ্য। পরিশ্রম বিফল হইল দেখিয়া রঘুনাথ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। গ্রন্থ পাঠ শুনিতে শুনিতে বন্ধুবর কাঁদিয়া ফেলিলেন, দেখিয়া নিমাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! একি,

তুমি কাঁদিতেছ কেন, হঠাৎ কি কোন পীড়া হইল?" রঘুনাথ সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"ভাই, পীড়া হয় নাই, আমার সকল আশায় ছাই পড়িল, আমিও একখানি এরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম কিন্তু তোমার যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, তাহাতে আমার পরিশ্রম পণ্ড, তুমি ইহা প্রচার করিলে আমার আদর হইবে না।"

বিশ্বম্ভর বলিলেন—"এই কথা, ইহার জন্য তোমার ক্রন্দন—ভাই! এসকল শাস্ত্র আমার প্রচার করিবার ইচ্ছা নাই, যদি তোমার উপকার হয় ত হউক", এই বলিয়া এতদিনের পরিশ্রমোপার্জ্জিত অমূল্য গ্রন্থ থানিকে তিনি অম্লানবদনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া সেইদিন হইতে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চায় ইস্তফা দিলেন।

নিমাই এখন আর কোথাও যান না, বাড়ীতেই থাকেন কিন্তু তাঁহার যশোসৌরভ, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি, এতদূর প্রচারিত হইয়াছিল যে, সুদূর মিথিলার সকলে নিমাইকে পণ্ডিত আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার সুনাম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের মত পণ্ডিত আর কেহ নাই, নবদ্বীপে তিনিই অদ্বিতীয়, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মুখে কেবল এই কথা।

"বিদ্যা বিনয়ং দদাতি" এখন নিমাইয়ের সে চপলতা, সে দুষ্টামি আর নাই, তপনোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত তাহা তিরোহিত হইয়াছে। নিমাই এখন মহা বিনয়ী, মহা অমায়িক প্রকৃতি লইয়া সকলের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইতে লাগিলেন। শোকাতুরা জননীর কাছে কাছে থাকিয়া নানা প্রকার আশার আশ্বাসে তাঁহার উৎসাহ-উদ্যমহীন প্রাণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

নিমাইকে মানুষ হইতে দেখিয়া, পুত্রের যশে চারিদিক সমুজ্জ্বল বুঝিয়া শচীদেবী আবার আশায় বুক বাঁধিয়া সংসারকার্য্যে পরিলিপ্ত হইলেন।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

জননীর বিষাদ কালিমাময় বদন যখন পুত্রের সুনাম-সুখ্যাতিরূপ সৌভাগ্যসূর্য্যে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মলিন মুখে যখন আবার নব উৎসাহের অরুণিমা ফুটিয়া উঠিয়া অবিন্যস্ত গৃহপ্রাঙ্গনের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি আবদ্ধ করিল, নিমাই তখন ব্রহ্মচার্য্য ছাড়িয়া গুরুর আদেশে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিলেত গৃহিণী চাই, গৃহিণী না হইলে কেমন করিয়া গৃহী হওয়া যাইবে? বিশেষতঃ জননী স্বামীহীনা, শোকাতুরা, তাঁহার সাহায্যের জন্য, তাঁহার সেবাতৎপরা হইবার জন্য, সংসারের কার্য্য ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য একজন সহধর্ম্মিনী নিতান্ত আবশ্যক।

শচীদেবীও পুত্রকে সকল গুণের গুণনিধি দেখিয়া তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ন্যায় বিদ্যাবিভব সম্পন্ন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য পাত্রের বিবাহের জন্য শচীদেবীকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইল না। শচীদেবী পুত্রের বিবাহ দিবেন শুনিবামাত্র কত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া নিমাইয়ের বাটীতে পড়িল। তাহার মধ্যে বনমালী ঘটকের ঘটকালিতে নিমাইয়ের শৈশবসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভাচার্য্যও আসিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—বাল্যকালে গঙ্গাতীরে নিমাই বল্লভাচার্য্যের

আদরের দুহিতা লক্ষ্মীদেবীর সহিত খেলা করিতেন। এক্ষণে তাহার সেই সরলতা, তাহার সেই ধর্ম্মভাব, তাহার সেই সৌন্দর্য্য মাতাপুত্রের মনে যুগপৎ সমুদিত হইল। শচীদেবী বল্লভাচার্য্যকেই আশ্বাস প্রদান করিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন।

বহুদিন পরে আবার শচীর নিরানন্দময় অঙ্গনে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। নিমাইয়ের বিবাহে পাড়ার সকলে আসিয়া যোগদান করিল। নিমাই শুধু পিতামাতার নহে, প্রতিবেশী সকলের নয়নের মণি—আনন্দের উৎস, সকলেই তাঁহাকে পাইলে যখন আনন্দে বিভোর হয়, তখন আর তাঁহার এ আনন্দ উৎসবে, এ শুভ পরিণয়ে কে যোগদান করিতে বাকী থাকিবে?

একদিন শুভযোগে পাড়ার এয়োস্ত্রীগণকে ডাকিয়া শচী নিমাইয়ের গাত্রে হরিদ্রা প্রদান করাইলেন, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"মা, আমরা দরিদ্র, ত্রুটী হইলে মার্জ্জনা করো", সকলে শচীর মত দেবীকে, এমনভাবে, 'কিন্তু' হইতে দেখিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ মা, তুমি নিমাইয়ের মা, তোমাকে কি অমন কথা বলতে আছে—, আমরা যে তোমার নিমাইয়ের বাধ্য, আমরা যে তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি, একার্য্য আমাদেরও যে বড় আনন্দের, তুমি অমন কথা বলনা মা। শচী তথাপি সাধ্যানুসারে সকলকে সংবর্দ্ধনা করিতে ছাড়িলেন না।

গাত্র হরিদ্রা দান করিয়া রমণীগণ আনন্দে হুলুধ্বনি করিতে লাগিল। সকলে জানে বিবাহের তুল্য আনন্দ আর নাই, এ আনন্দে নিমাই আনন্দিত হইয়া কত কথা কহিবে, কিন্তু তিনি নীরবে কাঁদিতে

লাগিলেন। এ আনন্দের উৎসব উপলব্ধি করিয়া নিমাইয়ের শোকসাগর উথলিয়া উঠিতে উঠিল। পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য তাঁহার দুনয়নে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। পুত্রের শুভবিবাহে শচী সমস্ত শোক জ্বালা ভুলিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেছিলেন, হঠাৎ নিমাইকে প্রাপুস্নয়নে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহারও সুপ্তশোকবহ্নি নবীভূত হইয়া মনপ্রাণ দগ্ধ করিতে লাগিল। পাছে নিমাই শোকাভিভূত হইয়া এ শুভকার্য্যে কোনও অশুভ ঘটনায়, এইজন্য তিনি বহুকষ্টে এ সুখের দিনে শোকের কোনও চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু নিমাই অগ্রে সেপথ দেখাইলে শচী আর থাকিতে পারিলেন না, জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম করিয়া স্বর্গগত স্বামীর শোকে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

মাতাপুত্রের এইভাব দেখিয়া সকলে ষাট্‌ ষাট্‌ বলিয়া নিষেধ করিতে করিতে বলিল—"ছিঃ মা, এ শুভকার্য্যে ও অশুভ ভাব আনিয়া কেন মাঙ্গলিক কার্য্যটাকে নষ্ট করিতেছ, এ সময় কি চক্ষের জল ফেলিতে আছে? শচী, মা, স্থির হও, নিমাইকে সান্ত্বনা কর।" জননী বুঝিলেন—বাস্তবিক পুত্রের এ মঙ্গল-উৎসবে চক্ষের জল ফেলা ভাল নয়। তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বুকে ধারণ করিলেন।

শুভদিনে শুভলগ্নে নিমাই পণ্ডিত বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া বাটী ফিরিলেন। আচার্য্য মহাশয় নিমাই পণ্ডিতকে জামাতারূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন, ক্ষমতানুসারে তাঁহাকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত কন্যার পিতাকে দেনা-পাওনার জন্য কোনও প্রকার পীড়ন করেন নাই। শচী দেবীও বৈবাহিক আচার্য্যকে সেজন্য উৎপীড়িত

করিতে চেষ্টা করেন নাই। আচার্য্য যাহা পারিয়াছিলেন, ক্ষমতানুসারে যাহা দিতে তাঁহার অবস্থায় কুলাইয়াছিল, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা জাতাংশে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার পুত্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য বলিয়া আজ কাল্কার মত অহঙ্কারে কন্যার পিতাকে পদদলিত করেন নাই।

নব বধুর সমাগমে সংসার উজ্জলভাব ধাবণ করিল। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং লক্ষ্মীরূপে শচীর সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী নব বিবাহিতা হইলেও এঘর তাঁহার নূতন নহে, বরও শ্বশ্রূ অপরিচিত নহেন, বাল্যপ্রণয়ে লক্ষ্মী-নিমাই বহুদিন হইতে একসূত্রে গাঁথা, তাই নব বধুর মত বাধাবিঘ্ন লক্ষ্মীকে বাধা দিতে পারিল না। তিনি শ্বশ্রূসেবায়, স্বামীভক্তিতে এবং সংসার ধর্ম্মে সকলের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া আদর্শ সংসার স্থাপন করিলেন। লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহের অল্পদিন পরেই এইরূপ পাকা গৃহিণীর মত সংসার করিতে দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। শচীদেবী শোক-দুঃখে একটু জড়ীভুত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বধুমাতাকে এইরূপ সংসার-কার্য্যে সুনিপুণা দেখিয়া তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী বৃদ্ধা শাশুড়িকে আর বেশী পরিশ্রম করিতে দেন না, বলেন—"মা, আপনি যতটুকু পারিবেন, ততটুকু করিরেন, না পারেন কোন ক্ষতি নাই, দাসী যখন আসিয়াছে, তখন ভাবনা কি? যখন যাহা আবশ্যক হইবে, অনুমতি করিলেই আমি তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিব। যাহা না জানি, কন্যার মত মায়ের কাছে শিখিয়া লইব। আপনি এতদিন

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সংসারে দেহপাত করিয়াছেন, এক্ষণে এই কন্যার হাতে সমস্ত সমর্পণ করিয়া বিশ্রাম করুন।" শচীদেবী পুত্রবধুর এই অল্প বয়সে এত সংসারাসক্তি ও ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিতেন—"আমার ঘরে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে, তখন আর ভাবনা কি, মনের মত বউ হইলে শাশুড়ী আর খাটিবে কেন?"

লক্ষ্মী বলিতেন—"মা, দাস দাসী থাকিতে কর্ত্রী কখনও পরিশ্রম করেন না, তবে হুকুম করিতে ছাড়িবেন না, কারণ আমিত আপনার মত পাকা হই নাই?" "হাঁ মা, সেজন্য চিন্তা নাই, আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমায় সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিব।" যেমনি ছেলে, বউটীও তেমনি, শচী এতদিন পরে সুখের সংসারে আনন্দের বাজার বসাইলেন, পরমানন্দে তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সংসার ধর্ম্ম।

অর্থ না হইলে সংসাবে থাকা দায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—নিমাইয়ে সংসাব সচ্ছল ছিল না, বিশেষতঃ জগন্নাথ স্বর্গগত হইবাব পর তাঁহাদেব সংসারে বডই অনাটন সংঘটন হইয়াছিল। নিমাই খুব বড় পণ্ডিত হইয়াছেন, নবদ্বীপে তাঁহাব মত বড পণ্ডিত আব কেহ নাই কিন্তু তাঁহার বয়স বেশী নয় আব উপার্জ্জনেব চেষ্টাও এখন কবেন নাই। এইজন্য আবও অনাটন হইয়া পডিয়াছিল।

এইবার বিবাহ হইযাছে, সংসাব-পথে প্রবেশ করিয়া অর্থের আবশ্যক হইল। নিমাই কিছু অর্থ উপার্জ্জনের জন্য প্রথমে বাড়িতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিলেন। তিনি টোল স্থাপন কবিয়াছেন শুনিয়া অল্পদিনের মধ্যে এত ছাত্র সমাবেশ হইল যে, তাঁহাব বাটীতে তা[illegible] স্থান সঙ্কুলান হইল না।

মুকুন্দ সঞ্জয় নামক একজন ধনী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাটীর নিকটে বাস কবিতেন, বাহিরে তাঁহাব একখানি খুব বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। মুকুন্দ নিমাইকে বড় ভালবাসিতেন, তাহার উন্নতি দেখিয়া ব্রা[illegible] সাগ্রহে তাহা[illegible] [illegible]গুপে টোল স্থাপন করিতে নিমাইকে [illegible] দিলেন। অতঃপর সেই স্থানেই নিমাই পণ্ডিতের টো[illegible] হইল। যখন নিমাই অধ্যাপক বলিয়া টোল খুলিলেন, তখন

রে নিমাই।

ষোল কিংবা সতের বৎসর, এত অল্প বয়সে নবদ্বীপে আর কেহ ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারেন নাই, নিমাই পণ্ডিতই প্রথম। সময় হইতে নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার আসিয়া নিমাইয়ের অভাব .টন দূর করিয়া দিল। নিমাই সচ্ছল সংসারে মনের আনন্দে ছাত্রগণকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন।

পুত্রের উন্নতিতে জননী দ্বিগুণ উৎসাহে বধুমাতাকে লইয়া সংসার কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। শাশুড়ী বধুতে কটাদেশে কাপড় বাঁধিয়া এতগুলি ছাত্রের আহার যোগাইতে লাগিলেন, একদিনের জন্য কোন প্রকার কষ্ট বা দুঃখ বোধ করিলেন না। শচীর পুত্রসম যত্নে, নিমাইয়ের সহোদরাধিক স্নেহে ছাত্রগণ মনের আনন্দে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। দেশ বিদেশ হইতে যে সকল ছাত্র নিমাই পণ্ডিতের টোলে আসিয়াছিল, তাহারা শচীর যত্ন ও পণ্ডিতের সরল অন্তঃকরণে পড়াইবার ধরণ দেখিয়া শতমুখে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল—"আমরা অনেক টোলে পড়িয়াছি কিন্তু অধ্যাপকের এমন সরলতা এবং আহারের এমন সুবন্দোবস্ত আর কোথাও দেখি নাই।" যে ছাত্রের যে দিন যেরূপ আহারের প্রয়োজন হইত, শচী মা তাহাকে তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিতেন। অসুখে অসুখের মত পথ্য ও সেবার ত্রুটী হইত না।

যখন নিমাই পণ্ডিতের নাম খুব জাহির হইয়াছে, পণ্ডিত বলিয়া র বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে। সেই সময় শ্রীপাঠ কুমারহট্ট নিবাসী বৈদ্যবংশীয় প্রভুপাদ ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক ল বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হন, মাধবেন্দ্রপুরী নামক

জনৈক মহাপুরুষের শিষ্য। মাধবেন্দ্র বৈষ্ণবের শিরোমণি ছিলেন, নানা প্রকার যোগযাগে তিনি পরম পারদর্শী হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, জ্ঞানের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিমার্গে বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন। তিনি জগতে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও পুরুষ দেখিতে পাইতেন না, তিনি এ জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেন।

ঈশ্বরপুরী এই মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য. দেহ রক্ষার সময় তিনি ঈশ্বর-পুরীকে তাঁহার সমুদয় প্রেম প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—নদীয়ায় শীঘ্রই তুমি ভগবান দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবে, ভগবানের অবতার গ্রহণ করিতে আর বেশী বিলম্ব নাই।

গুরুর আদেশে ঈশ্বর ঈশ্বর দর্শন মানসে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। গদাধর, বিদ্যাধর প্রভৃতি কয়েক জন তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ঈশ্বরপুরী শ্রীমদ্ভাগবতে মহা পণ্ডিত, সর্ব্বদা ভাবে বিভোর, কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শিষ্যগণ সঙ্গে আনন্দে কাল যাপন করিতেন।

ভগবান নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কোথা? আজ কাল ত এখানে নিমাই পণ্ডিতের নাম-ডাক খুব, সকলেই বলে মিশ্রপুত্র নিমাই পণ্ডিতের তুল্য পণ্ডিত ভূভারতে নাই। কিন্তু সে বড় চঞ্চল, তার বালকত্ব এখনও ঘুচে নাই। তাই ভক্ত ভাবুক পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর ইচ্ছা থাকিলেও সে বালকের সহিত দেখা করিলেন না। কিন্তু একদিন পথে যাইতে যাইতে উভয়ে দেখা হইল। নিমাই ভক্তিভরে ভক্তের চরণে

, গদাধর ও গোবিন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ বলিল—"ইনিই পণ্ডিত।" ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

। চক্ষু যেন অচল হইয়া গেল, আর অন্যদিকে তাহার

ফিরাইতে যেন ইচ্ছা হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন—"মরি মরি কি অপরূপ রূপ, মনুষ্য পুত্রের কি এরূপ রূপ সম্ভব, অথবা কোন সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ নদীয়া পবিত্র করিতে আসিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী প্রভুকে স্তম্ভিত হইতে দেখিয়া নিমাই মৃদুহাস্য করতঃ বলিলেন—"প্রভুপাদ, অদ্য আমাদের কুটীরে পদার্পণ করিলে ধন্য হইব।" ঈশ্বরপুরী অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, সাগ্রহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। সেইদিন হইতে পণ্ডিতে পণ্ডিতে পরিচয় ও সম্ভাব জন্মিল। ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণলীলামৃত নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ তাহা পাঠ করিতেন, গদাধর, গোবিন্দ নিমাই প্রভৃতি সকলকে তাহা শ্রবণ করাইয়া বলিতেন—"যদি কোথাও অসঙ্গত থাকে নিমাই, তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিও।" নিমাই পণ্ডিত দাম্ভিকতা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—"ভক্তের ভক্তিসূত্রে গাঁথা ফুলহার কখন দুর্গন্ধ হইতে পারে না, তাহা সর্ব্বদাই সকল সময় সকলের প্রিয় হইবে।" তথাপি পণ্ডিতের অনুরোধে নিমাই একদিন একটী শ্লোকের ধাত্বার্থ ভুল ধরিলেন। ঈশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না, তারপর বহু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—"তুমি ঐ পদটিকে পরস্মৈপদী রাখিতে বল কিন্তু আমার মতে আত্মনেপদী রাখিলেই ভাল হয়।" নিমাই আত্মনেপদীর ভাব বুঝিয়া মস্তক অবনত করিলেন, তিনি ভাবে গদ গদ হইয়া হার স্বীকার করিলেন।

তারপর ঈশ্বর পুরী নিমাইয়ের প্রাণে প্রেমের বন্যা ই সময় শ্রীপাঠন নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন, সেইদিন হইতেই নিমাইয়ের নামক অনেক লাগিল। তিনি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন চন্দ্রপুরী নামক

মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। নিমাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া ঈশ্বর পুরীর উপর শচীদেবীর অভক্তি জন্মিল। তিনি সন্ন্যাসী, না জানি আমার ছেলেকে কি গুণ করিয়া পলাইয়া গেলেন—নিমাই আমার এমন করে কেন?

কিছুদিন পরে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার ছাত্রগণ সঙ্গে অহনিশ বিদ্যা শিক্ষায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের টোল এখন দেশ বিখ্যাত এবং তাহার অবস্থাও খুব উন্নত—ধন, ধান্য এবং টাকা পয়সার কোন অভাব নাই। ছাত্রগণ মনের সুখে পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। অন্যান্য অধ্যাপকের টোলে ছাত্রগণ অনবরত অধ্যয়ন করেন, অধ্যাপক ঘোর পরিশ্রম করিয়া শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, তথাপি নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণের সমকক্ষ করিতে পারেন না, খুব বুদ্ধিহীন ছাত্রও কিছুদিন নিমাই পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিলে—কি জানি পণ্ডিতের কি গুণে, কোন্ অমানুষিক শক্তি বলে সে ঘোর মেধাবী এবং বিচক্ষণ হইয়া যায়। তখন অন্যান্য টোলের ভাল ছাত্রকেও তাহার নিকট হার মানিতে হয়। বেশী পরিশ্রম না করিলেও নিমাই মুর্খকে পণ্ডিত করিতে পারে—এইরূপ একটা জনশ্রুতি চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে নিমাই পণ্ডিতের টোলে ছাত্রের এত অ-
হইল যে, মুকুন্দ সঞ্জয়ের তত বড় চণ্ডীমণ্ডপেও
হইল না।

নবদ্বীপের নাম তখন বিদ্বজন সমাজে অ
দেশ আর নাই, বিশেষতঃ নিমাই পণ্ডিত নব
প্রতিভা লইয়া জন্মাইয়াছেন—তেম
জন্মে নাই, আঠার বৎসরের ছেলে

দেখে নাই। নিমাই পণ্ডিত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ না হইলে এমন শক্তি সাধারণ মানুষের হইতে পারে না।

এই সময় কাশ্মীব দেশ হইতে কেশব কাশ্মীরী নামক একজন পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে সকল দেশে জয় করিয়া নদীয়ায় পণ্ডিতগণেব সহিত তর্ক যুদ্ধ কবিতে উপস্থিত হইলেন।

জনরবে শুনা গেল—কেশব সরস্বতীর ববপুত্র, তাই নবদ্বীপের কোনও পণ্ডিত আব তাঁহার সহিত বিচার করিতে অগ্রসব হইল না—সকলেই সভয়ে কোঠরগত হইয়া আপন আপন মান বাঁচাইলেন। যখন কোন পণ্ডিতকে তাঁহাব সম্মুখীন হইতে দেখিলেন না—তখন কেশব হাস্য কবিয়া বলিলেন—"এই নবদ্বীপ, ইহারই মিথ্যা জনরব এত প্রচারিত হইয়াছিল।"

কেশবের এই দাম্ভিকতা বেশী দিন বহিল না। একদিন গ্রীষ্মেব শুক্লা রজনীতে নিমাই দারুণ গ্রীষ্মের সমতা প্রার্থনায় শিষ্যগণসহ গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন। চারিদিকে শিষ্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া কখন শাস্ত্রালাপ, কখন কখন বা হাস্য পরিহাস—রহস্যালাপ করিতেছেন।

কার উত্তাপ অসহ্য হওয়ায় কেশবও ভাগিরথী তীবে আসিয়া
থয়া পরিচয়ে জানিলেন—ইনিই নিমাই, নদীয়ার
শ্মীবী পণ্ডিতের দিগ্বিজয়া আখ্যা—অতএব
রপুর। তিনি নির্ভয়ে নিমাইয়ের নিকট
পরিচয় প্রদান করিলেন। নিমাই সসম্মানে
আসন দান করিলেন।" কেশব
"তোমার নাম কি নিমাই পণ্ডিত,

দেখিতেছি তুমি নিতান্ত বালক, এত অল্প বয়সে কি পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছ?" নিমাই নম্রতা দেখাইলেন—কোন কথা কহিলেন না। কেশব নিমাইয়ের নাম শুনিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে নিতান্ত বালক দেখিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতঃ বলিলেন—"আমার বিবেচনা হইয়াছিল, তুমি বৈয়াকরণিক, না জানি তুমি কত বয়স্থ।"

নিমাই বলিলেন—"আজ্ঞে না, আমি বয়স্থ নই এবং ব্যাকরণও তাদৃশ জানি না। এক্ষণে সৌভাগ্য বশে আপনার ন্যায় পণ্ডিতের দর্শন পাইয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে পতিত পাবনী ভাগীরথীর একটা স্তব শুনাইয়া কর্ণকুহর পবিত্র করুন। কেশব পণ্ডিত অহঙ্কারে স্ফীত বক্ষ হইয়া অতি দ্রুত একটী শ্লোক আওড়াইয়া গঙ্গার বন্দনা করিতে লাগিলেন। পাঠ শেষ হইলে—নিমাই তাঁহার শ্লোকের নানা দোষ ধরিয়া দিলেন। পণ্ডিত এত লোকের সম্মুখে বালক নিমাইয়ের যুক্তিতর্কে এক প্রকার পরাস্ত হইয়া বাসায় গমন করিলেন। সে দিন দুর্ভাবনায় তাঁহার ভাল নিদ্রা হইল না, তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—তাঁহার আরাধ্যা সরস্বতী দেবী শিরোদেশে বসিয়া বলিতেছেন—"বৎস! একি ধৃষ্টতা করিতেছ? কাহার সহিত তুমি তর্ক-যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছ, উনি যে আমার স্বামী, ত্রিজগতে এমন সাধ্য কার আছে, যে তাঁহার সহিত বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে।" কেশব স্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, মনে মনে বলিলেন—"হায়, আমি কি কুকার্য্যই করিয়াছি, সামান্য বিদ্যালাভ করিয়া জ্ঞানদাতা ভগবানের সহিত তর্ক করিতে অগ্রসর হইয়াছি।"

কেশব সমস্ত রাত্রি দারুণ মর্ম্মপীড়ায় অভিভূত হইয়া প্রাতঃকাল

হইবামাত্র দ্রুত গমনে নিমাইয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন—"বিশ্বম্ভর! আজ আমার দর্পচূর্ণ হলো, ভারতের সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করে, আজ তোমার নিকট পরাস্ত হয়েও আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি; তুমি যে কি বস্তু তা চিনেছি; এ ভারত ত কোন ছার, পাণ্ডিত্যে ত্রিজগতে তোমার সমকক্ষ কে হতে পারে প্রভু! নবদ্বীপ আজ তোমার চরণ-ধূলিস্পর্শে পবিত্র, স্বর্গ সুষুমা মণ্ডিত, নবদ্বীপবাসী আজ ধন্য, আজ আমিও এ পবিত্র রাজ্যে আসিয়া কৃতার্থমন্য হইলাম।" এই বলিয়া কেশব কাশ্মিরী ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ সমস্ত অহঙ্কার, সমস্ত মাৎসয্য বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পত্নী-বিয়োগ।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করিলেন দেখিয়া অধ্যাপকমণ্ডলী একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—"আমরা গ্রামের বালক বলিয়া নিমাইকে যতই অবজ্ঞা করিনা কেন, নিমাইয়ের মত পণ্ডিত জগতে আর নাই, আজ তাহারই জন্য আমাদের মান রক্ষা হইল।"

নিমাই সঙ্গোপাঙ্গ লইয়া এইবার একবার দেশ ভ্রমণে বাহির হইবার ইচ্ছা করিলেন। এই সময় তাঁহার পিতৃবন্ধু শ্রীবাস তাঁহাকে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন, বলিলেন—"নিমাই! তুমি কেবল চিরদিন লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে—ভগবানকে ভাবনা কর, ব্রাহ্মণের ছেলে শুচি হইয়া সাধন-ভজন কর।"

নিমাই গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সাধন-ভজন, যোগ-যাগ, পঞ্চমকার সমস্ত করিয়াছি, এইবার বৈষ্ণব হইয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া প্রেমধন বিতরণ করিব। কলিতে মানুষ বড় শুষ্ক নীরস হইয়া গিয়াছে, তাই যমের তাড়নায় এত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, প্রেমভক্তিতে সরস হইলে আর এত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে না।" শ্রীবাস নিমাইয়ের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন—সেই অপরূপ যুবককে দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

নিমাই স্ত্রীলোকদের বড় ভয় করিতেন, পথে স্ত্রীলোক দেখিলে—তিনি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেন, মাতৃ ভক্তিতে বিভোর হইয়া প্রণাম করিতেন। পুরুষ দেখিলে স্ত্রীলোক যেরূপ সম্ভ্রমে জড়সড় হয়, নিমাই সেইরূপ হইতেন।

যেদিন নিমাই সঙ্গোপাঙ্গ সহ পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। সে দিন তাঁহার অপূর্ব্ব বেশ—বাড়ীর দুয়ারে, গবাক্ষে স্ত্রীলোকগণ সেই মোহন রূপমাধুরী দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল, নিমাই জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া, পদ্মা পার হইয়া একেবারে শ্রীহট্টে পিতামহালয়ে উপস্থিত হইলেন। সে সময় পিতামহালয়ে এক জ্যেষ্ঠতাত তনয় প্রদ্যুম্ন মিশ্র ভিন্ন আর কেহ জীবিত ছিল না।

বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত নিমাই মিশ্র শ্রীহট্টে আসিয়াছেন—শুনিয়া দলে দলে লোক তাঁহার দর্শন মানসে আগমন করিল, এবং সেই নয়নাভিরাম শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে তাঁহার পদধূলি লইয়া ধন্য হইল। এই সময় তপন মিশ্র নামক একজন সাধু নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া তাঁহার চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন—"আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি—আপনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, ভূভার হরণের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, পতিতকে উদ্ধার করাই আপনার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য, প্রভু! আমাকে উদ্ধার করুন।" নিমাই পণ্ডিত অতি নম্রভাবে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিলেন—"জীবে ভগবত্ ভাবের আরোপ করা নিতান্ত অন্যায়; আমাকে এরূপ বলিবেন না—আমি তৃণ হইতেও অধম—আপনি আমায় ক্ষমা করুন।" তপন মিশ্র প্রভুকে ছাড়িলেন না দেখিয়া তিনি তাঁহাকে

শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করতঃ সস্ত্রীক কাশী বাসের অনুমতি দিলেন। তখন অনুমতি পাইয়া বারানসী ধামে গমন করিলেন।

নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণবগণের প্রতি বড়ই আক্রোশ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়া তাঁহার সে ভাব রহিল না। তদ্দেশবাসী তাঁহার সহিত হরিনাম করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িল। কিছুদিন তথায় বাস করিয়া নিমাই নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন।

পুত্র এতদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল কিন্তু জননীর তাহাতে আনন্দ হইল না; মায়ের মলিন মুখ দেখিয়া নিমাই বলিলেন—"মা, আমি এতদিন পরে বাড়ী আসিলাম কোথায় তুমি স্নেহ বাৎসল্যে আমায় অভিনন্দন করিবে, না কেবল মলিন মুখে, বিরস বদনে দিন কাটাইতেছ, ইহার কারণ কি?" পুত্রের কথা শুনিয়া শচী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বধূর নাম করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

প্রতিবাসিগণ বলিল—"নিমাই! বউমা, অকালে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন—আজ কয়েক দিন হইল, সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাই তোমার মা, তেমন গৃহলক্ষ্মীকে হারাইয়া শোকে-দুঃখে অধীরা হইয়া তোমার সহিত হাসি মুখে কথা কহিতে পারিতেছেন না।"

সতীসাধ্বী পত্নী বিয়োগের কথা শুনিয়া নিমাই কিছুক্ষণ মর্ম্মাহত হইয়া রহিলেন, তার পর জননীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"মা, এয়োরাণী ভাগ্যমানী, স্বামীকে রাখিয়া যে রমণী দেহ রক্ষা করে—তার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়—তবে তুমি তার জন্য কাঁদিয়া আকুল হও কেন?" নিমাই মনের দুঃখ মনে চাপিয়া শোকাতুরা জননীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

এখন নিমাই পণ্ডিতের আর কোন প্রকার অভাব নাই। দরিদ্র জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই পণ্ডিত এক্ষণে বিদ্যা ও বৈভবে নবদ্বীপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। বড় বড় লোক নিমাই পণ্ডিতকে দেখিলে— তটস্থ হইয়া দাড়ায়—তাঁহার অনুমতি প্রতীক্ষা করে। নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় হইলে নিমাইয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য অচিরে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য শচীর গৃহ ধনধান্য পরিপূর্ণ; তবে নিমাই পণ্ডিত নাকি বড় ব্যয়শীল—অতিথি অভ্যাগত প্রতিপালক—তাই এত আয়ে এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় হয় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কখন সঞ্চয়ের পক্ষপাতী নহেন, ঈশ্বরের রাজত্বে কার্পণ্য না করিয়া যথাসাধ্য আর্ত্তের সেবা করা মহাধর্ম্ম, পুত্রের প্ররোচনায় শচীদেবীও সে ধর্ম্ম অকাতরে প্রতিপালন করিয়া গ্রামে অন্নপূর্ণা আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

পুত্র এখন যশোগৌরবে গৌরবান্বিত—সংসারও এখন বেশ সচ্ছল— অভাবের লেশমাত্র নাই। অথচ এই অল্প বয়সে নিমাই গৃহশূন্য হইল, এমন সুখের সময়ে একটী বধূ না হইলে ত গৃহের শোভা হয় না, শচীদেবী মনে মনে পুত্রের আর একটী বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়া পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শচীদেবী প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিবার সময় একটী সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। বালিকাটী অনূঢ়া, এখনও বিবাহ হয় নাই—তবে বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে, বোধ হয় সৎপাত্রাভাবে এইরূপ হইতেছে। বালিকাটীও শচীর মত বাৎসল্য প্রতিমা, স্নেহময়ীকে দেখিয়া আনমনে চাহিয়া থাকে—মনে মনে কি ভাবে—তা ভগবানই জানেন।

একদিন শচীদেবী স্নানান্তে তীরে উঠিয়া বালিকাটীকে সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ মা, তুমি ত প্রত্যহ স্নান করিতে আইস, তুমি কি ব্রাহ্মণের কন্যা ?"

বালিকা স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ !" শচী বলিলেন—"তুমি কাহার কন্যা, তোমার পিতার নাম কি মা ?"

বালিকা বলিল—"সনাতন পণ্ডিত।" শচী বালিকার পিতার নাম শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন। যদিও তিনি তাঁহাদের স্বঘর—তথাপি সনাতন রাজার সভা পণ্ডিত, তিনি দরিদ্র নিমাইকে কন্যাদান করিবেন কি ? শচী কিন্তু লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সনাতন রাজপণ্ডিত, আর তাঁহার পুত্রই বা কম কি ? ধনে-মানে-কুলে-শীলে সেও ত কোনও অংশে কম নহে—তবে চেষ্টায় দোষ কি, পাত্রীটী বেশ পছন্দ সই কিনা ?

শচীদেবী তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে আপনার অভিপ্রায় করিলেন। তিনিও কন্যার পিতাকে শচীর অভিপ্রায় ব্যক্ত সনাতন কথা শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন। নিমাইয়ের মত জ পণ্ডিত যে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, তাঁহার জন ব্যক্ত করিয়াছেন—ইহাতে তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া স্বীকৃত হইলেন। এবং বিপুল বিত্ত-বিভব প্রদান করিয়া তদীয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়া কন্যা দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

পুনরায় মনের মত বধূ পাইয়া শচীর আনন্দের সীমা রহিল না। গৃহ-প্রাঙ্গণ এতদিন অন্ধকার হইয়াছিল—আজ আবার নববধূ সমাগমে

তাহা আলোকোজ্জ্বল হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইল। বিষ্ণুপ্রিয়া সনাতন পণ্ডিতের আদরিণী দুহিতা, রাজপণ্ডিতের একমাত্র কন্যা—অতুল সুখে লালিত পালিত হইলেও নিমাই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া আর তাঁহার সে ভাব রহিল না। তিনি শাশুড়ীর পূর্ব্বে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম সমাধা করিতেন—ছাত্রগণের ভোজনের জন্য জননীর মত আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। পূজনীয় স্বামীর অভাব-অভিযোগ অতীব যত্নের সহিত প্রাণপণে পূরণ করিতে অনুমাত্র ত্রুটী করিতেন না। স্বামীকে তিনি দেবতা অপেক্ষাও পূজনীয় জ্ঞানে হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি-প্রীতি প্রদান করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহার প্রণয় ভাজন হইয়া উঠিলেন। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহে পতি-পত্নীতে প্রায়ই কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়, এক্ষেত্রে তাহা না হইয়া বরং সংসারে শান্তির প্রস্রবণ উছলিয়া উঠিল দেখিয়া শচী নিশ্চিন্ত মনে ভগবান চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা র্পন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছে

গয়াধামে

"পুরুষাণাং গয়াশ্রাদ্ধং স্ত্রীণাং সর্ব্বজয়া ব্রতং"।

পণ্ডিত বুঝিলেন—আমি জীবনে পিতার কোন প্রিয় কা নাই। এক্ষণে যদি গয়াধামে গমন করিয়া বিষ্ণু প্র করিয়া তাহার অক্ষয় স্বর্গবাসের পথ পরিষ্কার করি। হইলেও পুত্রোচিত কার্য্য করা হয়। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে প্রয়োজনম্।" পুত্রের কার্য্যইত পিতামাতার মুক্তি বিধা সামান্য শ্রম স্বীকার করিলে যদি এইরূপ একটী সুমহৎ করা যায়, তবে তাহাতে বিরত হই কেন?

নিমাই পিতৃকার্য্য করিবার জন্য জননীর নিকট গয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রমণীগণ একটা প্রবাদ বাক্য বলিয়া থাকেন "ছেলে হয়ে কর্ব্বে গয়া, মেয়ে হয়ে কর্ব্বে সর্ব্বজয়া"। পুত্র হয়ে পিতৃপুরুষগণের মুক্তি বিধানার্থ গয়া শ্রাদ্ধ করিবে এবং কন্যা হইয়া "সর্ব্বজয়া" ব্রত সম্পাদন করিলে পুত্র বা কন্যা জন্মের সার্থকতা লাভ হইয়া থাকে। নিমাই কৃতী পুত্র, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত, সে পিতৃঋণ পরিশোধার্থ গয়ায় যাইবে—ইহাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, তবে নিমাই যেরূপ পাগল স্বভাব, ধর্ম্মে যেরূপ একাগ্র, হয়ত গয়ায় যাইয়া কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে মজিয়া যাইবে, বাড়ী আসিতে বিলম্ব করিবে বা আসিবে

তাহা আলোকোজ্জ্বল হইয়া ভ

পণ্ডিতের আদরিণী ভুচিত' কাঁদাইয়া সন্ন্যাসী হইবে, এই ভয়ে তিনি লালিত পালত হইলেইবার অনুমতি দিয়াও বলিলেন—"বাবা, যে ভাব র হল না। তাকী ছাড়িয়া দিতে পারিব না। যাওয়া একান্ত ছাত্রগণের ভোঙ্গে লইয়া যাও, তোমার মেসোমশাইকে সঙ্গে করিয়া রাখিতেন। "হয়।" নিমাই বলিলেন—"মা! সে ভাল, তিনি যাইতে প্রাণপণে পুঃ আমার আপত্য নাই, তবে আমি যে এতদূর দেশে দেবতা অপেতাহা তুমি মনেও করিও না, আমার সঙ্গে মুরারী গুপ্ত, করিয়া অচিরুয়েকজন ছাত্র ও যাইবে।" পুত্রকে ইহাদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দারমন উঠিল না। তিনি ভগ্নীপতিকে অনুরোধ করিয়া হয়, এক্ষেত্রে াঠাইলেন।

উঠিল দেখিবে, আশ্বিন মাসে নিমাই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। লেন তাঁহার মেসো মহাশয় চন্দ্রশেখর আর শিষ্যবর্গ। এখনকার তখন রেল পথ বিস্তৃত হয় নাই, কাজেই তীর্থ ভ্রমণ বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল, আর তীর্থ ভ্রমণ এত আয়াসসাধ্য ছিল বলিয়াই তীর্থ মাহাত্ম্য তখন এত প্রবল ছিল, প্রাণের আবেগে ভক্তিভবে তথায় যাইলে ভগবদ্দর্শন হইত, ভগবান ভক্তকে দয়া করিতেন, তাহার মনস্কামনা সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত ঘটিত না। এখন সে পরিশ্রম নাই, সে ঐকান্তিকতা, সে ভক্তি প্রাণে জাগে না, কাজেই দেব দর্শনে যাইয়া পুঁইমাচা দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

নিমাই গঙ্গার তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন, শিষ্যগণ প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। চন্দ্রশেখর নিমাইকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন, পাণ্ডিত্যের দারুণ অভিমানে নিমাই পূর্ব্বে একটু নাস্তিক হইয়া

পড়িয়াছিলেন কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া অবধি নিমাই নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছেন। প্রাণ তাঁহার ভক্তিভাবে গঠিত হইয়াছে। দেবতা-ব্রাহ্মণ দেখিলেই তিনি ভক্তি ভাবে নত হইয়া পড়েন। সে অহঙ্কার, সে মাৎসর্য্য, সে দাম্ভিকতা, বাল্যের সে চপলতা আর নাই, নিমাই এখন ঠিক পণ্ডিতের মত গাম্ভির্য্য লাভ করিয়াছেন। বৃক্ষ ফলবান হইলে যেমন স্বভাবতই নত হইয়া পড়ে, নিমাই ভক্তিধনে ধনবান হইয়া এখন সেইরূপ নম্রতাই লাভ করিয়াছেন।

মাতৃজঠর হইতে ধরাবক্ষে পতিত হইয়া নিমাই কখনও পীড়িত হন নাই, অটুট স্বাস্থ্য লইয়া অসীম তেজোগর্ব্বে শচীর পুত্র গ্রাম তোলপাড় করিতেন, একদিনের জন্য কেহ তাঁহাকে অসুস্থ হইতে দেখে নাই। আজ নিমাই তীর্থ গমন মানসে ক্রমশঃ পঁ হাঁটিয়া মান্দার গ্রামে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এ জ্বর সামান্য নং -বিষম জ্বর। সঙ্গীগণ সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। চন্দ্রশেখর পুত্রসম নিমাইকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। শিষ্যগণ প্রভুর সেবায় প্রাণপণ করিল, গ্রামবাসিগণ সমবেত হইয়া চিকিৎসার পবামর্শ প্রদান করিল। কিন্তু নিমাই নিজেব চিকিৎসার ব্যবস্থা নিজেই করিলেন, বিপ্র পদরজ আনিয়া খাওয়াইতে বলিলেন।

সেখানকার লোক বড়ই ব্রাহ্মণের প্রতি অভক্ত ছিল, তাই ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য জগতের সর্ব্বারাধ্য প্রধান পণ্ডিত নিমাইচাঁদ এই খেলা খেলিলেন। বিপ্র পাদোদক আনিয়া পান করাইয়া এবং পদরজ সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবামাত্র নিমাইয়ের প্রবল জ্বর একদিনেই সারিয়া গেল। বিপ্র পাদোদকের বিষয় বিবৃত করিয়া এইজন্য কবিও গাহিয়াছেন"—

হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য যার না পান বিধি,
সে রোগের মহৌষধি, কেবল ব্রাহ্মণেরই পদরজ।

ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী গ্রামবাসিগণ বিপ্র পাদোদকের ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, সেই হইতে তাঁহারা আবার ভূদেব ব্রাহ্মণের অনুরক্ত ভক্ত হইয়া পড়িল।

নিমাই আরোগ্যলাভ করিলে সকলেই আবার গয়াভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিল। কত গ্রাম, কত নগর অতিক্রম করিয়া সশিষ্য নিমাই ভক্তপ্রধান গয়াসুরের পবিত্র ক্ষেত্র গয়াধামে প্রবেশ করিলেন। গয়ার পবিত্র স্বর্গাদপি দৃশ্য দেখিয়া পণ্ডিত প্রবর নিমাইয়ের হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইল। যে নিমাই পাণ্ডিত্য প্রভাবে একপ্রকার নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ গয়ার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া সেই নিমাইয়ের চক্ষু হইতে অজস্র প্রেমধারা পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। আহা! এই সেই গয়াধাম, যেখানে ভক্তবীর গয়াসুর শ্রীভগবানের সহিত ভক্তিযুদ্ধে রত হইয়া অসংখ্যবার ভগবানকে পরাজিত করিয়াছিল, ভক্তবৎসল ভগবান কিছুতেই এই মহাভক্তকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। তারপর ভক্ত হৃদয়ের কি উদার, কি পবিত্র, কি মহান ভাব, পরপ্রেমে, হৃদয়ের কি গভীরতা, ভক্তচূড়ামণি বলিলেন—"ভক্তবৎসল! তোমার সাধ্য নাই যে তুমি আমাকে আঁটিতে পার, তোমাকে কষ্ট না দিলে জীবের ভবের কষ্ট নষ্ট হয় না, তাই আজ আমার এই ভক্তিযুদ্ধ। আমি নিজের জন্য কোন বর প্রার্থনা করি না, তবে জগদ্বাসীর জন্য বলিতেছি—"আমি এইস্থানে অবস্থান করি, তুমি আমার মস্তকে ঐ মুক্তি মুলাধার পাদপদ্ম রক্ষা করিয়া প্রতিশ্রুত

হও, যে কোন লোক মৃত ব্যক্তির মুক্তি কামনায় আমার মস্তক স্থিত তোমার ঐ পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিবে, সে সকল পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে, ভবের সকল ভাবনা এড়াইবে, তাহা হইলে তোমায় এই যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি দিই, তোমার পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া তোমার বশ্যতা স্বীকার করি, নতুবা আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।"

ভগবান দেবগণের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অসুর ভয় হইতে তাহাদিগকে নির্ভয় করাই তাহার ইচ্ছা, এইজন্য স্বীকৃত হইলেন, ভক্তবর গয়াসুরকে বশীভূত করিতে গিয়া প্রকারান্তরে তিনি নিজেই মহাভক্তের নিকট বশীভূত হইয়া পড়িলেন। মরি মরি ইহাই সেই পবিত্র আরাধ্য ধাম, ভগবান নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এখানে সদা সর্ব্বদা বিরাজমান। আহা! এমন স্থান কি আর আছে? নিমাই ভক্তিপ্রেমে গদ গদ হইয়া বাক্‌শক্তি শূন্য হইলেন, বিহ্বল নেত্রে চারিদিক দর্শন করিলেন। তারপর ফল্গুনদী, অক্ষয় বট সন্নিধানে গমন করিয়া তাহার ত্রেতাযুগের কথা মনে হইল, শ্রীরাম গৃহিণী সীতাদেবী একদিন জনকপ্রতিম শ্বশ্রুদেবের পিণ্ডদান করিতে গিয়া ইহাদিগকে অভিশাপ ও বর প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা সেই শাপগ্রস্তা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী, আর ইহাই সেই অমর-বর-প্রাপ্ত অক্ষয় বট, নিমাই যুক্তকরে ভক্তিভরে সকলকে প্রণাম করিলেন।

তারপর পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার মানসে ব্রহ্মকুণ্ড ও ফল্গুনদীতে স্নান করত পবিত্র হৃদয়ে ভক্ত-চূড়ামণি নিমাইচাঁদ গয়াসুরের মস্তকে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম দর্শনে গমন করিলেন। বহুযুগ ধরিয়া

তপস্যায় দেহপাত করিলেও যে আরাধ্য পদ দর্শন করা যায় না ; ভক্তবীর গয়াসুর উদার হৃদয়ে অনায়াসে সকলের জন্য সেই পদ দর্শন এত সহজ সাধ্য করিয়া দিয়াছেন—ধন্য বীরবর গয়াসুর! "ক্রোশমেকং গয়াসুরঃ" একক্রোশ পরিমিত অসুরের সেই পবিত্র দেহ বিস্তৃত—ভগবান তাঁহার মস্তকে শ্রীপদযুগল রক্ষা করিয়া জগদ্বাসীকে অভয় দিয়া ডাকিতেছেন—আয় আয় তোরা, পাপী তাপী জীব! আয়, আজ আমার মহাভক্ত গয়াসুর তোদের উদ্ধারের জন্য স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছে, তোরা ইহাতে পিণ্ডদান করিয়া সকলকে উদ্ধার কর, আজ আমি তোদের জন্য মুক্তি বিলাইতে এখানে মুক্তহস্ত হইয়াছি। নিমাই পণ্ডিত সেখানেও ভক্তিভরা ধরাধরা গলার আওয়াজে নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে মন্ত্র পাঠ করিয়া, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং স্ত্রীপুরুষ যাহার নাম মনে পড়িল—বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া তাঁহাদের সকলের উদ্ধার সাধন করিলেন।

এইখানেই বুঝিতে হইবে—হিন্দুর মত উদার প্রাণ জাতি জগতে আর কোথাও নাই। ইহারা যে কেবল নিজের জন্য, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কিছু করে না বা বলে না, তাহা তাহাদের এই শ্রাদ্ধ-মন্ত্রের মহিমা-মাহাত্ম্যে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের শ্রাদ্ধতত্ত্ব, তাহাদের তর্পণ প্রভৃতি কেবল নিজের হিতার্থে নয়—জগতের হিতার্থে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাহারা শ্রাদ্ধ ও তর্পণের মন্ত্রপাঠ করিবেন—তাহারাই একবাক্যে ইহার সত্যতা বুঝিয়া হিন্দু জাতির মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

নিমাই পিণ্ডদান কার্য্য সমাধা করিয়া সেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, বিরাট পুরুষ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের প্রতি পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—নয়ন হইতে অবিরাম ভক্তি-অশ্রুপাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল,

উত্তরীয় প্রভৃতি আর্দ্র হইয়া গেল। নিমাইয়ের মুখে কথা নাই—নড়ন চড়ন একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছে, ডাকিলে আর সাড়া পাওয়া যায় না। তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর ও শিষ্যগণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন—নিমাই পণ্ডিতের তৎকালীন সেই অপরূপ রূপ যে দেখিয়াছে—সেই বুঝিয়াছে, নিমাই শুধু পণ্ডিত নহেন—ভক্তচূড়ামণি, সকল মানুষ অপেক্ষা অমানুষিক কোনও শক্তি নিশ্চয়ই ইহাতে বর্ত্তমান আছে। নতুবা গয়াধামে ত কতশত লোক গমনাগমন করে কিন্তু এমন বিষম ভাববিভোর কে কবে হইয়া থাকে? নিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গ একটু একটু কাঁপিতেছে, অধরোষ্ঠ মৃদু মৃদু নড়িতেছে, সেই গৌরাঙ্গ সুন্দর রূপ দেখিয়া সকলে একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। দর্শকগণ মনে করিতেছে—তাহারা যেন পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন অপার্থিব রাজ্যের একটী মানুষ দেখিতেছে।

এই দর্শকগণের মধ্যে বৈষ্ণব প্রধান ঈশ্বরপুরীও ছিলেন। তিনি নবদ্বীপ হইতে বিদায় লইয়া নানাদেশ পর্য্যটন করত ঠিক এই সময়ে গয়াধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন—নিমাই কে, প্রেমরস রসিক ঈশ্বরপুরী বুঝিয়াছিলেন—নিমাই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। নিমাই ভাবাবেশে পড়িয়া যান—কাহারও ধরিতে সাহস হয় না—সে শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে কেহ অগ্রসর হয় না দেখিয়া ঈশ্বরপুরী সেই প্রেমে আলু থালু—আবেশে এলাইত দেহ আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন—"এতদিনে আমার গয়া আগমন সার্থক হইল—আমি প্রভুর কৃপালাভ করিলাম।"

পুরীর পবিত্র অঙ্গস্পর্শে নিমাই একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—'প্রভু! আমি ভাবের ঘোরে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাকে

উদ্ধার কর—সুপথ দেখাইয়া দাও।" বলিয়া পায়ে ধরিতে গেলেন! ঈশ্বরপুরী শশব্যস্তে নিমাইকে বুকে করিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত! তোমার সেই প্রথম দর্শন হইতেই আমি মোহিত হইয়াছি, তবে আর এত অনুনয় বিনয় কেন?"

এদিকে চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণ বাসা ঠিক করিয়াছিলেন নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। নিমাই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন—তাঁহার সেবা করিলেন। কিছু-দিন একত্র অবস্থান করিবার পর ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র প্রদানের উদ্যোগ করিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত! আজ তোমাকে দীক্ষিত করিব।" নিমাই বলিলেন—"আমি আজীবন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত—পিতার নিকট রাধামন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছি।" ঈশ্বরপুরী বলিলেন—"শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে—জীব এত শক্তি লাভ করিতেই পারে না; যোল বৎসরের বালক যে দিগ্বিজয় করিতে পারে—মহাশক্তির শক্তি ভিন্ন কি তাহা সম্ভব?" যাহা হউক, আজ আমি তোমাকে "রাধাকৃষ্ণ" যুগল মন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়া ধন্য হইব। মনে মনে বলিলেন—"তোমার আবার মন্ত্রগ্রহণ কি প্রভু! তবে আমার মত অভক্তকে চরিতার্থ করিবার জন্যই তোমার এই লীলাখেলা।" সেইদিন শুভক্ষণে তিনি নিমাইয়ের কর্ণে "রাধাকৃষ্ণ" মন্ত্র প্রদান করিলেন। কয়েকদিন উভয়ে পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সুধাপান করিয়া ঈশ্বরপুরী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নিমাই হিন্দু ধর্ম্মের যাবতীয় আচার-ব্যবহার তন্ন তন্ন করিয়া মানিয়া চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যদিও বালক স্বভাববশতঃ সময়ে সময়ে জননীকে বিরক্ত করিতে গিয়া ভ্রষ্টাচার করিতেন কিন্তু মন্ত্র গ্রহণের

পর তিনি একেবারে আচার-বিচার সম্পন্ন এবং মহাভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। প্রতিদিন গুরুদত্ত মন্ত্রজপ করিয়া সমাধীস্থ হইতে লাগিলেন, প্রাণ ভক্তিরসে ভোরপুর হইয়া উঠিল—বাহ্যিক চাঞ্চল্য-চাপল্য তিরোহিত হইল। গুরুমন্ত্র যে মানব জীবনে অবশ্য গ্রহণীয় এবং তাহার জপে যে মানুষ অসীম শক্তিমন্ত হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি নিত্য নিয়মিত জপ করিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ নিমাই রাধাকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত প্রাণ হইয়া কখন কান্না, কখন হাসি, কখন প্রলাপ বকিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। আহার নিদ্রা তাঁহার এক প্রকার রহিত হইয়া গেল। তাঁহার বদনে একপ্রকার করুণ দয়াদ্র ভাব—নয়নে অবিশ্রান্ত প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি সঙ্গীগণকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই! তোমরা বাড়ী যাও, আমার জননী ও পত্নীকে বুঝাইয়া বলিও—তোমাদের নিমাই "রাধাকৃষ্ণের" দর্শনে বৃন্দাবনে গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক এক দিন পলাইয়া যাইতে লাগিলেন।

মেসো চন্দ্রশেখর দেখিলেন—নিমাইয়ের ধাতু অনুসারে ঈশ্বরপুরী ঠিক মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তাই নিমাই ভগবৎ প্রেমে এতদূর অধীর হইয়া পড়িয়াছে.। একে মহাপণ্ডিত, তাহার উপর মন্ত্র গ্রহণের অসীম শক্তি লাভ করিয়া নিমাই মহাভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাহার মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে। যাহা হউক, আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই—কি জানি, অজানা—অচেনা দেশে কোথায় পলাইয়া যাইবে; এক্ষণে দেশে যাওয়াই উচিত, গয়ার কার্য্যও শেষ হইয়াছে?

চন্দ্রশেখর একজন বিচক্ষণ লোক। নিমাইকে নানা প্রকার উপদেশ এবং অশেষবিধ সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন গমনের গতিরোধ করিলেন। তিনি স্বদেশে আসিতে আর দ্বিধাবোধ করিলেন না। এক দিন পৌষ মাসের দারুণ শীত মাথায় করিয়া ভীষণ হিমানীতে কাঁপিতে কাঁপিতে নদীয়ার নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র নিমাই পণ্ডিত স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

নিমাই নবদ্বীপের প্রাণ স্বরূপ—এতদিন তাঁহার অদর্শনে শুধু তাঁহার জননী পত্নী বা আত্মীয় স্বজন নয়, গ্রামবাসী সকলেই ম্রিয়মান হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল। আজ নিমাই চন্দ্রের উদয়ে তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া অসহ্য অদর্শন যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। বৎসহারা গাভীর মত শচীদেবী প্রিয় পুত্রের আগমন সংসাদ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। নিমাই জননীর পদে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। পতি-বিরহ-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়া গবাক্ষ পার্শ্ব হইতে আরাধ্য মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। শ্বশুর সনাতন পণ্ডিত ও শ্বশ্রূকমলাদেবী জামাতার আগমন সংবাদ শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন। সমস্ত নদীয়া ধাম নিমাইয়ের আগমনে আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভাবাবেশ।

গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিমাই একরূপ হইয়া গেলেন। অনবরতই তাঁহার ভাবাবেশ হইতে লাগিল। পাণ্ডিত্যের অভিমান, জ্ঞানের গরিমা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া নিমাই পণ্ডিত তৃণাদপি সুনীচ হইয়া কেবল হা কৃষ্ণ, হা বনমালী, বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। শচীদেবী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন।

প্রগাঢ় পণ্ডিত পুত্রকে দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়া কোথায় সংসারী করিবেন, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়া কোথায় তাঁহার সংসার উজ্জ্বল হইবে, না একেবারে উদাস, নিমাই গয়া হইতে আসিয়া একেবারে পাগল হইয়া গেল! এমন সুরূপা, কোমলাঙ্গী বধূমাতাকে দেখিয়াও তাহার মনপ্রাণ আকৃষ্ট হয় না—তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কয় না, শচীদেবী পুত্রের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কেমন করিয়া সে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে—সোণার চাঁদ নিমাই আবার কেমন করিয়া বধূমাতার সহিত মিলিত হইয়া আদর্শ সংসার স্থাপন করিবে—শচীদেবী বয়স্থা রমণীগণের সহিত সেই বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিমাই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে, কোন কুগ্রহ বিরূপ হইয়া এরূপ করিতেছে, ভাবিয়া সকলেই তাঁহাকে দেবতার স্থানে

নানাবিধ মানসিক করিতে বলিল। সনাতন পণ্ডিতের পত্নী কমলাদেবী কন্যার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য জামাতার মঙ্গলোদ্দেশ্যে নানাপ্রকার শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের সে ভাব দিন দিন বাড়িল বই কমিল না।"

নিমাই সময়ে খান না, ছাত্রদের পাঠ দেন না; আহারাদির পর রাত্রে শয়ন করিতে গেলে, বিষ্ণুপ্রিয়া পদে ধরিয়া রোদন করিলে; নিমাই অতিরিক্ত রোদন করিতে থাকেন। শেষে শাশুড়ীকে ডাকিয়া আনিয়া তবে তাঁহার রোদন থামাইতে হয়। নিমাই শয়ন করিয়া চমকিয়া উঠেন—স্বপ্নে কি দেখিয়া "কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। এ যে বড় বিষম ভাব—জননী, পত্নী এরূপ ভাব দেখিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন?

ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতের এই ভাবের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। সুবৃহৎ নদীয়া জেলার চারিদিক হইতে লোক নিমাইকে দেখিতে আসিল। নিমাই শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা সকলেই জানিত, জগন্নাথ তাঁহাকে উপনয়নে গায়ত্রী দীক্ষার সময় "রাধামন্ত্র" প্রদান করিয়াছিলেন। পিতার প্রমুখাৎ তাঁহার কর্ণকুহরে এই অমোঘ শক্তি মন্ত্র প্রবেশ করিয়া জাগতিক সকল বিষয়ে তাহাকে উন্নত এবং পাণ্ডিত্যে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিল। এখন সকলে শুনিল—গয়াধাম হইতে তিনি পুনরায় ঈশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একেবারে ভাবাবেশে অধীর হইয়াছেন। সময়ে সময়ে কৃষ্ণ বিরহে হাহাকার করেন, কখন জ্ঞান হারা হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন—তাঁহার তন্ময়ত দেখিয়া নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলী বড়ই প্রীত হইলেন। তাঁহাকে

অভিনন্দিত করিবার জন্য, তাঁহার শ্রীমুখে ভগবদ্‌কথা শুনিবার জন্য তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তখন শাক্তগণ নবদ্বীপে বড়ই প্রবল ছিলেন—বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিতেন না, কারণ শাক্তদের মধ্যে সকলেই মহা পণ্ডিত—যুক্তিতর্কে পরাস্ত করা কাহার সাধ্য ছিল না। নিমাইকে সকলেই ঐ দলভুক্ত মনে করিত, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমে মাতুয়ারা—অনবরত ভাবাবেশ হইতেছে, শুনিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নিমাইয়ের ন্যায় একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত যখন তাঁহাদের দলভুক্ত, তখন আর ভাবনা কিসের? এইবার আমাদের বিদ্বেষী মহাশয়দিগকে একবার দেখিয়া লইব বলিয়া উগ্রস্বভাব বৈষ্ণবগণ মাথা নাড়া দিয়া উঠিলেন। শাক্তগণ নিমাইয়ের নির্জ্জন প্রিয়তা, আকুল ক্রন্দন, নিরহঙ্কার স্বভাব, চিত্ত দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ মনে করিয়া বলিলেন—নিমাই পণ্ডিত অতিরিক্ত অধ্যয়নে উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ কিন্তু তাঁহার যাবতীয় সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ পরিলক্ষিত করিয়া তাঁহাকে একজন পরম ভক্ত, ভগবানের একনিষ্ঠ সাধক বলিয়া স্তুতিগান করিবার জন্য এক সভার আহ্বান করিলেন। নিমাই প্রতিদিন শ্রীবাসের ভবনে পুষ্পচয়ন করিতে গমন করেন—আরও বহুভক্ত প্রাতঃকালে তথায় পুষ্পচয়ন করিতে আগমন করেন। শ্রীবাস নিমাইয়ের পিতৃবন্ধু একথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ অন্তরের মহা প্রেরণায় বুঝিয়া ছিলেন—ভগবান সত্বরই জীবের দুঃখ দূর করিতে, মহাপ্রেমে ধরা ভাসাইতে অবতার গ্রহণ করিবেন।

এক্ষণে নিমাইয়ের এইরূপ পরিবর্ত্তন—হঠাৎ এইরূপ অমানুষিক প্রেমোন্মাদ ভাব দেখিয়া শ্রীবাস ভাবিলেন—তবে কি বন্ধুপুত্র নিমাইই আমাদের উদ্ধার কর্ত্তারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন? শ্রীবাস সমস্ত রজনী এই চিন্তা করিয়া তাঁহার দর্শনাশায় বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রাতঃকালেই উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—সকলে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, নিমাইও আসিয়াছেন—ফুল তুলিতেছেন। সেই মধুর হাস্য বিজড়িত প্রেমময় মুর্ত্তি দেখিয়া শ্রীবাস আর তাহাকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না। তার পর অপর সকলের মুখে তাঁহার গুণগ্রাম, অহরহঃ তাঁহার ভাবাবেশের কথা শুনিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন—নিমাই সামান্য মানুষ নহে। এই অল্প বয়সে এরূপ প্রেমভক্তির উদয় দেব-স্বভাব মহাপুরুষ ভিন্ন কাহার সম্ভবে না।

একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সকলের ইচ্ছা হইল। বৈষ্ণবগণ নিমাইকে আমন্ত্রিত করিয়া তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নিমাই এখন বেশী লোক সঙ্গ ভাল না বাসিলেও ভক্তগণের আহ্বান অবহেলা করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি পুষ্পচয়ন করিয়া নিমাই পণ্ডিত সুরধুনী তীরে শুক্লাম্বরের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে সদাশিব, মুরারি, গদাধর, শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতি বহু ভক্ত নিমাই পণ্ডিতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শুভাগমন করিয়াছেন।

বেলা এক প্রহরের পর সেই পরম শান্ত সুধীর পুরুষ নিমাই পণ্ডিত ভগবদ্ভাবে গদ গদ হইয়া আসিতেছেন। তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, যেন কাহার ভাবে বিভোর, তাই আসিতে আসিতে এক একবার দাঁড়াইতেছেন, কি

ভাবিতেছেন, আবার আসিতেছেন, ঠিক যেন দিকভ্রান্ত হইয়াছেন; বহু সন্তর্পণে নিমাই শুক্লাম্বরের গৃহে আসিয়া দাওয়ায় বসিলেন। ভক্তগণ সেই আত্মভোলা, প্রেমোন্মাদ পুরুষটীকে ঘেরিয়া বসিল। সকলের মুখে হরেকৃষ্ট, রাধাকৃষ্ট বুলি শুনিয়া পণ্ডিতের যেটুকু জ্ঞান ছিল, যে বাহ্যজ্ঞানটুকু লইয়া তিনি এত দূর আসিয়াছিলেন—তাহাও তিরোহিত হইল। তিনি "হা কৃষ্ট" হা কৃষ্ট বলিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। মূর্চ্ছিত হইবার সময় দাওয়ার একটী খুঁটী অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু খুঁটী সে দীর্ঘাকার পুরুষের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পণ্ডিতের ভাবাবেশে পতন ও মূর্চ্ছা দেখিয়া সকলে শশব্যস্তে, হায় হায় করিল উঠিল—মুরারি তাঁহাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। মূর্চ্ছা এত গাঢ় যে জীবনের কোন চিহ্ন নাই—চোখের পলক পড়িতেছে না, মুখে ফেন নির্গত হইতেছে—শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ দেখিয়া সকলে ভয়ে জড়সড় হইল এবং চক্ষে মুখে শীতল জল প্রদান করিয়া ব্যজন করিতে লাগিল, অহরহঃ হরিধ্বনি কৃষ্টনাম শুনাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই সামান্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া "আমার কৃষ্ট কই" হরি কই" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সোণার গৌরাঙ্গ ধূলি ধূসরিত হইল। ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য হয় আবার "হাকৃষ্ট প্রেমময়" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। নিমাইয়ের সে মধুর আবেশ ভাব দেখিয়া ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

এইরূপে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ হইল তথাপি কাহারও চৈতন্য নাই,—আহারাদি হয় নাই, কাহার স্নানাহ্নিক পর্য্যন্ত বাকি রহিয়াছে, তথাপি নিমায়ের ভাবে, তাহার অমানুষিক বিহ্বলতায়, তাহারাও তাহার

সংকীর্ত্তনে মজিয়া গিয়াছেন, দৈনিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া কেবল কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। নিমাই পণ্ডিত মুরারিকে ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন আর বলিতেছেন—ভাই, তোমরা সকলে কীর্ত্তন কর, সংকীর্ত্তন প্রেমভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। অমৃতময় কৃষ্ণ-নাম ভজিতে হইলে কীর্ত্তনই পরম সহায়। তখন ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যখন ভক্তগণ সকলে উন্মাদ, তখন নিমায়ের পরম বন্ধু গদাধর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নিমায়ের পদতলে গড়াইয়া পড়িলেন। নিমাই গদাধরকে বক্ষে তুলিয়া বলিলেন—"তোর জীবন ধন্য হইয়াছে, বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া তুই প্রভুকে বাঁধিয়াছিস্ গদা! প্রেম দে, আমি প্রেমের ভিখারী।" আজ নিমায়ের এই অকিঞ্চন-মধুর-ভাব দেখিয়া তাঁহাকে প্রেমাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে কাহার দ্বিধা রহিল না।

প্রায় সন্ধ্যার সময় সংকীর্ত্তন সাঙ্গ করিয়া ভক্তগণ বাড়ী গমন করিলেন, নিমাইও টলিতে টলিতে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। সমস্ত দিন আহার হয় নাই—ধূলি ধূসরিত শ্রীঅঙ্গে অনর্গল ঘাম ঝরিয়া কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। একমাত্র পুত্র আহার করে নাই, জননী কেমন করিয়া অন্নগ্রাস মুখে তুলিবেন, আর বিষ্ণুপ্রিয়া বালিকা হইলেও হিন্দুর ধর্ম্মানুসারে স্বামীর অগ্রে কেমন করিয়া ভোজন করিবেন? তাঁহার ক্ষুধার যত কষ্ট না হউক, পতির অদর্শন বড়ই প্রাণান্তিক হইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন নিমাই বিভোর প্রাণে, আলু থালু বেশে গৃহপ্রাঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, পতি দর্শনে তাঁহার সকল কষ্ট নষ্ট হইয়া অন্তরে আনন্দের তুফান বহিতে লাগিল। তিনি

শশব্যস্তে পদপ্রক্ষালণের জন্য ঝারী পূর্ণ জল, গামছা আনিয়া দিলেন। শচী দৌড়িয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া পুত্রের কোমল অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া স্নান করাইয়া, আহার দিয়া বলিলেন, "হা নিমাই! এই করে কি শরীরটাকে মাটী করিবি বাবা। দেখ দেখি, সমস্ত দিন খাওয়া না হওয়ায় কত কষ্ট হলো।" নিমাই ভোজন করিতে করিতে বলিলেন—"মা! কৃষ্ণ নাম করিলে শরীর নষ্ট হয় না, আর না খাইয়াও হৃষ্ট পুষ্ট হয়।"

ভক্তগণ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, নিমাই গৃহপ্রবেশ করিলে মুরারি, গদাধর, শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতি স্ব স্ব আবাসে গমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—জগন্নাথের পুত্র নিমাই কি শক্তি পাইয়া এরূপ ভাবগ্রস্ত হইল, এ ত সামান্য অদৃষ্টের ফল নহে? যে সে মানুষের ভাগ্যে ইহা ঘটে না, তবে কি নিমাইরূপে ভগবান ধরা পবিত্র করিতে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্দীপনা করিতে, শাক্ত-বৈষ্ণবে সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে, যবনের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিতে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন? প্রভূ! এস, তোমার ভক্তগণ আর কতকাল দিশাহারা হইয়া বেড়াইবে?

শচীনন্দন নিমায়ের নাম একদিন পণ্ডিত বলিয়া যেমন জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল; সকলেই যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত আখ্যায় তাঁহাকে আখ্যায়িত করিত। আজ আবার সেইরূপ অদ্বিতীয় ভক্ত বলিয়া, অবতার কল্প মহাপুরুষ বলিয়া চারিদিকে তাহার নাম পরিকীর্ত্তিত করিতে লাগিল। নিমাই যেমনি পণ্ডিত, তেমনি ভক্ত, বুঝি এমন প্রেমোন্মাদ ভক্ত আর কোথাও জন্মে নাই! নিমাই কি এক আকর্ষণী শক্তি বলে, কি এক সম্মোহন মন্ত্রবলে সকলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। নানা স্থান

হইতে ভক্তগণ দিন দিন তাঁহার দর্শনে ধন্য হইতে আগমন করিতে লাগিল। ছাত্রদের ত কথাই নাই, নিমাইয়ের টোলে পড়িতে হয় না, তিনি একবার মাত্র কটাক্ষ করিলে মূর্খ ছাত্রও পণ্ডিত হয়, শুনিয়া নানা দেশ হইতে তাহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

একীকরণ চেষ্টা।

নিমাই প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন, স্নানাদি করিয়া টোলে কিয়ৎ-ক্ষণ ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করাইতেন কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না। যেন এত লোক সংসর্গ তাঁহার আর ভাল লাগিত না। গয়া হইতে আসিয়া নিমাই বড় নির্জ্জনপ্রিয় হইয়াছেন, একাকী এক স্থানে বসিয়া থাকিতেন, গৃহে অর্গল দিয়া যোগ সাধনা-করিতেন। তিনি কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদ পাইয়া পাগল হইয়াছেন, অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই আনন্দ সাধারণে বিলাইতে হইবে, আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে, শাক্ত-বৈষ্ণব এক করিয়া দেশের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে।—এখন ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

মানুষ যে ভাবেই সাধনা করুক, নদী যে দিক দিয়াই প্রবাহিত হউক, পরিশেষে সাগরে আত্মসমর্পণই তাঁহার উদ্দেশ্য। সাধন-ভজন সমস্তই এক, সকল সাধকই সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার জন্যই সাধনা করে, তবে তাহাদের মধ্যে এত ভেদ জ্ঞান কেন? শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় ভেদ কেন, আর এই সকল লইয়া তাহাদের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, পরস্পর মিলন সংঘটন হয় নাই বা কেন? এই বিরোধ ভাব ঘুচাইয়া সকলকে এক প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই এখন নিমাইয়ের ইচ্ছা হইয়াছে। কে বলে শাক্ত-বৈষ্ণব দুই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়!

শক্তিও যে, বিষ্ণুও সে, প্রকৃতি পুরুষ লইয়াইত জীব, প্রত্যেক জীবেইত পুরুষ-প্রকৃতি—স্ত্রীপুরুষ সংযোগ রহিয়াছে, তবে এ পার্থক্য কেন? শক্তিহীন পুরুষ শবপ্রায়! শক্তি না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না, আর বিষ্ণু না থাকিলে এ শক্তির উৎপত্তিও অসম্ভব! এইজন্য বিষ্ণুর উপাসনা ও শক্তির উপাসনা ভিন্ন নহে। একা পুরুষের বা একা শক্তির কোন ক্ষমতা নাই, কেবল মাত্র স্ত্রীর রজঃ জীবোৎপত্তির কারণ নহে, তাহাতে পুরুষ শুক্রের সংমিশ্রণ একান্ত আবশ্যক, কেবল রজঃ বা কেবল শুক্র জীবোৎপাদক নহে। এই হেতু প্রত্যেক জীবে স্ত্রীত্ব-পুংত্ব বর্ত্তমান থাকায় অভেদ ভাব, দেখিতে গেলে পিতা ও মাতা এক; তবে তাঁহাদের সাধনায় এত ব্যভিচার, এত দ্বেষাদ্বেষী কেন? আমাকে এই সমস্ত বিদ্বেষ ভাব ভঞ্জন করিতে হইবে, ধরায় প্রেমের বন্যা বহাইয়া মানুষকে প্রেম-ভক্তি-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। যাহাতে জীব পরস্পর ভালবাসায় মাথামাখি হইয়া এক হইয়া যায়, বিশ্বজনীন প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতঃ ভগবানের প্রেমের দরবারে উপস্থিত হইয়া আপন জীবনের আর্জ্জি পেশ করিতে পারে। জগতে এই মহা শিক্ষার প্রচার করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে হইলে শক্তি সাধনার আবশ্যক। নিমাই নির্জ্জনে কুলকুণ্ডলিণীর উদ্বোধন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিলেন। প্রাণায়াম দ্বারা ষট্চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রেমময়-প্রেমময়ীর প্রেম সম্মিলনে উদ্ভুত প্রেম-সুধা পান করিয়া অমানুষিক বলে বলীয়ান হইলেন।

সামান্য শিক্ষিত লোকে তন্ত্রশাস্ত্রটীকে বেদবহির্ভূত আধুনিক বলিয়া মনে করে কিন্তু অদ্বিতীয় পণ্ডিত বেদজ্ঞ নিমাইয়ের নিকট ত তন্ত্রশাস্ত্র

সেরূপভাবে অনাদৃত হইতে পারে না? তিনি বিশেষরূপ অবগত আছেন—বেদের মন্ত্র বিভাগই তন্ত্র, ইহার সাধনাতেই জীব শিব হয়, ভক্তিমুক্তি করতল গত করিতে পারে।

ভক্তি ছোট, প্রেম বড। ভক্তির রাজত্ব ছাড়িয়া যিনি প্রেমের রাজত্বে পৌঁছিয়াছেন, প্রেমের গভীরতায় যিনি ডুবিয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার নিকট কোন উপাসনা পদ্ধতিই উপেক্ষিত হইতে পারে না। তিনি জানেন,—পথ ভিন্ন কিন্তু গন্তব্যস্থান এক, সম্মিলন-ক্ষেত্র অভিন্ন। যাহারা প্রেমের দরবারে পৌঁছায় নাই, তাহাদের নিকট শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভেদ ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে। নিমাই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিবার জন্য, ভেদভাব রহিত করিয়া সকলকে সম-সূত্রে-গাঁথিবার জন্য এইবার উঠিয়া পাড়য়া লাগিলেন। হিন্দু মুসলমানে বহুদিন পৃথক হইয়া গিয়াছে, তাহাদের একসূত্রে গাঁথিবার উপায় নাই; কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে যদি সম্প্রদায় ভেদে এইরূপ মনোমালিন্য থাকিয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব, তাহাদের সনাতন ধর্ম্ম কেমন করিয়া বজায় থাকিবে? নিমাই অসীম শক্তি সম্পন্ন, শচীনন্দন বিশ্বম্ভর অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, কিছু দিনের পর যোগশক্তি সম্পন্ন হইয়া সমাজে মেশামিশি করিতে আরম্ভ করিলেন।

নিমাই ভাবিলেন—কলির প্রধান সাধনা তন্ত্র কেন হইল? পরম পণ্ডিত স্থির বুঝিলেন—তন্ত্রোক্ত সাধনাই এক সময় দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর যখন ক্ষত্রিয়-শক্তি এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইল, সেই সময় বুদ্ধদেব অহিংসা পরমোধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ভগবানের নবমাবতার বুদ্ধদেব

হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির প্রচার করিলে দেশ যবনগণের অধিকৃত হয়। সে সময় সাধকগণ, ঋষিগণ, যদি এদেশে তন্ত্রোক্ত বীর ভাবের প্রচলন না করিতেন, তাহা হইলে দেশবাসী সমস্তই মুসলমান হইয়া যাইত। সেই সময় শক্তি সাধক মহারাষ্ট্র বীর শিবজী, রাজা কংস, রাজা প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান না হইলে হিন্দুর অবস্থা, তথা দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইত; এইজন্য তন্ত্রের সাধনা সে সময় প্রচলিত করা খুব সমীচীন হইয়াছিল।

এক্ষণে সে অবস্থা আর নাই, মুসলমানগণ আর তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ নহে। দিল্লীর অবস্থাও অবসন্ন প্রায়, বঙ্গদেশে হোসেন সাহ শাসন কর্ত্তা রূপে অধিষ্ঠিত। নবদ্বীপের বেলপুখুরিয়ায় চাঁদ খাঁ, আর শান্তিপুরে মুলুক চাঁদ, ইহারা সময়ে সময়ে হিন্দু দিগের উপর অত্যাচার করে; সেই অত্যাচারের প্রশমন কল্পে এ দেশীয় হিন্দুগণ এখনও বীরাচারের বশীভূত কিন্তু উদ্দেশ্য ভুলিয়া বিপথে যাইতেছে, যথার্থ গুরুর অভাবে এমন প্রাণারাম উপাসনাটীকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। সকল বিষয়েই সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি লাভের উপায় নাই, বিশেষতঃ তন্ত্র, জ্যোতিষ, যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে বহু গুপ্ত বীজমন্ত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যাহা সাধন-সিদ্ধি গুরু ভিন্ন অন্যের বুঝাইবার ক্ষমতা নাই, কেবল অভিধান বা ব্যাকরণের সাহায্য লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে, অনেক সময় বিপরীত ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। সাধনতত্ত্বে তত্ত্ববান মহামনীষী নিমাই বুঝিলেন—সাধকের সাধনা অধিকার ভেদে গুরু কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ইহাতে সকাম-নিষ্কাম দুইই আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য, মেধস্ মুনির উপদেশে ভগবতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। রাজা

সুরথ শত্রুগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত আর বৈশ্য স্ত্রীপুত্রগণ কর্ত্তৃক নিজ সম্পত্তি হইতে অধিকার চ্যুত। দুই জনেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, রাজা সুরথ সকামভাবে উপাসনা করিয়া হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, আর সমাধি বৈশ্য জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পথের পথিক হইলেন। মেধস্ ঋষি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, অধিকার ভেদে সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া দুই জনের বিভিন্ন গতি লাভ হইল। অতএব জ্ঞানী, সাধন-সিদ্ধ, তান্ত্রিক গুরুর অভাব বলিয়া সদাশিবের তন্ত্র শাস্ত্রটী এমন ব্যাভিচারে পরিণত হইয়াছে, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সাধকের মনে আধুনিক বলিয়া সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে। শক্তি না জন্মিলে কার্য্যসিদ্ধি কোথায়, শক্তি না থাকিলে কোনও সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব? তবে অধিকারী অনধিকারী গুরুর দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়া দরকার, এখন তাহা হয় না বলিয়াই এত বিরোধ, এত মতদ্বৈধ, এত মারামারী, এত কাটাকাটি, আর শাক্ত-বৈষ্ণবে এত কলহ-বিবাদ। এই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সকলকে এক করিতে হইবে, এক প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া রাধাকৃষ্ণ, শিবশক্তি অভেদ ভাবে ভাবিতে শিখাইতে হইবে। ইহাই নিমাইয়ের প্রাণের ভাব। যে যথার্থ বৈষ্ণব সে শক্তি ছাড়িয়া বৈষ্ণব হইতে পারে না, যে যথার্থ শাক্ত সেও বিষ্ণু ভক্তি ছাড়িলে শাক্ত নামের অযোগ্য। হৃদে কালী, বহিঃ শিব, বদনে হরি এইত সকল সাধকের সাধনার মূলমন্ত্র। রাধা ও কৃষ্ণ যে এক, অতএব শক্তি ছাড়িয়া সাধনা কেমন করিয়া হইতে পারে? প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ যে রাধা মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন, শ্রীরাধারও ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নহেন, শক্তিমান ও তাঁহার শক্তিতে প্রভেদ কোথায়? বিষ্ণুর হ্লাদিনী শক্তি যে রাধা, শিবের জগৎ প্রসবিনী শক্তি যে আদ্যা শক্তি।

হায়! সাধনার বিষয় না বুঝিয়া, প্রেমময়ীর প্রেম-হ্রদে অবগাহন না করিয়া, সাধারণ মানব যাহারা সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, প্রথমে তাহাদের এইরূপ ভেদজ্ঞানই হইয়া থাকে। আমিও উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া শাক্ত হইয়াছিলাম, তারপর পিতৃ আজ্ঞায় রাধা নামে বিভোর হইয়া প্রভূত বিদ্যা-বৈভব, যশসৌরভ উপার্জ্জন করিয়াছি কিন্তু ইহাতে কি হইবে, কেবল আপনার লইয়া ত সব নহে? সবকে আপনার করিতে হইবে, আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জীবকে, আচণ্ডাল মনুষ্যকে সেবা করিয়া—প্রেমদান করিয়া আপনার করিতে হইবে! তাহা হইলে মুসলমান শক্তি আর দেশের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। দেশবাসী একতাবদ্ধ হইলে আর ভয় কিসের?

ভক্তিতে ভরা, প্রেমে পুরা হৃদয় লইয়া নিমাই এইবার দেশের কাজে মত্ত হইলেন, দীন-দুঃখী-আর্ত্তের সেবা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণকে প্রেম বিলাইয়া তিনি হরি সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সেবাব্রতে, তাঁহার সাধন ভজনে ও নাম সংকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবের দল তাঁহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইলেন। শাক্তভক্তগণও নিমাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া, কি এক অপার্থিব সৌজন্যে নিমাইকে তাঁহারা প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন কিন্তু বীমাচারী সাধকগণ তাঁহার এতাদৃশ ভাবকে মানবের চিত্তদৌর্ব্বল্য ভাবিয়া মিশিতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহার এই ভাবকে অধঃপতন বলিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা করিয়াও বেড়াইতে লাগিলেন।

যিনি স্বয়ং শক্তিধর, ঈশীশক্তি যাঁহার মনে প্রাণে গাঁথা, তিনি

মানুষের নিন্দা বা তিরস্কারে ভীত হইবেন কেন? বরং ঐ সকল অপরিণামদর্শী লোককে ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া আপনার দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিমাই এখন আর ছাত্র পড়াইতে পারেন না। অধ্যয়নের সময় শাস্ত্র বিষয়ক কোন মীমাংসা করিতে হইলে তর্ক করিতে হয়, তিনি এখন আর তাহা করিতে চাহেন না। নিমাই বিদ্যার গর্ব্ব পদদলিত করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন—"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" ভগবদ্বিষয়ে তর্ক করিতে নাই—তর্কে সেই অসীম অনন্ত শক্তিমান ভগবানের বিষয় কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ তিনি ছাত্রগণকে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করাইতে করাইতে যদি শ্রীকৃষ্ণের বিষয় কিছু পাইতেন—তাহা হইলে এমন বিভোর হইয়া যাইতেন—হৃদয়ে এমন প্রেমভক্তির সঞ্চার হইত যে তৎক্ষণাৎ তিনি সমাধীস্থ হইয়া লুটিয়া পড়িতেন, কখনও বা তন্ময় ভাবে কাঁদিয়া আকুল হইতেন—কাজেই ছাত্র-পড়ান আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। কখন কখন নিমাই শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া অবসন্ন দেহে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেন—ছাত্রগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিত—তখন নিমাই রাধাকৃষ্ণের প্রেম তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতেন, দুই চক্ষে প্রেমধারা বহিত। একদিন তাঁহাদের গ্রামস্থ রত্নগর্ভ আচার্য্য নিমাইকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন; নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন—নিমাই তাঁহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পরীক্ষার অতীত। এ নিমাই কে? তবে কি জীবের অদৃষ্ট ফিরিয়াছে, রাধা রূপে কি ভগবান ধরার বাধা-বিপত্তি হরণ করিতে নিমাইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

নিমাইয়ের অধ্যাপক গঙ্গাদাস কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। বধূমাতার ম্লানমুখ, তাঁহার প্রাণের দুঃখ বুঝিয়া শচীদেবী প্রত্যহই গঙ্গাদাসকে জানাইতেন—কত দুঃখ করিতেন, বলিতেন—"বড আশা করিয়া নিমাইয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিলাম কিন্তু সে যেরূপ ভাবে উন্মত্ত হইয়াছে—তাহাতে আমার সকল আশায় ছাই পডিল।" গঙ্গাদাস বৃদ্ধার মর্ম্মান্তিক দুঃখ বুঝিয়া একদিন নিমাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গুরুভক্তি পরায়ণ নিমাই গুরুর কথা অবহেলা না করিয়া সেইদিন ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে গুরুসদনে উপস্থিত হইলে—গঙ্গাদাস তাঁহার রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন। গঙ্গাদাস জানিতেন—পাণ্ডিত্যই জীবনের সাব কিন্তু আজ নিমাইয়ের এই প্রেমপুবিত মূর্ত্তি দেখিয়া গঙ্গাদাস মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—এ কি মনুষ্যমূর্ত্তি, না দেবমূর্ত্তি! এ কি আমাব ছাত্র নিমাই! না আমার প্রভুব প্রভু শ্রীভগবান! নাস্তিক গঙ্গাদাস মুগ্ধনেত্রে বলিলেন—"বাবা নিমাই! তোমার যশোসৌরভে দিগন্ত পরিপূবিত—পাণ্ডিত্যে তুমি নবদ্বীপের কেন, ভারতের অদ্বিতীয হইযাছ কিন্তু বাবা, তোমার মত লোকের কি জননী ও পত্নীকে দুঃখ দেওযা উচিত? তোমার মা প্রত্যহ আমার নিকট আসিয়া কত কান্নাকাটি কবেন, তুমি তাঁকে সান্ত্বনা কর, তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ কর—জননীর আশীর্ব্বাদ পুত্রের সকল মঙ্গলের আস্পদ।" নিমাই বুঝিলেন—তাঁহার জননী, তাঁহার আচাব ব্যবহারে বিবক্ত হইয়া গুরুর নিকট অনুযোগ কবিয়াছেন। তিনি নতমস্তকে বলিলেন—"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আজ হইতে আমি আব বাটীব বাহির হইব না।" নিমাই চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে শিষ্যগণ সহ ঘরে বসিয়া

সংকীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ছাত্র পড়ান নিমাইয়ের পক্ষে ক্রমশঃ অসম্ভব হইতেছে। তথাপি ছাত্রগণ তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেনা। তাঁহার সেবা শুশ্রূষা, তাঁহার দর্শন-স্পর্শন, তাঁহার শ্রীমুখের করুণ উপদেশবচন শুনিলে পুস্তকপাঠ অপেক্ষা লক্ষগুণ কাজ হইয়া থাকে, তাহারা এমন মহাপুরুষের আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথায় যাইবে? ছাত্রগণকে লইয়া নিমাই সংকীর্ত্তন করেন, ভাবে বিভোর হইয়া ভূতলে গড়াগড়ি দেন। ছাত্রগণ এবং উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী নিমাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া ভাবেন—ইনি নিশ্চয় কোন দেবতা, পাপীতাপী উদ্ধারের জন্য মানব জন্ম ধারণ করিয়াছেন। কাজেই এ ভাবের ভাবুক কি কেবল পুস্তক পাঠের ভাবনায় চিত্ত সংযত করিতে পারেন? জ্ঞান হইলেই নিমাই তাহাদের নিকট লজ্জিত হইয়া পড়েন, তাহাদিগকে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না বলিয়া কত দুঃখ করেন। কিন্তু কি করিবেন—এত চেষ্টা করিয়াও তিনি আত্মভাব সংবরণ করিতে পারেন না, কৃষ্ণকথা শুনিলেই তিনি জ্ঞানহারা হইয়া পড়েন। প্রেমময়ের প্রেমতরঙ্গে যে এমন ভাবে ডুবিয়াছে, অধ্যাপনা কার্য্য কি আর তাহার দ্বারা সম্ভব? তাই একদিন ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া পণ্ডিত বলিলেন—"ভ্রাতাগণ! আর আমার দ্বারা তোমাদের পঠনপাঠন হইবে না; আমি তোমাদিগকে বৃথা আর সময় নষ্ট করিতে বলি না; তোমরা আমাকে ক্ষমা করিয়া অন্যত্র গমন কর"—এই বলিয়া নিমাই কাঁদিতে লাগিলেন।

অধ্যাপকের মুখে এই নির্ঘাত বচন শুনিয়া ছাত্রগণ অধৈর্য্য হইয়া

পড়িল ; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"প্রভূ! আপনার নিকট বিদায় হইয়া অন্যত্র আমরা আর কি শিখিব? আপনি যাহা শিখাইয়াছেন, এ শিক্ষা অপরের দ্বারা হইবে না, শিক্ষার যাহা চরম উদ্দেশ্য—তাহা আমাদের লাভ হইয়াছে। তবে আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে; ইহা ভাবিতেও আমাদের প্রাণ অস্থির হইতেছে, বোধ হয়—আপনার পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ করিলে আমরা পাগল হইয়া যাইব, অথবা আমাদের জীবনভার বহন করা দুঃসাধ্য হইবে।"

তাঁহার প্রতি ছাত্রগণের রতিমতিও আনুরক্তি দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শেষে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—ভাই সকল! আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে যদি তোমাদের এতই অনিচ্ছা, তবে গিয়া কাজ নাই। আমি তোমাদের অধ্যাপকরূপে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদে যদি আমার তিলমাত্র রতিমতি থাকে, তাহা হইলে তোমরা যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তাহাতেই তোমাদের অবিদ্যা নাশ হইবে, আর কোন শিক্ষার আবশ্যক হইবে না। এক্ষণে মানব জীবনের মহাশিক্ষা কায়মনোবাক্যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরণ করিয়া, তাঁহার গুণগাণ করিয়া মানবজন্ম সার্থক কর। এস ভাই সকল! আজ এই দীন হীনকে কৃপা করিয়া তাহার মনোবাসনা পূর্ণ কর, কৃষ্ণ কীর্ত্তনে দেহ মন পবিত্র কর। ভাই! কলিতে নাম ভিন্ন অন্য উপায় নাই; "হরে নামৈব কেবলম্ কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা"। কলিযুগে অন্য যাগ-যজ্ঞ, বার-ব্রত, পূজা-অর্চ্চনা কিছুরই আবশ্যক নাই; অল্পায়ু কলির জীবের পক্ষে নামের তুল্য এমন অনায়াসসাধ্য ভবাব্ধি নিস্তারের উপায় আর কি আছে? নিমাই ভক্তগণ-

সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইলেন, নিমাইয়ের সেইদিনকার কীর্ত্তন শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। ভাব বিভোর নিমাই সকলের পদে ধরিয়া প্রেম ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দন, তাহার উপর আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া প্রভু সকলকে সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য বুঝাইতে লাগিলেন, তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া সকলকে কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। দর্শকবৃন্দ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের সেদিনকার ভাব দেখিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে অবতার কল্প মহাপুরুষ বিশ্বাস করতঃ তাঁহার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ সম্মিলন।

প্রবৃত্তি ও আসক্তিই সর্ব্বনাশের মূল। অতিরিক্ত পণ্ডিত হইলেও, শাস্ত্রপাঠে ভালমন্দ জ্ঞান থাকিলেও অনেক সময় লোভ পরতন্ত্র হইয়া মানুষ বিবেক বর্হিভূত কার্য্য করিয়া ফেলে, এইজন্য প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তন্ত্র এইজন্য নিম্নাধিকারীর পক্ষে কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহার যেমন প্রবৃত্তি তাহাকে সেইরূপ আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া, তামসিক—রাজসিক ভাবে গঠন করিয়া তবে সাত্ত্বিকভাব উপলব্ধি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। নতুবা একেবারে ত্যাগ সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নয়।

তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন—সত্ত্বগুণাবলম্বী না হইলে মুক্তি নাই, বৈষ্ণবশাস্ত্রও তাহাই বলেন কিন্তু তাহা কয় জনের পক্ষে সম্ভব? সকল বৈষ্ণবই কি সত্ত্বগুণাবলম্বী, তাঁহাদের মধ্যে কি আসক্তি বা প্রবৃত্তির ছাপমারা লোক নাই—নিশ্চয়ই আছে? তবে বৈষ্ণব গুরু হয়ত ঐ সকল লোককে বিষ্ণু উপাসনার অনুপযুক্ত বলিয়া ঠেলিয়া রাখিবেন; কিন্তু সার্ব্বজনীন তন্ত্রশাস্ত্র কাহাকেও ফেলিবেন না, তাঁহার শ্যামতরু ছায়ায় সকলকেই স্থান দিয়া ধীরে ধীরে তামসিক, রাজসিক প্রভৃতি মার্গ দিয়া সাত্ত্বিক ভাবে বিশ্বজননীর দরবারে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত করিয়া দিবেন। শাক্ত-বৈষ্ণবে এইটুকু মাত্র পার্থক্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শাক্ত না হইলে, ভজন-সাধনে শক্তিমান হইয়া প্রেম-ভক্তি সঞ্চয় না করিলে, ঈশ্বরের দরবারে উপস্থিত হওয়া কোন সম্প্রদায়ের সাধকের পক্ষেই সম্ভব নহে। এইজন্য প্রবৃত্তি বা আসক্তির হাত এড়ান একান্ত আবশ্যক। সে দিন কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিমাইয়ের ভক্তিভাব, তাঁহার ভাব-তরঙ্গের প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিয়া অনেকে তাঁহার আকর্ষণে নত হইয়া শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনেক বড় বড় শাক্ত পণ্ডিত আবার তাঁহাকে দুর্ব্বল চিত্ত বলিয়া নিন্দাও করিতে লাগিল, এরূপ ভক্তির প্রাবল্য দেখিয়াও তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইল না। তাঁহারা পণ্ডিতের অগ্রগণ্য হইলেও এতদিনের আসক্তি-অভ্যাস, মদ্য-মাংস ভক্ষণে বাহ্যিক আনন্দ-উল্লাসের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলেন না। এই জন্য মোহবশে নিমাইয়ের প্রদর্শিত পথে ভ্রমণ করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক হইলেন না, বলিলেন—"নিমাই ভাগ্যবশে বড় পণ্ডিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু সে দিনকার ছেলে, সাধন ভজন কবে শিখিল যে, তাহার আকস্মিক একটা ভাবে মজিয়া আমরা এতদিনের পুরুষ পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারে জলাঞ্জলি দিয়া ভেক্ লইব ?

নিমাইয়ের উদ্দেশ্য সকলকে এক করা, শাক্ত-বৈষ্ণবে আর পার্থক্য না থাকে। যখন উদ্দেশ্য এক এবং মহান, তখন ভেদাভেদ না থাকাই ভাল। পরম বৈষ্ণবী মায়ের ভক্ত, বিষ্ণুভক্তিতে রতিমতি হীন হইবে কেন? আর সকল শক্তির আধার বৈষ্ণবগণেরই বা তাহাদিগকে ভাই ভাই না বলিয়া শত্রুভাবে ভাবিবার উদ্দেশ্য কি? নিমাই সকলেরই প্রিয়, তিনি বৈষ্ণবের যেমনি অনুগত, শাক্তেরও তেমনি। তাঁহার চক্ষে সকলেই এক এবং অভেদ, কেমন

করিয়া এই অভেদ ভাব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিতে ন, নতুবা
পারিতে লাগিলেন। ার ?

এখন নিমাইয়ের অন্তরঙ্গ ভক্তের অভাব নাই। শ্রীবাস, ও র্য্য তেজে
মুরারি প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। নিমাই এখ । নিমাই
প্রবণ, বাহ্যিক পূজাদিতে তিনি আর রত থাকিতে পারে অভিবাদন
দেবতা রঘুনাথের ধ্যান করিয়া তুলসী দান সময়ে তাঁহার প্রা এ জন্ম ত
বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, আর কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিবার শা য়াছ, তবে
তন্ময় হইয়া কেবল চক্ষের জলে বুক ভাসান, কখন বা ত করিলেন,
পড়েন। কখন কখন তুলসী তলায় যাইয়া প্রেমোন্মত্ত ভাবে
থাকেন, প্রভুর ভাব দেখিয়া ভক্তগণ তাহাতে যো ন। তাঁহার
সে নৃত্য বড় বিষম হইয়া দাঁড়ায়, শচী অনেক কষ্টে তাঁহ ম পদ্মাবতী।
করিয়া পুত্রের স্নানাহারের ব্যবস্থা করেন। সমস্ত দেশ ই পণ্ডিতের
মাতিয়া উঠুক, নবদ্বীপ হরিনামের বন্যায় ভাসিয়া যাক্, বড় খিয়া পণ্ডিত
আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করুন—নিমাইয়ের এই লেন,—"কি
শাক্ত পণ্ডিতগণ কেহই তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন ার আশা পূর্ণ

এই সময় শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বপ্নাদেশ পাইয়া নিত
আসিলেন। ভগবানের দর্শন জন্য নিত্যানন্দ অবধূত বে হাবাই পণ্ডিত
বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইবার সময় প্রত্যাদেশ পাইলেন, থা করেন না
জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তুমি নববৃন্দাবন নদীয়ায় আসিয় টাকে প্রার্থনা
মিলিত হও।" বলরামের অবতার নিত্যানন্দ সানন্দমনে মনে ধারণাও
চিত্তে কনিষ্ঠের দর্শন মানসে নবদ্বীপে উপস্থিত হ না পদ্মাবতীকে
নবদ্বীপের বন বিটপী বৃন্দাবনের মত ফল ফুলে ভরা, ব্যাঘাত ঘটিবে,

.য়ব গুণগানে বিভোর। নিতাই আজ নিমাইয়েয় সহিত প্রাণে অপার আনন্দ; তাই বুঝি আজ নদীয়া স্বর্গের সুষমা ইয়াছে?

ইও জানিতে পারিয়াছেন—আজ তাঁহার প্রাণের ভ্রাতৃ-সম্মিলন াচার্য্যের ভবনে সংকীর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে। নয়নাচার্য্য র প্রভূর অর্চ্চনা করিয়া বাহির হইয়াছেন, এমন সময় প্রাণের সতে হাসিতে উপস্থিত। আচার্য্য অভিবাদন করিলেন; নিমাই ন করিলেন। আচার্য্যপত্নী নিমাইসুন্দরকে আহ্বান করিলেন, াই হাসিতে হাসিতে জননী সদনে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য ান—"নিমাই, বহুদিবস তোমাকে কিছু খাইতে দিই নাই, ্য পূজা করিয়া গিয়াছেন, তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর। নিমা সতে ঠাকুর ঘরে গমন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তারপর ইয়া বিষ্ণু খট্টায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ি বাহিরে আসিলে এক অপরূপ অবধূত আসিয়া বলিলেন—াচার্য্যের বাটী?" আচার্য্য বলিলেন,—"এই দীনের কুটীর, শুভাগমন?" অবধূত বলিলেন,—"শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে।" ব-চূড়ামণি দেখিয়া তাঁহাকে সাদরে বসাইলেন। এ দিকে ান্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, আর বাহির .য় না দেখিয়া আচা হইয়া দেখিলেন—নিমাই বিষ্ণু খট্টায় আর শ্রীমূর্ত্তি নোইয়ের সেই ভগবান ভাব দেখিয়া আচার্য্য পত্নী ' তে গেলেন। অবধূত নিত্যানন্দের সহিত তিনি —তাহাতে তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

দিন এ ভাব বুঝিয়াছিলেন,—প্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছে
বিষ্ণুমূর্ত্তি নামাইয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিবে,—এ সাহস ক

প্রভু আড় নয়নে দেখিলেন—আর একজন নবোদিত
তেজীয়ান ব্যক্তি আচার্য্যের গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকিত করিতেছে
ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া
করিলেন। নিতাই বলিলেন,—"এ জন্ম ত চতুরালীর নয়?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীমতীর প্রেমঋণ শোধের জন্য গ্রহণ করি
এত চাতুরালী কেন?" নিমাই অপ্রকাশ রাখিতে ইঙ্গি
নিতাই সংযতবাক্ হইলেন, প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী একচাকা গ্রাম নিত্যানন্দের জন্মস্থ
পিতার নাম হারাই ওঝা, পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, মাতার না
নিত্যানন্দ যখন খুব বালক, সেই সময় হঠাৎ একদিন হার
নিকট এক সন্ন্যাসী আগমন করিলেন। সন্ন্যাসীর রূপ দে
স্তম্ভিত হইলেন, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ মনে ভাবিয়া ন
নিমিত্ত প্রভুর আগমন!" সন্ন্যাসী বলিলেন—"আগমন
করিতে পারিবেন কি?"

"সন্ন্যাসীকে অদেয় কি আছে; প্রকাশ করিয়া বলুন!"
ত্যবাদী, সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলে তিনি যাহা বলেন, তাহার অন্য
ী বলিলেন,—"চে া করিবার জন্য তোমার পুত্র
ছি।" সন্ন্যাসী এরূপ প্রার্থনা করিবেন—হারাই ই
ত পারেন নাই কিন্তু কি করিবেন—সন্ন্যাসীর প্রার্থ
সন। পতির সত্যভঙ্গ হইবে, তাঁহার ধর্ম্মে

সহধর্ম্মিণী হইয়া কখনই তাহা হইতে দিবেন না। পদ্মাবতী অকাতরে পুত্রের মায়া ত্যাগ করিলেন। পিতা-মাতার একমাত্র পুত্রকে অকাতরে ত্যাগ করা কল্পনার অতীত বিষয় হইলেও, ওঝা-দম্পতী সন্ন্যাসীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। নিত্যানন্দও হাসিতে হাসিতে যেন কতদিনের পরিচিত ব্যক্তির সহিত চলিয়া গেলেন। অনেকে বলেন—"এ সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র—বিশ্বরূপ।

নিত্যানন্দ বহুদিন সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী তখন তাঁহার সহিত ছিলেন না। এই সময় ঈশ্বরপুরীও বৃন্দাবনে ছিলেন। কৃষ্ণ বিরহে নিত্যানন্দের ক্রন্দন দেখিয়া, তিনি প্রভুর অবতার গ্রহণের ইঙ্গিত জানাইয়া নবদ্বীপে যাইতে বলিলেন এবং রজনী শেষে তিনিও স্বপ্নাদেশ পাইলেন। নবদ্বীপে আসিয়া নিমাই-পণ্ডিতের বাড়ীর অন্বেষণে তিনি ভক্তপ্রবর নন্দনাচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভাগ্যক্রমে বেশী অন্বেষণ করিতে হইল না, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সেইখানেই পূর্ণ হইল। নিমাইয়ের শ্রীমুখে ভক্তগণ শুনিয়াছিলেন যে—আর একজন মহাপুরুষ শীঘ্রই নদীয়ায় আসিবেন, তিনি আমাদের সঙ্গে যোগদান করিলে আমরা প্রেমতরঙ্গে নদীয়া ভাসাইতে পারিব। তিনি প্রভূত শক্তিধর—তাঁহার শক্তি অত্যদ্ভুত।

আজ সেই নিমাই-নিতাই একত্র মিশিলেন, নদী-সাগরে আত্মাহারা হইল, এবার দুকূল প্লাবনের পালা পড়িল। ভক্তগণ দেখিলেন— "এইবার শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।" ভক্তপ্রবর নারদরূপী অদ্বৈতাচার্য্যের ভক্তিভাবে শান্তিপুর প্রায় ডুবুয় ডুবু হইয়াছে, এইবার নিমাই-নিতাই দুইজনে মিলিয়া, প্রেমের বন্যায় নদীয়া ভাসাইয়া দিবেন।

কাজেও তাহাই হইল, সেইদিন হইতে নিমাই-নিতাই বৈষ্ণবগণকে লইয়া দিবারাত্র এমন সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাদের তাণ্ডব-নৃত্যে রজনীতে নিদ্রা যাওয়া দায় হইল। অধিবাসিগণ রাজদ্বারে বিচার প্রার্থী হইলেন। শাক্তগণ এই অকারণ চীৎকারের প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দেশের রাজা মুসলমান, সুতরাং কাজী শাক্তগণের পক্ষ হইলেন এবং শাক্তগণ বৈষ্ণবগণকে দমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শান্তশিষ্ট নিমাইয়ের দল প্রশান্তভাবে আত্মরক্ষায় যত্নবান হইলেন। দেশে একটা মহা ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নিমাইয়ের মহত্ত্ব।

নবদ্বীপে তখন শক্তি-সাধকের সংখ্যাই খুব বেশী। রঘুনন্দন, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ, কালীকান্ত, গঙ্গাদাস, শ্যামাদাস, প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত শক্তি-সাধক বর্ত্তমান; তাঁহারা যাবতীয় কার্য্য তান্ত্রিক মতেই সমাধা করিয়া থাকেন। যে দিকে পণ্ডিতের দল বেশী এবং তাঁহারা যাহা করেন অধিকাংশ লোকই যে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে—ইহার আর বিচিত্র কি? এইজন্য মুষ্টিমেয়, সামান্য-বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় এতদিন মাথা তুলিতে পারেন নাই। কিন্তু যে দিন হইতে গৌরাঙ্গদেব অসীম শক্তি প্রভাবে, অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে বৈষ্ণবের পক্ষে যোগদান করিলেন—সেই দিন হইতে বৈষ্ণবের দল বক্ষঃ বিস্ফারিত করিয়া সকলের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল। তারপর যে দিন দ্বিতীয় শক্তিধর নিত্যানন্দ আসিয়া নিমাইয়ের সহিত যোগদান করিলেন—সেই দিন হইতে বৈষ্ণবদের প্রতাপে নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল।

নিমাই শাক্ত-পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে কত মিনতি করিলেন; নিজের দলভুক্ত হইতে কত সাধাসাধি করিলেন। কিন্তু তাঁহারা একে পঞ্চমকারে প্রভূত বীর্য্যবান, তাহার উপর রাজশক্তি তাঁহাদের পক্ষ; কাজেই তাঁহারা সমভাবে অচল অটল রহিলেন এবং বৈষ্ণবগণকে কিছুতেই বাড়িতে দিলেন না। যাঁহারা যথার্থ শক্তি-সাধক,

সাধন-শক্তিতে যাঁহারা প্রকৃত শক্তিমন্ত—তাঁহারা না হউন, সাধারণ ব্যাভচারী শাক্তের দল সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া, প্রাণপণে বৈষ্ণবদের শত্রুতাচরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বৈষ্ণবদের গৃহদ্বারে জবাফুল, মদের কলসী, মাংস, অস্থি প্রভৃতি শক্তিপূজার উপকরণ সকল বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে লাগিল এবং বৈষ্ণবগণের এই প্রেম-সাধনাকে গুপ্ত-ব্যাভিচার, নেড়া-নেড়ির কাণ্ড ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিতেও ছাড়িল না।

নিমাই, নিত্যানন্দ প্রভৃতি যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব. তাঁহারা এ সকল অত্যাচারে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না বা অপবিত্র বলিয়া শঙ্কিত হইলেন না, বরং পূজোপহার বলিয়া শির নোয়াইলেন। কিন্তু যাহারা সামান্য অধিকারী, তাহারা হাড়ে চটিয়া গিয়া শাক্তগণের সহিত একটা বিষম সংঘর্ষ বাঁধাইবার চেষ্টা করিল। নিমাই-নিত্যানন্দ সকলকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"দৈহিক শক্তি প্রয়োগে কোন কাজ হইবে না; আন্তরিক শক্তির আকর্ষণ চাই। শাক্তগণ যতই ঘৃণা করুক, তোমারা তাহাদের ঘৃণা বা নিন্দা করিবে না। সাধন-ক্ষেত্রে নিন্দার কিছু নাই, সাধনা সবই এক, প্রক্রিয়া বিভিন্ন মাত্র। সময়ের অপেক্ষা কর, এমন সময় আসিবে—যখন সকল শাক্তপক্ষই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, আপনারাই শান্তভাব ধারণ করিবে।"

নিত্যানন্দ প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। নিমাই বলিয়া দিলেন—"আসক্তিই সর্ব্বনাশের গোড়া, আসক্তি ও মোহবশেই শাক্ত-বৈষ্ণবে ভেদজ্ঞান।" যতদিন জীবের আসক্তি থাকে এবং মোহমদিরা না ঘুচে, ততদিন মানুষ স্থপথ-কুপথ চিনিতে পারে না। হাজার বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন,

পণ্ডিত হইলেও, তাহারা নাবকোঁড়া বলদেব মত, কিম্বা মদিরামত্ত মাতঙ্গের মত ছুটাছুটী করিতে থাকে। কিন্তু যখন নেশা ছুটীয়া যায়, মন অবসাদ গ্রস্ত হইয়া পড়ে—তখনই তাহাদের চৈতন্য হয়। শাক্তগণকে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া নিবৃত্তি মার্গে আনয়ন করাই তন্ত্রের উপদেশ, কিন্তু ভাল গুরু না পাইয়া তাহারা উন্মার্গগামী হইয়াছে। ভাই। তুমি প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া কাহাকেও প্রবৃত্তির পথে বাধা দিও না, তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইবে এবং স্বকার্য্য উদ্ধার হইবে না। হরিনাম এমন জিনিষ যে, হেলায় অশ্রদ্ধায় করিলেও তাহাতে ফল হইবে। তুমি সকলকে নাম করিতে বল, আসক্তি থাকিলেও বলিবে—"যুবতী রমণীর কোল, রুই মৎস্যের ঝোল, বোল হরি বোল।" নামে রুচি এবং ভাবে দয়া আনিতে পারিলেই, কার্য্য উদ্ধারের আর ভাবনা থাকিবে না। করুক না সে অকার্য্য, তথাপি নামের গুণে নিশ্চয় সমস্ত ত্যাগ করিবে। ভাই! এ নামে পাপী, তাপী সবাই পরিত্রাণ পাইবে—অতিবড় পাষণ্ডও এ নামে গলিয়া যাইবে। তুমি চিন্তা করিও না; যে যেমন ভাবে নাম করিতে চায়—তুমি তাহাকে সেই ভাবেই নাম করিতে উপদেশ দিবে। ব্রাহ্মণকুমার মহাপাপী বিল্বমঙ্গল একদিন দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া এই নামের বলেই জীবনের উজ্জ্বল পথ দেখিতে পাইয়াছিল। হরিনামই জীবের সম্বল, ইহা অন্ধের যষ্টি—পাপীর ভরসা। তুমি বিপথে যাইলেও এই হরিনাম-যষ্টি তোমাকে মোড় ফিরাইয়া সুপথে লইয়া আসিবে। এই মহাশক্তি সম্পন্ন হরিনাম-যষ্টি জীবকে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে লইয়া যাইবেই যাইবে।"

নিত্যানন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ তাহাই করিতে লাগিলেন।

ভগবদিচ্ছায় তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইতে লাগিল। নিত্যানন্দের সেই মনোহর বেশ, শ্যামবর্ণ পদ্মচক্ষু, সেই সুমধুর কথা, সেই নম্রভাব দেখিয়া কেহ আর স্থির থাকিতে পারিল না; সকলেই হরিনামে মত্ত হইয়া পড়িল।

তখন নবদ্বীপে ঘরে ঘরে কালীপূজা হইত। এক বৎসর কার্ত্তিকমাসে অমানিশার দিন কালীকানন্দের বাটীতে মাতৃপূজার মহা আয়োজন হইয়াছে; বহু শাক্তভক্ত আজ সাধনপীঠে মাতৃ-চরণপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। বামাচারীর নিয়মাধীনে পূজার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে; চারিদিকে রণবাদ্যের মত "নাচ দিগম্বরী নাচগো" বলে ঘোর ঢক্কা নিনাদ হইতেছে। রঘুনন্দন, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ অধিষ্ঠিত বীরাচারী সাধকগণ সমবেত হইয়া, গগনভেদী মাতৃনামের সংঘর্ষরবে দিক্‌মণ্ডল কম্পিত করিতেছেন।

নিমাই তাঁহাদের বয়োঃকনিষ্ঠ এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, এক গুরুর শিষ্য বলিয়া এই মহানন্দের দিনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। নিমাই পদের মর্য্যাদা, জ্ঞানের অহঙ্কার প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়াছেন। আচণ্ডালে প্রেমদান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, শত্রু মিত্র তাঁহার পক্ষে এখন সমান, অথবা তাঁহার শত্রু-মিত্র কেহ নাই। পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ ভগবতীর পূজা-আবাহনে উপস্থিত না হইলে ত্রুটি বা ধৃষ্টতা দেখান হয়—এইজন্য সশিষ্য নিমাই অমাবস্যার গভীর যামে যখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন বাজে লোক কেহ ছিল না। মায়ের প্রিয় সাধকবর্গই তখন সশিষ্য নিমাইয়ের সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে সুন্দর আসনে সমাসীন

করিলেন। প্রাঙ্গনে কয়েকটী ছাগশিশু রজ্জুবদ্ধ হইয়া লতাপাতা ভক্ষণ করিতেছে; সম্মুখে নানাবিধ পূজোপহার, তাহার মধ্যে বারুণীপূর্ণ কয়েকটী মৃতভাণ্ডও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূজক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মায়ের সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট; আজ সাধকগণের বদনে মাতৃভক্তির প্রবল উচ্ছাস, দেহে অমিত শক্তির প্রভাব আর অন্তর হইতে জলদগম্ভীর স্বরে মাতৃনামের ভক্তিভরা জয়ধ্বনি শুনিলে, বাস্তবিক হৃদয় স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া যায়। ভাবোন্মাদ শাক্ত-ভক্তের ভক্তিপুত, পবিত্র অভিষেক-সলিলে স্নাত, স্বর্গীয় প্রভাজাল-মণ্ডিত মাতৃমূর্ত্তির প্রতি একাগ্রচিত্তে চাহিয়া চাহিয়া, শচীনন্দন নিমাই অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া ফেলিলেন। তারপর একেবারে সংজ্ঞাশূন্য, একেবারে সমাধীস্থ হইয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, চক্ষে আর পলক পড়ে না, হৃদ্‌যন্ত্র নড়নচড়ন রহিত হইয়া গিয়াছে। প্রেমোন্মাদ নিমাইকে সকলেই মহাভক্ত বলিয়া ভক্তি করিতেন এবং সাধন-বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও, নিমাই যে অতুলনীয় সাধক ও ভক্তচুড়ামণি তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না; আজ মাতৃ সন্নিধানে তাঁহাকে এই ভাবে প্রেমে বিভোর হইতে দেখিয়া, শাক্তগণ স্তম্ভিত হৃদয়ে তাঁহার নিকট করযোড় করিয়া উপবেশন করিলেন।

আজ নিমায়ের সে ভুবনমোহন বেশ দেখিলে বাস্তবিক তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া মনে হয় না, কারণ সামান্য মানবের এরূপ সৌন্দর্য্য হইতেই পারে না। নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, কৃষ্ণানন্দ, রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—"আমরা যেমন দ্বিধা বোধ করি, নিমাইয়ের তাহা নাই! মরি মরি, শচীনন্দন-নিমাই

যথার্থ ভক্ত।" এইরূপ ভাবে প্রায় দণ্ডাধিক কাল অতীত হইলে, নিমাই চৈতন্য লাভ করিলেন। তখন শাক্ত-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া প্রভূত স্তুত্যাদি করিলেন এবং তাঁহার ভাবাবেশের বিষয় কিছু শুনিবার জন্য মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

মায়ের পূজাপীঠ হইতে ভক্তগণের আসন কিছু দূরে হইলেও, সেখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি বেশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। নিমাই অধ্যাপকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"পূজনীয় পণ্ডিত মণ্ডলী! আজ আমি আপনাদের পূজাপীঠে আহূত হইয়া, বিশ্বপালিনী মাতৃশক্তির পদতলে বসিয়া ধন্য হইলাম। আপনাদের মায়ের রূপ কিরূপ একবার ধ্যান করুন:—

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্,
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল কর্ত্তৃকাকরাম্।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ,
চতুর্ব্বাহুযুক্তাং দেবীং বরাভয় করাং স্মরেৎ॥"

সকলেই নিমাইয়ের ভক্তিভাতি-বিভূষিত বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। সেই বদনে কি এক অমিয় মধুর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল, আর শাক্ত-ভক্তগণ সমস্ত ভুলিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন। তাঁহাদের আর অন্য দিকে নয়ন ফিরাইবার অবসর নাই! এমন সময় নিমাই বলিলেন—"ভক্তবৃন্দ! একবার দেখ দেখি, আমাদের মা আজ কেমন নূতনরূপে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে নয়ন মনোহর ভাবে দণ্ডায়মান!"

তখন সকলে চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বৈষ্ণবগণ শ্যামার আবার চিত্তবিমোহন কৃষ্ণরূপ দেখিয়া, গলায় বস্ত্র দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ঃ—

"ও ধন্নেন্দ্রাবর কান্তিমিন্দুবদনং বর্হবিতংসপ্রিয়ং,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দিবর লোচনম্॥"

"দেখ, দেখ ভক্তগণ! কি মনমোহন, কি বিশ্ববিমোহন অপরূপ রূপ! আজ অসি ধরা, দিগম্বরা, নৃমুণ্ডমালা পরা মা—কেমন বাঁশী করে, পীতাম্বর প'রে, গলায় বনফুলের মালা ধ'রে—মৃদুমধুর হাস্য ক'রে, আজ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। কে বলে পরম বৈষ্ণবী মা আমার মাংস লোলুপা—মদিরা পানাসক্তা? ঐ দেখ, সুখ প্রসন্নবদনে শ্যামা মা আমার—শ্যামরূপে দণ্ডায়মান।"

তখন শাক্তগণ মুগ্ধ, চকিত এবং ভীত প্রাণে প্রেমবিহ্বল হইয়া বলিলেন—"নিমাই, ভক্তচূড়ামণি! আমাদের মোহ ঘুচিয়াছে, তুচ্ছ জ্ঞানের অহঙ্কার টুটিয়াছে। আমরা এতদিন শ্যামা-শ্যামে ভেদ ভাবে ভাবিয়া সাধনার প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়াছিলাম, আজ তোমার কৃপায় সে অজ্ঞতা হইতে মুক্ত হইলাম—তুমি আমাদের দয়া কর।" এই বলিয়া সকলে ভক্তিভবে সমস্বরে অভেদ ভাবে গাহিলেন ঃ—

"শ্যামা হলি মা রাসবিহারী, নটবরবেশে বৃন্দাবনে।"

তারপর নিমাই বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৈষ্ণবগণ! দেখিলে, মা কি তোমার বাবা নয়—শ্যামা কি তোমার শ্যাম নয়?"

বৈষ্ণবগণ আকুলপ্রাণে করযোড়ে গাহিলেন :—

"গোপনে গোকুলে আসি শ্যাম হ'য়েছ।
কবে অসি মুক্তকেশী বাঁশী ধ'রেছ।"

শাক্ত-বৈষ্ণবে এইবার কোলাকুলি হইল; নিমাইয়ের কৃপায় ভেদভাব বর্জ্জিত হইয়া সকলেই ভক্তিভাবে বিভোর হইলেন। নিমাই বলিলেন— "সাধনা সমস্তই এক, বাবা ও মা অভেদ মূর্ত্তি। শক্তি ভিন্ন সাধনা হয় না। শক্তি চাই—তন্ত্রের কতক সাধনা বিবেক বুদ্ধি হীন সামান্য অধিকারীর পক্ষে; কিন্তু যতই উদ্ধে উঠিবে ততই এব। পশ্বাচার, বীরাচার প্রভৃতি হইতে সন্ন্যাধিকারে পৌছিলে, তখন আর ভেদ জ্ঞান থাকে না। তখন সব ব্রহ্মময়—মা, বাবা সব এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তখন জীব মাত্রই শিব, শিব বৈষ্ণব ভাবে অনন্ত শক্তির আধার। প্রথমে তান্ত্রিক সাধনায় আসক্তির বশে প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ করিতে হয় বটে, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধিশালী সাধকের লক্ষ্য থাকা চাই, মার্জ্জিত-বুদ্ধি পণ্ডিতগণের চিত্তে স্থির থাকা চাই, সেই—"ধ্যেয সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তি নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট কেয়ুরবান, কনক-কুণ্ডল-বান কিরিটী-হারী হিরণ্ময়-বপু ধৃত শঙ্খচক্রম্।"

নিমাইয়ের ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইলেন। তাঁহারা সেইদিন হইতে নিমায়ের উপদেশানুসারে হৃদে কালী, বহি শিব, বদনে কেবল হরিধ্বনি করিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলনে দেশ ধন্য হইল। নিমাইয়ের মহত্বে সকলে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মান্য করিতে লাগিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

যবনে হিন্দুভাব।

"মা সোহাগে বাপের আদর" বৈষ্ণবগণ বুঝিলেন—মাকে সন্তুষ্ট না করিলে, বাপের আদর পাওয়া যায় না। মাই বাবাকে চিনাইয়া দেন তবে সন্তানের পিতৃভক্তি প্রকাশ পায়; অতএব মাকে অবহেলা করা, অমান্য করা—অধঃপতনের মূল। শাক্তগণও বুঝিলেন—পিতৃভক্তি না করিলে, মায়ের বিষনয়নে পড়িতে হয়; কারণ পিতা যে মাতার গুরু। অতএব গুরুর-গুরুর অমান্য করিলে—ইহকাল পরকাল, একুল-ওকুল দুই কুলই নষ্ট হইবে। মাতৃভক্তি-শূন্য বৈষ্ণব যেমন—অবৈষ্ণব, তেমনি বিষ্ণুভক্তি-শূন্য শাক্তও পতিত—অধমাধম।

অতঃপর শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে এইরূপ অভেদ ভাবের প্রভাব জাগাইয়া দিলে, তাঁহারা স্বহস্তে ছাগপশু দুইটীর বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। পণ্ডিত শাক্তগণ বিবেক-বুদ্ধি বলে প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিত তাঁহাদের গুরুস্থানীয় হইয়া, হরিনামের বলে মনের মলা-মাটী ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ তাহাতে সহায়তা করিতে কৃপণতা করিলেন না।

ইহার পর হইতে বৈষ্ণবের দল ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপে প্রাধান্য লাভ করিল। চারিদিকেই সংকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; ঘরে ঘরে

খোল-করতালের শব্দ, অঙ্গনে-প্রাঙ্গনে তুলসী মঞ্চ, ভক্তগণ তাহার চারিধার বেষ্টন করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। তখনকার দৃশ্য যে কি প্রকার মনোহর, তাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই হরিনামে উন্মত্ত। যাহারা বিদ্বেষী ছিল— তাহারা কাজির নিকট নালিশ করিল, কাজী হুকুম দিলেন— "হরিনামের দল বাহির হইলেই আটক কর।"

সেই সময় শান্তিপুরের নিকট বুড়ন গ্রামে, হরিদাস নামক একজন ভক্ত, অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট ভক্তি বিষয়ক উপদেশ পাইয়া, অবিরাম হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। হরিদাস হরিনামে এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে হরিনামই সকল সাধনার সার— হরিনাম করিলে আর কোন সাধনার আবশ্যক হয় না। ইনি বুড়নগ্রাম নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র, অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, যবন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে সকলে যবন-হরিদাস বলিত। তাঁহাকে হরিনাম হইতে বিমুখ করিবার জন্য গ্রামের জমিদার একটী পরমাসুন্দরী বেশ্যাকে পাঠাইয়া মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বেশ্যাটী নিজেই হরিনামে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। হরিদাস তাহাকে ভেকধারণ করিয়া হরিনাম জপের অনুমতি দিয়া, অন্যত্র গমন করিলেন।

কাজী যবন-হরিদাসকে কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাকে ডাকিয়া লইয়া হরিনাম ছাড়িতে বলিলেন এবং কল্‌মা পড়িয়া পুনরায় সংশোধিত হইয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। হরিদাস কাজীর কথা শুনিলেন না দেখিয়া,

শান্তিপুরের কাজী মুলুকচাদ খাঁ তাঁহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য, নবাব হোসেন সাহেব অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। দণ্ডাজ্ঞা হইল—প্রাণ বধ; ২২ বার জোরে বেত্রাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিবার হুকুম হইল। হরিদাস তাহাতে ভীত না হইয়া, অকাতরে সেই ভীষণ শাস্তি মাথা পাতিয়া লইলেন, তিনি সমাধীস্থ হইয়া সেই বেত্রাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। কঠোর বেত্রাঘাতে মরিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, সকলে তাঁহার শবদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত না করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিল।

অতঃপর ইনি গঙ্গার জলে ভাসিতে ভাসিতে কিছুদূর গমন করিয়া, নবজীবন লাভ করতঃ তীরে উঠিলেন। নবাব সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে পরম সাধু সাব্যস্ত করিয়া, তাঁহার উপর আর কোন হুকুম জারী করিলেন না। হরিদাস নিঃসঙ্কচিত্তে কুলিন গ্রামে গিয়া বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং প্রাণের সহিত হরিনাম সাধনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন।

যখন পরম ভক্ত বলিয়া নিমাই পণ্ডিতের নাম চারিদিকে খ্যাত হইল, তখন একদিন অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত তিনি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাসকে পরম ভক্ত বলিয়া সকলেই জানিত, ভক্তগণ তাঁহাকে নিমাইয়ের নিকট লইয়া গেল। নিমাই এই পরম ভক্তের সঙ্গলাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন এবং নানা প্রকার সুখাদ্য দানে আতিথ্য সৎকার করতঃ তাঁহাকে পুষ্প-চন্দনে সুশোভিত করিলেন। রতনে রতন চিনে—হরিদাস নিমাইকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের পদে আত্মসমর্পণ করিলেন।

এই সময় নিমাই পণ্ডিতের কখন ভক্তভাব, কখন ভগবানভাব হইত। যখন তিনি ভক্তভাবে অবস্থিতি করিতেন, তখন তৃণাদপী সু-নীচ হইয়া সকলের পদধূলি লইতেন—তুলসী তলায় প্রণাম করিতেন আর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইতেন। আবার যখন ভগবান-ভাব হইত, তখন তাঁহার সেই শ্রীঅঙ্গে বাস্তবিকই দেবশ্রীর বিকাশ হইত; তিনি দেবমূর্ত্তি নামাইয়া ফেলিয়া—বিষ্ণু খট্টায় বিষ্ণু হইয়া বসিতেন, আর ভক্তগণ আবেগ ভরা প্রাণে, সেই শ্রীমূর্ত্তির পদে তুলসী-চন্দন লেপন করিত—নানাবিধ পুষ্প মাল্যে শ্রীঅঙ্গ সমাচ্ছাদিত করিয়া ধ্যান করিত :—

"শ্রীগৌরাঙ্গমহং বন্দে রাধাকৃষ্ণস্বরূপকম্,
অন্তঃকৃষ্ণং বহিগৌরং দ্বিভূজং করুণাময়ম্।
তপ্তকাঞ্চনপুঞ্জাভং রক্তবস্ত্রং সুনাসিকম্,
নমঃ ক্লীং চৈতন্য মহাপ্রভবে নমঃ নমঃ॥"

এইরূপে বিবিধ উপচার উৎসর্গ করিয়া সকলে প্রসাদ ভক্ষণ করিত। সে রূপ দেখিলে বাস্তবিকই চিত্ত হরণ হইয়া যায়; সকলেই সেই অপরূপ রূপে মুগ্ধ, আত্মহারা হইয়া—প্রভূকে বেষ্টন করতঃ সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। আজ অদ্বৈত্য ও হরিদাস আসিয়া নিমাইয়ের দেবভাবে বিভোর হইলেন। প্রকাশ্যে না হউক, ভিতরে ভিতরে নিমায়ের অবতার সম্বন্ধে তাঁহাদের একটু অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তাহার কারণ রহিল না। সামান্য জীবে কখন এভাবও সম্ভব হইতে পারে না। মানব শক্তিতে এরূপ পূজা গ্রহণ করিবার

শক্তিলাভ অসম্ভব! কপট মানব হইলে সে টিকিবে কত দিন? ভরা। চরণে পড়িয়া গড়াগড়ি দিলেন—তাঁহার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল। ন

অবিশ্বাস মানবের শত্রু নহে—মিত্র। অবিশ্বাসের পর একবার হৃদয় বিশ্বাসবদ্ধ হইলে, তাহা চিরদিন অচল অটল ভাবে থাকে। যাহার সহজে বিশ্বাস হয়, তাহার সে বিশ্বাস আবার সহজে যাওয়াই সম্ভব; কিন্তু অবিশ্বাসের মাটীতে একবার বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হইলে আর তাহার বিনাশ নাই। নরম মাটীতে কোন কিছু প্রোথিত হইলে, তাহা সহজেই উৎপাটন করা যায়, কিন্তু কঠিন মাটীতে একবার তাহা প্রবিষ্ট হইলে উৎপাটন করা সহজসাধ্য নহে। অদ্বৈতের অবিশ্বাসভরা হৃদয়ে এই বিশ্বাসভাবের উৎপত্তি প্রগাঢ় শিকড় বদ্ধ হইয়াছিল।

আজ শচীদেবীর অঙ্গনে যাবতীয় ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, ভক্তগণ প্রেম-পুলকিত হৃদয়ে ভজনানন্দ উপভোগ করিতেছেন। সে ভাব দেখিয়া শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। শচীদেবী মনে করিতেছেন—নিমাই পাগল হইয়াছে, আর পতির এই দশা দেখিয়া, পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ দুঃখ তরঙ্গে ভাসিতেছে। শচীদেবী একমাত্র পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন—"হে বৈষ্ণব! আমার মত জন্ম-দুঃখিনী আর কেহ নাই, কাঁদিতে কাঁদিতেই আমার জন্ম গেল। পতিশোক, কন্যাশোক এবং পুত্রশোকে আমি জর জর মর মর হইয়া, কেবল নিমাইয়ের মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া ছিলাম; কিন্তু শেষ দশায় সে এ কি করিল? আমার অদৃষ্ট যেমনই হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু অল্পবয়সে বধূমাতার ভাগ্য চিন্তা করিয়া, আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। নিমাইয়ের

এইরূপ বায়ুগ্রস্থ ভাব দেখিয়া সে অহরহঃ কাঁদিয়া আকুল হয়। তবে কি বাছাকে আমার কোন অপ দেবতায় ধরিয়াছে? কেমন করিয়া ইহার প্রতিকার হইবে? আপনি বয়োবৃদ্ধ—দয়া করিয়া তাহার পরামর্শ দান করুন।

শ্রীবাস শচীদেবীকে বুঝাইয়া বলিলেন—"দেবি! আপনি পুত্রের জন্য কেন বৃথা চিন্তা করিতেছেন। আপনার পুত্র যে বিকারগস্ত হইয়াছেন, ব্রহ্মা, শিবও সেই বিকারভাব সদা প্রার্থনা করেন। ঠাকুরাণী, আপনার পুত্রের কোন রোগ নাই, তাহার কোন রোগ হইতে পারে না, বৃথা অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন কেন? আপনার পুত্রের নাম স্মরণ করিলে যখন জীবের সকল অমঙ্গল নাশ হয়, তখন তাঁহার আবার অমঙ্গল চিন্তা! এ যে বাতুলের কথা মা!

শচীদেবী বলিলেন—"মহাত্মন! যে দিন হইতে বিশ্বরূপ ছেড়ে গেছে সেই দিন হইতে আমার প্রাণ আর কোনরূপে প্রবোধ মানে না নিমাইয়ের ঐ ভাব দেখে ভয় হয়, পাছে সেও ফাঁকী দিয়ে পালায় গয়া থেকে এসে অবধি বাছার যে কি হ'ল, কিছুই বুঝতে পারছি না।' এই বলিয়া শচীদেবী অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস বলিলেন—"মা! তোমার নিমাই পুত্রটী সাধারণ নয়! পৃথিবীতে হরিনাম প্রচার করিতে, ধর্ম্মহীন জীবকে ধর্ম্মে মতিমান করিতে তাঁহার জন্ম। মা! পুণ্যবতী তুমি—তাই অমন পুত্র জঠরে ধরিয়াছ, নিজে সান্ত্বনা লাভ কর এবং সৌভাগ্যবতী বধূমাতাকে সান্ত্বনা দান কর ইহাতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।"

দুইজনের কথা ফুরায় নাই—এমন সময় নিমাই নিজ স্বভাব প্রাপ্ত

হইয়া, গৃহে আগমন করিলেন। তখনও আঁখি প্রেমনীরে ভরা। ভক্তভাবের পর চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নিমাই জননী সন্নিধানে আসিতেছেন দেখিয়া, শচীদেবী বলিলেন—"দেখুন, দেখুন, নিমাই পাগলের মত এদিকেই আসিতেছে, ভাব দেখিলে প্রাণ ফেটে যায়।"

নিমাই ভক্তিভরা প্রাণে আসিয়া জননীর পদে প্রণাম করতঃ বলিলেন—"মা! আজ আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই, আজ ভগবানের মহাভক্তসকল আমাদের কুটির পবিত্র করিয়াছেন; পদধূলি দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।"

সন্তান-বৎসলা জননী সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না; ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ নিমাইকে বাহু বেষ্টন করিলেন, অঞ্চল দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া বলিলেন—"নিমাই! পূজা-পাঠ হইয়াছে কি, আহার করিবি কখন? হাঁরে, না খেয়ে খেয়ে যে শরীর কালী কর্‌লি, সোনার অঙ্গ শ্রীহীন হ'য়ে গেল। খাওয়া-পরায় একটু মন দে, সমস্ত দিন কেবল হরি হরি ক'রলে কি হবে বাবা?"

নিমাই বলিলেন—"মা! হরি ভজিলেই দেহের জ্যোতিঃ বাড়ে। দেখ দেখি, এই সব ভক্তবৃন্দকে; মরি মরি! কি সুন্দর কুসুম-ললাম দেহের জ্যোতিঃ! তুমি জাননা মা, তাই হরিনাম কর্ত্তে বারণ ক'রছো।"

"আচ্ছা, তা করিস্; এখন বেলা অনেক হ'য়েছে, খাওয়া-দাওয়া ক'রবি চল্।"

"মা! আজ আমি একা খাব না, এই ভক্তগণের সঙ্গে আজ প্রাণের ভোজন ক'রবো।"

"তা জানি, বধূমাতা জানিয়া শুনিয়াই সকলের আয়োজন ক'রে রেখেছেন---এখন চল।"

নিমাই ভক্তগণের সঙ্গে আহারে বসিলেন। আজ আহাবে কোন জাতিভেদ নাই; সকলেই সকলের মুখে খাদ্য তুলিয়া দিয়া, তাহাই আবার নিজে ভোজন করিতেছেন। শচীদেবী পবিবেশন কবিতেছেন, ভক্তগণ দেখিতেছেন—শ্রীবৃন্দাবন ধামে আজ রাখালগণ পরিবৃত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রস-ভোজনে প্রমত্ত। শ্রীরাধারূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের সে মধুব লীলারস পান করিতেছেন আর বলিতেছেন—"অদ্যকার রন্ধন-কার্য্য আমাব সার্থক হইল।"

আহারাদির পর, সকলে আচমন করতঃ আসনে আবেশ-আনন্দ উপভোগ করিয়া, দিবাবসানে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনেব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিমাই সকলকে আগামী কল্য নগর-কীর্ত্তনে যোগদানের আদেশ করিয়া, বিদায় দান করিলেন। শচীদেবী বধূমাতার সহিত দিবসের গৃহকার্য্য শেষ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পাষণ্ড দলন।

গৌড়ের সিংহাসনে হোসেন সাব প্রতাপ অক্ষুন্ন। তিনি তদানিন্তন গৌড়েব প্রসিদ্ধ নগর বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপে, চাঁদ খাঁকে এবং শান্তিপুরে মুলুক চাঁদকে কাজী নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের হস্তে ইহার শাসন ভার প্রদান করিয়াছেন। নবদ্বীপ তখন বাঙ্গালার প্রধান নগর, বহু লোকের বাস, দেশের যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর ইহা আবাসস্থল। তখন শাক্ত-বৈষ্ণবে প্রায়ই বিবাদ হইত, এইজন্য প্রভূত-জনসঙ্কুল এই জেলার শাসনভার উক্ত দুইজন প্রসিদ্ধ কাজীর উপর ন্যস্ত ছিল।

কাজীর অধীনে দুইজন সহর কোতয়াল নিযুক্ত ছিল; ইহারা জাতিতে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, নাম—মাধব রায় ও জগন্নাথ রায়। ইহাদের দুই ভাইকে লোকে 'জগাই-মাধাই' বলিয়া ডাকিত। ইহারা ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিল; এমন কু-কর্ম্ম কিছু ছিল না—যাহা জগাই মাধাইয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহারা অহোরাত্র মুসলমানের সহবাসে বাস করিত এবং অবিরত মদ্যপান করিত; আহারের কোন আচার-বিচার ছিল না। কাজী তাহাদের কার্য্য দেখিয়া বড়ই প্রশংসা কবিত, কারণ এক জনকে ধরিয়া আনিতে বলিলে তাহারা তাহাকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজীর নিকট হাজির করিত। কোন প্রকার কু-ক্রিয়ায় তাহারা অপারক ছিল না; চৌর্য্যবৃত্তি, নরহত্যা, সতীর সতীত্ব

নাশ, লোকের ঘরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে তাহার সিদ্ধহস্ত ছিল। লোকে পুড়িয়া মরিতেছে, চুরী হইয়া দারুণ অভাবে কষ্ট পাইতেছে ইত্যাদি দেখিলে, তাহাদের প্রাণে বড় আনন্দ হইত। কাজির আদরের পাত্র বলিয়া তাহারা সদাসর্ব্বদা নানা প্রকার আস্ফালন করিয়া বেড়াইত। ভদ্র সমাজ বিপ্রকুল-কলঙ্ক এই পাষণ্ডদ্বয়কে দেখিলে, ভয়ে জড় সড় হইত; 'দুর্জ্জনকে দূরে পরিহর' বলিয়া লোকে তাহাদের সঙ্গ করিত না।

ইহারা অর্থ দ্বারা কাজীকে বশ করিয়াছিল এবং কাজীর সহিত একত্র ভোজনে তাহারা দ্বিধা বোধ করিত না; যথেচ্ছাচার করা এই ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। মদ্যমাংস প্রভৃতি আহার করিতে পাইলে দল পুষ্ট করিবার ভাবনা থাকে না; এইজন্য বহু অশিক্ষিত ইতর-ভদ্র লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিত। কাজী নাম মাত্র, ইহারাই নগরের কর্ত্তা; এ হেন পাষণ্ডদ্বয়ের হস্তে পড়িয়া নগরবাসী কিরূপ সুখশান্তি ভোগ করিত—তাহা সহজেই বিবেচ্য।

নিমাই-নিতাই যেদিন হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া সংকীর্ত্তনের দল বাঁধিলেন, যেদিন বড় বড় পণ্ডিত, বিশিষ্ট শাক্ত-ভক্ত ঐ দলে যোগদান করিলেন এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া যখন বৈষ্ণবগণের সহিত সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, অযথা মদ্যমাংস ভোজন করিয়া বেড়ান দোষ এবং যাহারা এইরূপ করিবে, নিমাইয়ের সম্প্রদায় তাহাদের সমাজে রহিত করিবেন ইত্যাদি প্রচার করিয়া দিলেন, সেইদিন হইতে জগাই-মাধাইয়ের প্রাণে দারুণ বিদ্বেষ ভাব জাগিয়া উঠিল।

শাক্ত-বৈষ্ণবে সম্মিলিত হইয়া, নিমাইয়ের দল তখন খুব বড়

হইয়াছে ; সকলেই প্রায় নিমাইয়ের ভক্ত। দুই একজন যাহারা ব্যভিচার ছাড়িল না, তাহারা নিমাইয়ের দল হইতে বাদ পড়িল। তাহারা বিষম কোপাবিষ্ট হইয়া, দুর্বৃত্তদের দমন করিবার জন্য কাজীর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ইহাদের অগ্রণী হইল—জগাই-মাধাই।

নিমাই ও নিতাইয়ের প্রতি পাষণ্ডদ্বয়ের ঘোরতর আক্রোশ জন্মিল ; কিন্তু শুধু আস্ফালনে কি ফল হইবে? নিমাইয়ের দলের গগনভেদী হরিনাম ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইতে লাগিল ; তাহাদের প্রেমময় তাণ্ডব-নৃত্যে নবদ্বীপ টলটলায়মান হইয়া উঠিল। একজন একবার হরিধ্বনি করিলে, শত শত নরনারী বাহির হইয়া তাহাতে যোগদান করে। কাজী নিজেই যখন ইহাদের সম্মিলন-শক্তি দেখিয়া ভীত, তখন অপর কাহার সাধ্য যে তাঁহাদের সম্মুখীন হয়—তাঁহাদের প্রবল প্রতাপে বাধা দেয়!

তখন হিন্দু-সমাজে ধর্ম্মপ্রচার বিধির প্রচলন ছিল না ; সশিষ্য নিমাই প্রথমে এই প্রথা সমাজে প্রচলিত করেন। নিতাই হরিদাসকে লইয়া প্রত্যহ হরিনাম প্রচার করিতে বাহির হইতেন ; জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইত। যেখানে পতিত বা অধম কাহাকেও দেখিতে পাইতেন—সেইখানেই তাঁহারা যাইয়া অযাচিত ভাবে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন, পদে ধরিয়া সকলকে বলিতেন—"ভাই! পাপ করিয়াছ বলিয়াই এই দুর্দ্দশা ; একবার বদনভরে হরিনাম কর, সকল পাপ-তাপ নষ্ট হইবে—জীবনে বিপুল শান্তি পাইবে।" তাঁহাদের সেই দেবপ্রতিম নধর শরীর-কান্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িত এবং তাঁহাদের সেই হরিপ্রেমে মাতোয়ারা নম্র স্বভাবে সকলেই বশীভূত

হইয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিত। নামের ঐশীশক্তি বলে তাহাদের প্রাণে এমন প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়া যাইত যে, তাহারা আর সে নাম ছাড়িতে পারিত না। এইরূপে নিতাই, হরিদাস প্রভৃতি সকলে প্রভু নিমাইয়ের আজ্ঞা লইয়া, শত শত নর-নারীর উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন।

একদিন জগাই-মাধাইয়ের প্রতি তাঁহাদের নজর পড়িল। তাঁহারা মনে করিলেন—ভক্তকে ভক্তিভাবে বিভোর করা অতি সহজ, কিন্তু এই দুইজন পাষণ্ডকে হরিনামে মজাইতে পারিলেই আমাদের প্রচার কার্য্য সার্থক হয়। এইরূপ মনস্থ করিয়া নিত্যানন্দ সদলবলে একদিন তাহাদের সন্মুখীন হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিলেন। মদ্যপানে বিভোর রক্তাক্তলোচন পাষণ্ডদ্বয়, তখন ভাণ্ড ভরিয়া সুধা লইয়া পান করিতেছিল; একবার ঘৃণার চক্ষে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। নিতাই অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"ভাই। চিরদিনই কি পাপে মত্ত থাকিবে? একবার যদি তোমরা দুই ভায়ে কৃষ্ণনাম কর, তাহা হইলে দেখিবে, যে সুরা খাইতেছ তাহা অপেক্ষা এ সুরা কত মধুর এবং কত শীঘ্র ইহাতে মত্ততা আসে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরিনামের প্রতি—নিমাইয়ের দলের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ ভাব বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু ঠিক সময়ে পায় নাই বলিয়াই তাহারা এতদিন কিছু করিতে পারে নাই। আজ তাঁহাদিগকে নিজেদের ক্ষমতাধীনে আসিতে দেখিয়া, হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিল এবং একটী কলসী ছুড়িয়া নিত্যানন্দকে এমন প্রহার করিল যে, তাঁহার ললাটদেশ কাটিয়া অজস্র শোণিত ধারা

নির্গত হইতে লাগিল। হবিনাম শুনিলে জগাই-মাধাইয়ের ক্রোধ শতগুণ বর্দ্ধিত হয়; ঐ নিরামিষাসী গয়লা বেটার নাম তাহাদের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ করে। কাজেই হরিবোল বলিতে বলিতেছে শুনিয়া, তাহাবা একবার নয়—দুই তিন বার নিত্যানন্দকে ঘোরতর ভাবে নির্য্যাতন করিল। নিতাই প্রহার খাইয়াও আনন্দে নাচিতে নাচিতে বলিলেন:—

"মেবেছিস্ কলসীব কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না।"

নিতাই পুনরায় বলিলেন—"ভাই! মারিয়াছ বেশ করিয়াছ; এইবার এস, গলা ধবাধরি কবিয়া হরিনাম করি!"

নিতাইয়েব উদারতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, নিরহঙ্কারীতা এবং জীবের দুর্গতী নাশের জন্য প্রাণের গভীরতা দেখিয়া, জগাই একটু নম্রতা স্বীকার করিল। কিন্তু মাধাইয়ের প্রাণ পাষাণ হইতেও কঠিন; এই সোণার অঙ্গে রক্তধারা দেখিয়াও তাহার প্রাণে তিলমাত্র মায়া-মমতার উদ্রেক হইল না। সে পুনরায় প্রহার করিতে অগ্রসর হইল দেখিয়া, সকলে নিমাইকে গিয়া সংবাদ দিল।

নিমাই ভক্তের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্রুতগতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে হতভাগ্য বিপ্রাধম! এত পাপ করিয়াও পাপের আশা মিটে নাই? আজ আবার এই মহাপুরুষের অঙ্গে প্রহার করিয়া পাপের মাত্রা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিলি! তোদের এত অহঙ্কার কিসের?" এই বলিয়া রাগে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর ভাব দেখিয়া পাছে হিতে বীপরীত হয় ভাবিয়া,

নিজেই ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন—"প্রভো। এ অবোধ ভ্রাতৃদ্বয়কে রক্ষা করিতে হইবে। আমার কপালে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না।'

পাষণ্ড উদ্ধারে নিত্যানন্দের অসীম ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া, প্রভু কাঁদিয়া ফেলিলেন। এত নির্য্যাতন, এত প্রহারেও তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র রাগের উদয় হয় নাই। মরি মরি, পরোপকারে—পাপীর উদ্ধার সাধনে কি একনিষ্ঠ অনুরাগ। নিমাই নিতাইয়ের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া, ভাব-বিহ্বল হৃদয়ে বলিলেন—"প্রভুপাদ। জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমারই প্রাণ যথার্থ কাঁদিয়াছে।"

জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের জন্য নিত্যানন্দের কাতর প্রার্থনা দেখিয়া, নিমাই উগ্র স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কোমল হইয়া বলিলেন—"ভাই! পাপীকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিতে হয়, তাহা কেবল তুমিই শিখিয়াছ। তোমার এই উতপ্ত রক্তপাতে পাষণ্ডদ্বয়ের আজন্ম সঞ্চিত মহাপাপ ধ্বংস হইল—আজ তাহারা নিষ্পাপ হইল। তোমার এই কীর্ত্তি চিরদিন জগতে অতুলনীয় হইয়া রহিবে।"

ধর্ম্মের নিকট পাপের প্রকোপ বেশীক্ষণ থাকে না। নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়া জগাই ইতিপূর্ব্বেই একটু নম্রতা স্বীকার করিয়াছিল, তারপর যখন নিমাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সেই ভুবনমোহন দিব্যকান্তি দেখিয়া, উভয় ভ্রাতাই চরণে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া দিতে লাগিল; অনুতাপের অশ্রুজলে হৃদয়-মল প্রক্ষালিত করিল। প্রভু বলিলেন :—

"আয়রে মাধাই। কাছে আয়, হরিনামের বাতাস লাগুক গায়।"

তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজ হৃদয় ভাণ্ডস্থিত মহাবীজ হরিনাম লইয়া, জ্ঞান-পাবকের প্রকাণ্ড কুণ্ডে প্রেমভক্তির ক্ষীর-নীরে পাক করিয়া, রমান্ন প্রস্তুত করতঃ জগজ্জননী অন্নপূর্ণার মত অকাতরে বিতরণ করিতে করিতে গাহিলেন :—

নাম সুধারস কে নিবি রে আয়।
এ যে দেবের দুর্লভ হরিনাম, নামে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে যায়,
নামের গুণে বোবায় বলে, পঙ্গু চলে, অন্ধ চক্ষে দেখতে পায়॥

পাপীর প্রাণের ক্ষুধা বেশী, পিপাসা অত্যধিক, তাই পাপী জগাই-মাধাই আকণ্ঠ ভরিয়া এই নাম-সুধা-রস পান করিয়া, এই নামের মহা মাধুরীধারায় অবগাহন করিয়া একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট অনসন-উপবাসী জীব, এ অমৃত পানের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া, আকণ্ঠ ভোজন করতঃ একেবারে চৈতন্যহীন হইল। তাহাদের চির-কঠিন হৃদয়—কমনীয় হরিনামের বিশ্বব্যাপী তরঙ্গে একেবারে তলাইয়া আত্মহারা হইয়া গেল। নিমাই দুই ভাইকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দানে চরিতার্থ করিলেন।

নিত্যানন্দ দুই ভাইকে দীক্ষিত করিলেন, গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া তাহাদের কর্ণে হরিনাম-মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। জগাই-মাধাই একেবারে নূতন মানুষ হইল, সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হইল। প্রত্যহ দুই লক্ষ জপ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, গঙ্গাতীরে জপ করিবার জন্য একটী ঘাট প্রস্তুত করিল। নবদ্বীপে এখনও সে ঘাটের অস্তিত্ব বর্ত্তমান।

নদের নিমাই।

মহাপাপী জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার হইল দেখিয়া, ভক্তগণ গগন বিদীর্ণ করিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সকলে প্রাণ ভরিয়া গাহিলেন :—

'নিতাই এনেছে নাম নিতে হ'লো।
প্রাণ ভরে সবাই মিলে হরি বলো॥

নবানুরাগের স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিয়া জগাই-মাধাই হরিধ্বনি করিতে লাগিল। পাষাণ গলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সেই ঢল ঢল প্রেম তরঙ্গের তাণ্ডব নৃত্যে মোহিত হইয়া, সকলে বিস্ময়পুলকে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। জগাই-মাধাইয়ের মত পাষণ্ডদ্বয়ের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দর্শনে সকলের চক্ষু ফুটিল—মন গলিল। আজ অনেক পাষণ্ডই নিমাই পণ্ডিতের অসীম দৈবশক্তির মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

গর্ব্ব খর্ব্ব।

নিমাইয়ের কৃপায় এখন নবদ্বীপে সকল সম্প্রদায় এক হইয়াছে। এখন আর শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, গানপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ে অমিল নাই। সকলেই বুঝিয়াছে—মা না হইলে বাবাকে পাওয়া যায় না এবং বাবাকে না পাইলেও মায়ের অস্তিত্ব লোপ পায, অতএব এখন সকলেই অভেদভাবে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া, মহাপ্রভু নিমাই পণ্ডিতের সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছে।

দৈবশক্তির বলে বলীয়ান না হইলে, শুধু কথায় বা বর্ক্তৃতায় সকলকে একত্র করা যায় না। অবতার বল্ল মহাপুরুষ না হইলে এরূপ আকর্ষণী শক্তিলাভও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই নিমাই মানুষ নহেন—স্বয়ং ঈশ্বর; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবোদ্ধারের জন্য নিমাইরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহা সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। যখন নিমাইয়ের ভুবন-মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ-রসের সঞ্চার হয় এবং তাঁহার অমিয়-মধুর কথা শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, সকল ভয়-ভীতি দূরে পলায়, তখন নিমাই যে স্বয়ং ভগবান—সে বিষয় আর সন্দেহ কি?

যখন নিমাই অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন, তখনই নগর-কীর্ত্তনের উচ্চরোলে দেশ উন্মত্ত হইল। চারিদিকেই খোল, করতাল এবং হরিধ্বনি। বিপক্ষ হিন্দু ও মুসলমান দিবারাত্র এই উৎপাতে

ঝালাফালা হইয়া কাজীর নিকট নালিশ করিল। কাজী সাহেব প্রথমে সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কারণ একেত নালিশের বিষয় অতি তুচ্ছ, তাহার উপর যাঁহার নামে নালিশ—সেই নিমাই পণ্ডিত কাজী সাহেবের প্রাণের চাচা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। সামান্য একটা বালকের সহিত বিরোধ করিতে যাওয়া, কাজীর ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর উচিত নয়। নিমাই পণ্ডিত ছেলেমানুষ, নাচ-গান করিয়া বেড়ায়—ইহাতে আর ক্ষতি কি? কিন্তু তিনি দেশের শাসন-কর্ত্তা, কাজেই অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহার মিমাংসা করা উচিত বিবেচনা করিয়া, সকলের অনুরোধে একদিন নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বাস্তবিকই চারিদিকে বিষম কলরব, কাণ পাতা দায়। তখন তিনি হুকুম দিলেন যে—"যাহারা পুনরায় নগরে এইরূপ অশান্তি উৎপাদন করিবে, তাহাদিগকে বিশেষরূপে শাস্তি দেওয়া ত হইবেই—অধিকন্তু বলপূর্ব্বক জাতি নষ্ট করা হইবে।"

কাজী সাহেবের এই কঠিন ঘোষণাবাণী শুনিয়া, ভক্তবৃন্দ ম্রিয়মান হইল, সকলে তাহাদের রাজাধিরাজ নিমাইচাঁদের নিকট কাজীর কড়া হুকুমের কথা জ্ঞাপন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিমাই পণ্ডিত কাজীর দুর্ম্মতির কথা শুনিয়া ভয়ানক রাগান্বিত হইলেন এবং রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন—"এত বড় আস্পর্দ্ধা! কাজী প্রভুর নাম-কীর্ত্তন বন্ধ করিতে হুকুম দিয়াছে? আচ্ছা, অদ্যই আমি কাজীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিব।"

অতঃপর তিনি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—"প্রভূপাদ! তুমি নগরে নগরে ঘোষণা করিয়া দাও যে, অদ্য সন্ধ্যার সময় আমরা

নগব কীর্ত্তন কবিতে বাহিব হইব। সকলে যেন সন্ধ্যাব সময় আমাদেব বাড়ীতে সমবেত হয।”

নিত্যানন্দ তাহাই কবিলেন। প্রভুব আদেশ শিবোধার্য্য কবিয়া সকলেই সন্ধ্যাব প্রাক্কালে প্রভুব আঙ্গিনায় দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিল। গ্রামবাসী উন্মত্ত, তাহাদেব পদভবে গ্রাম টলমল। শত্রু-মিত্র সকলেই উপস্থিত। কেহ কাজীর সহিত সংগ্রাম দেখিতে আসিযাছে, কোন্ পক্ষ হাবিয়া যায এবং কোন্ পক্ষ জযলাভ কবে—আজ তাহা প্রত্যক্ষ কবিবে। কেহ বা প্রাণেব উত্তেজনায় প্রভুব সহিত কীৰ্ত্তন-বসে বসিত হইয়া জীবন সাথক কবিতে আসিয়াছে—প্রাণেব ভয় ইহাদের একেবাবে নাই।

একে নিমাই পণ্ডিতেব দেবদুর্লভ কান্তি, তাহাব উপব আজ আবাব ভক্তগণ তাঁহাকে মনেব সাধে অলকা-তিলকা দিয়া সাজাইয়াছেন। গৌবাঙ্গসুন্দবেব সে প্রাণ-মন-বিমোহন বেশ দেখিলে, বনেব পশুপক্ষীও চাহিয়া থাকে—মানুষ ত’ কোন্ ছাব।

তাবপব তিনি যখন বাহিরে আসিয়া ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইলেন এবং বিপুল জনসঙ্ঘ যখন প্রাণভবা উৎসাহে গগনভেদী হবিধ্বনি করিয়া উঠিল, প্রভু যখন নিত্যানন্দকে পার্শ্বে লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন—ক্ষণে ক্ষণে যখন বিশ্বম্ভবের জয়-উল্লাস বাড়িতে লাগিল—তখন বাস্তবিকই নবদ্বীপ যেন বৈষ্ণব-বাহিনীর পদভরে ঘন ঘন কম্পান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হরিধ্বনি, আর মাঝে মাঝে প্রভুর হুঙ্কারধ্বনি, গলদঘর্ম্ম হইয়া গিয়াছেন, তথাপি ক্লান্তি বোধ নাই। বিষম উৎসাহে অদম্য অবোল হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেছেন—

'মদ দে—মদ্ দে।" ভক্তগণ পবিত্র গঙ্গাবারি দান করিতেছেন। আজিকার এ কীর্ত্তনে আর কোন ভক্তই যোগদান করিতে বাকী নাই, সকলে নিমাই-নিত্যানন্দকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস, শ্রীদাম অদ্বৈত, গদাধর, জগাই-মাধাই প্রভৃতি ভক্তগণ উন্মাদ ভৈরব বেশে কাজীর দর্প চূর্ণ করিতে চলিয়াছেন।

ক্রমে সমস্ত ভক্তসঙ্ঘ চারিটী দলে বিভক্ত হইল। এক একটী দলে এক একজন প্রধান ভক্ত। হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি কতকগুলি ভক্ত লইয়া একটী দল গঠন করিলেন। প্রভু নিমাই, নিত্যানন্দকে লইয়া আর একটী দল গঠন করিলেন এবং যাবতীয় পণ্ডিত মণ্ডলী এই দলভুক্ত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

আজ বিরাট সংকীর্ত্তনের আয়োজন; নিমাই পণ্ডিত আজ কাজীর দর্পচূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, তাই সে যুদ্ধের আয়োজন এত মহৎ—তাহার ঘন গভীর গর্জ্জন এত ভয়ঙ্কর। যে শুনিল সেই আসিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গবাক্ষে, কান্তারে, পথে, মাঠে, ঘাটে প্রভুর সেই দোর্দ্দণ্ড লীলা-মাধুরী দেখিবার জন্য মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়াছে। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া আয়ত-লোচনে ফুল্ল-বদনে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় নিমাইচাঁদের সে রূপমাধুরী, সে অপ্রতিহত প্রভাব দেখিবার জন্য গবাক্ষ আড়ে আড়ী পাতিয়া বসিয়া আছেন। শচীদেবী প্রাণের আবেগে বলিতেছেন—"মরি মরি। আজ আমার নিমাই ভক্তবৃন্দের মান রক্ষা করিবার জন্য—সংকীর্ত্তনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কাজীর সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে যাইতেছে। ভগবান! তাহার মুখ রক্ষা কর।"

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণপ্রিয় হৃদয়েশ্বরের জয়লাভের জন্য, বিজয়-প্রদায়িনী মহামায়ার শরণাপন্ন হইতেছেন।

আজ নবদ্বীপের প্রতি গৃহ সজ্জিত, প্রতি গৃহই মঙ্গলঘট, পুষ্পমাল্য এবং ধ্বজপতাকায় সুশোভিত। সকলেই জানেন—নিমাই সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, তাহাতে বৃন্দাবনের যাবতীয় রস-মাধুর্য্য মূর্ত্তিমান হইয়া দর্শকের প্রাণমন বিমোহিত করে। তাই আজ প্রসূতি পুত্র কোলে লইয়া—দর্শন-শক্তিহীন অন্ধ কাহারও হাত ধরিয়া, পথের ধারে দণ্ডায়মান হইয়াছে। আশা করিয়াছে—আজ মধুর ব্রজরস পান করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

গোধূলি সময়ে এই বিরাট মিছিল বাহির হইল। নগর আলোক-মালায় সজ্জিত, পথে যাইতে কোন কষ্ট নাই; তাহার উপর অগণিত মশাল লইয়া অভিভাবকগণ অগ্র-পশ্চাৎ ছুটাছুটী করিতেছে। সে এক অপূর্ব্ব শোভা, অপূর্ব্ব বিহ্বলভাবে ভক্তগণ ভক্তি-উন্মাদনায় উন্মত্ত। সহস্র সহস্র নর-নারী পুলকপূর্ণ তনুমন লইয়া, এই অভিনব ধর্ম্মযুদ্ধ সমারোহে জীবন উৎসর্গ করিতে ছুটিয়াছে। হরিনামের সেই প্রাণমাতান উচ্চরোল এবং তাহার আনন্দ-জয়ধ্বনি দিক-দেশ কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল।

যুদ্ধের সময় যেমন সেনাপতির আদেশক্রমে সৈন্যগণ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া, আপন আপন যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করিতে থাকে—তেমনি এ ধর্ম্মযুদ্ধেও সেনানায়ক নিমাইচন্দ্রের আদেশে, ভক্তবীরগণ জীবন্মোক্তির জন্য—ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ইঙ্গিত মাত্রেই প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। অন্যান্য যুদ্ধে যেমন তুরী, ভেরী,

জয়ঢক্কা প্রভৃতি রণবাদ্যসহ জয়োল্লাস হইয়া থাকে, এ যুদ্ধেও তেমনি খোল-করতাল সহ রামশিঙ্গার "দশকুশী" মহা হরিকীর্ত্তনের প্রেমোন্মাদ ভীষণ জয়ধ্বনি, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে একতানে উদ্ঘোষীত হইয়া ভক্তপ্রাণে সুধাধারা—আর অভক্তের প্রাণে ভয় বিষের বিষাদ ধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল।

নিমাইয়ের শরীরে আজ ভগবদ্ভাবের দিব্য বিকাশ। চন্দনেচর্চ্চিত সেই কনককান্তি নিমাইকে ভক্তগণ দেখিল—তাহাদের মহাপ্রভু স্বয় শ্রীকৃষ্ণ আজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। আর অভক্তগণ দেখিল—নিমাই তাহাদের যমরূপী, পাষণ্ডদলন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নগর-কীর্ত্তনের দল, গঙ্গার তীর দিয়া ধীরে ধীরে কাজীর গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। যাইতে যাইতে যাহার গৃহের দ্বারে আসিতেছে—সেই পরম পুলকিত চিত্তে কৃতকৃতার্থ হইয়া, করযোড় করিতেছে—ভক্তিভাবে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরুর পদধূলি লইতেছে। আর যাহারা অভক্ত—তাহারা ভয়ে সরিয়া যাইতেছে। রমণীগণ আনন্দচিত্তে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা ও বিদায় দান করিতে করিতে প্রার্থনা করিতেছে :—

"তুয়ার চরণে মন লাগু রহু রে শারঙ্গধর।"

প্রভু গৌরাঙ্গ কখন "শিব শিব" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, কখনও "মদ দে—মদ দে" বলিয়া ফুকারিতেছেন। তাঁহার শরীরে আজ অপূর্ব্ব শক্তির সমাবেশ হইয়াছে—প্রাণ মন ভাবোন্মত্ত। নিমাইয়ের এ মধুর ভাব দেখিয়া আজ বহু বিপক্ষ সাপক্ষ হইয়াছে, ভক্তিরসে রসিত হইয়া

প্রাণের আবেগে বলিতেছে—"ধন্য মিশ্রবংশ, ধন্য জগন্নাথ! আর যাঁহার পবিত্র গর্ভে এমন সন্তান জন্মিয়াছে, সেই শচীদেবীও যে রত্নগর্ভা—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আজ এই মহাপুরুষের পবিত্র পদরেণুস্পর্শে নদীয়া ও নদীয়াবাসী ধন্য হইল।"

নিমাই পণ্ডিত আজ কাজীকে দমন করিবার জন্য রণসজ্জা করিয়া বাহির হইয়াছেন। হরিনাম-মহামন্ত্রই এ যুদ্ধের শাণিত অস্ত্র। যে কখনও গান গাহে নাই—গান গাহিতে জানে না, সেও আজ মধুর স্বরে হরিগুণগান করিয়া, শ্রোতাগণকে মোহিত করিতেছে। ভাবের ঘোরে যাহা বাহির হইবে—তাহাই মধুর, প্রেমিক আবেগভরে যাহা গাহিবে—তাহাতেই শ্রোতার মন-প্রাণ মোহিত হইবে। প্রেমভক্তিতে তন্ময় হইলে, অতিবড় কর্কশ কণ্ঠও যে সুকণ্ঠ হইয়া যায়, তাহার মোহনীশক্তি যে সম্মোহন-শক্তির ন্যায় সকলকে আকৃষ্ট করে।

দেখিতে দেখিতে প্রভু নব নটবর বেশ ধরিলেন। যে বেশে একদিন ব্রজগোপীর মনপ্রাণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন—ব্রজের পশুপক্ষীও যে বেশে আকৃষ্ট হইতে বাদ পড়ে নাই, আজ সেই মোহন বেশে প্রথমে পরম ভক্ত মাধাইয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত ঘাটে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তারপর সেই বিপুল জনসঙ্ঘ সঙ্গে লইয়া গগন-বিদারী হরিধ্বনি করিতে করিতে কাজীর গৃহাভিমুখে চলিলেন।

কাজী চাঁদ খাঁ শাক্তগণের প্ররোচনায় সংকীর্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য কয়েক দিন নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন; কিন্তু তারপর আর তাঁহার সে খেয়াল নাই, নিজের বাড়ীতে আমোদে মত্ত হইয়াছেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার কর্ণে হরিনামের ভীষণ চীৎকার প্রবেশ করিল।

নিমাই যে এত শীঘ্র সমগ্র দেশকে খেপাইয়া, লক্ষ লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে তাঁহার বাটীর দিকে আসিতেছে, তাহা তিনি ধারণায় আনিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিলেন—প্রজা সকলে তাঁহার হুকুম অমান্য করিতেছে, তাই তিনি বলিলেন—"দেখতো, কাহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে ; আমার নিষেধ সত্ত্বেও কে হরিনাম করিতেছে ?"

কাজীর লোকসকল বাহির হইয়া দেখিল—নদীস্রোতের মত জনস্রোত তাহাদের বাটীর অভিমুখেই আগমন করিতেছে। তাহারা কাজীকে এই সংবাদ দান করিয়া, নিমাই যে সকলকে একত্র করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছে, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া সকলেই পলায়নপর হইল। এই অসংখ্য জন-বাহিনীর নিকট কাজীর মুষ্টিমেয় সৈন্য কোথায় লাগিবে? প্রমাদ গণিয়া কাজী প্রাণভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বৈষ্ণবগণ কর্তৃক কাজী সাহেবের বাটী পরিবেষ্টিত হইল।

তখন হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর বিরোধ চলিতেছিল, মুসলমানগণ প্রায়ই হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া অযথা শাস্তি প্রদান করিত। আজ তাহারা বহুলোক একত্র হইয়াছে, সঙ্ঘশক্তি তাহাদিগকে অশেষ বলশালী করিয়াছে, কাজেই তাহারা ছাড়িবে কেন? কেহ কেহ অত্যাচার করিতে লাগিল, কিন্তু গৌরাঙ্গদেব সকলকে নিষেধ করিলেন। নিমাইয়ের ইঙ্গিতে সকলে স্থির হইল বটে, কিন্তু গগনভেদী হরিনামের ধ্বনি করিতে কেহ ছাড়িল না। মুহুর্মুহু গগন-পবন বিদারিত করিয়া উচ্চরোলে হরিধ্বনি হইতে লাগিল।

নিমাই পণ্ডিত কাজীর বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

প্রার্থনা করিলেন। কাজীর লোকজন সকলেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, দুই একজন পাইক, যাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া বসিয়াছিল, নিমাই তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমাদের কাহারও কোন ভয় নাই, আমরা তোমাদের কোন অনিষ্ট করিব না, তোমরা একবার কাজী সাহেবকে ডাকিয়া দাও।"

জনৈক ব্যক্তি চাঁদ খাঁকে ডাকিয়া আনিল। কাজী বাহিরে আসিলেন এবং সেই বিরাট জন-বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিলেন, পরে গৌরাঙ্গকে তাহাদের নায়ক বুঝিতে পারিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

প্রভু অভয় দিয়া বলিলেন—"কাজী সাহেব! আমরা আপনার কোন অনিষ্ট করিতে আসি নাই, তবে শুনিলাম—আপনি নাকি আমার সম্প্রদায়কে হরি-সংকীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন—তাই আসিয়াছি। হরি সংকীর্ত্তন—কলির জীব-নিস্তারের একমাত্র উপায়; দেব এক্ষণে আমাদের অনুকুল, তবে আপনি প্রতিকূল কেন? আর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে জাতির অপমান করা হয়, জাতি অপমানিত হইলে সংঘশক্তি জাগিয়া উঠে, তখন রাজাপ্রজা সম্বন্ধ থাকে না। ধর্ম্ম যে হিন্দুর প্রাণের জিনিষ, ধর্ম্মের জন্য তাহারা অম্লানবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে, তা কি আপনি জানেন না?"

কাজী সাহেব নিমাই পণ্ডিতের সেই মধুর রূপ ও তাঁহার শ্রীমুখের সেই মধুর যুক্তিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত! আমি স্ব ইচ্ছায় তোমার হরি সংকীর্ত্তন বন্ধ করি নাই। তোমাদেরই কয়েকজন লোক আসিয়া আমাকে বলিল যে, "নিমাই পণ্ডিত নাস্তিক হইয়া মনগড়া একটা ধর্ম্ম প্রচার করতঃ, আমাদের জাতিনাশ করিতেছে,

আপনি তাহাতে বাধা দিন, নতুবা আমাদেব বড়ই অনিষ্ট হইবে। আমি সেইজন্য নিষেধাজ্ঞা প্রচাব কবিয়াছিলাম।"

নিমাই বলিলেন—"না সাহেব। তাহা কখনই হইতে পারে না, তাহ হইলে দেশের সমগ্র লোক ইহাব পক্ষ হইত না। আজ আমাব লোকবল দেখিয়া এবং বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমাব দলভুক্ত দেখিয়া বুঝিয়া লউন—উহা নিশ্চযই আমাব বিপক্ষপক্ষীয় লোকদিগেব প্রবঞ্চনা বাক্য। দেখুন, কত লোক এবং কত পণ্ডিত আমাব দলে আপনাব প্রসিদ্ধ কোটাল জগন্নাথ ও মাধব, সমস্ত পাশাবক অত্যাচাব ভুলিয়া—আজ আমাব দলভূক্ত হইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান ও বিবেচক, ইহাতেও কি বলিতে চান যে—হবি-সংকীর্ত্তনে দেশেব অমঙ্গল হইতেছে?"

কাজী দেখিলেন—জগাই-মাধাই ঘোর পাষণ্ড ছিল, অহোরাত্র মদ্য পানে বিভোব থাকিত এবং সকল প্রকাব দুষ্কর্ম্মই করিত, তাহারা যে ইহজন্মে কখনও মনুষ্যত্ব লাভ কবিবে—তাহা স্বপ্নেবও অগোচব ছিল। কিন্তু সেই পাষণ্ডদ্বয় যখন নামেব গুণে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে, তখন হরিনাম নিশ্চয়ই জীবেব মঙ্গল-নিদান। ইহাব প্রচাবে নিষেধ কবা নিশ্চয়ই অন্যায়। গৌরাঙ্গদেব কাজীর প্রতি কটাক্ষ করিলেন, কাজীব নয়নে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন—চাঁদ খাঁ যেন নবজীবন লাভ কবিলেন। তিনি বলিলেন—"পণ্ডিত। তুমি আমার পরম বন্ধু নীলাম্বর চাচার দৌহিত্র; তাহা হইলে আমি তোমার নানা হইলাম। বাবা! আমার যদি কোন কসুর হ'য়ে থাকে, তাহা হইলে তুমি কিছু মনে ক'র না।" কাজী একেবারে গলিয়া গিয়া স্পষ্ট বলিলেন—"নিমাই!

রাজ আমি তোমাকে যেন মানুষ দেখিতেছি না, তোমার ভিতর কোনও দেবশক্তির সমাবেশ দেখিতেছি। অতএব আমায় ক্ষমা কর, তুমি কি চাও বল?"

নিমাই বলিলেন—"রাজার কাছে দরিদ্র আর কি চায়—ভিক্ষা!"

কাজী বলিলেন—"তোমার মত ধার্ম্মিক-ভিক্ষুককে কি ভিক্ষা দিব, আমার কি আছে? তাহার উপর আমি যবন-জাতি!"

নিমাই বলিলেন—"রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁহার জাতিত্ব নাই। আপনি দেশের শাসনকর্ত্তা—আপনার ক্ষমতা অসীম; আপনি এই ভিক্ষা দিন—যেন আপনি বা আপনার কোন লোক আমাদের কীর্ত্তনে কোনও বিঘ্ন-বাধা প্রদান না করে।"

পণ্ডিতের কমনীয় কান্তি, তাঁহার সুমধুর আলাপ-আপ্যায়ন এবং ততোধিক তাঁহার কটাক্ষ—চাঁদ খাঁকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"পণ্ডিত! অতঃপর আমি বা আমার কোন লোক তোমার সংকীর্ত্তনের কোন অনিষ্ট করিবে না, সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" তারপর যবন-হরিদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হরিদাস! তুমিই ধন্য। জীবনের তুচ্ছ আশা-ভরসা সকল পরিত্যাগ করিয়া তুমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, মানুষের তাহা অপেক্ষা মহৎ ব্রত আর কিছুই নাই। আমি আজ তোমাদের সহিত নিমাই পণ্ডিতের মত মহাপুরুষকে ভবনে পাইয়া ধন্য হইলাম।"

কাজীসাহেব হৃষ্টচিত্তে নিমাই পণ্ডিতের সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কাজীর দর্প চূর্ণ হইল, অবশেষে কাজীসাহেব নিমাইয়ের প্রতি অশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিলেন দেখিয়া, বৈষ্ণবগণ

নিমাই পণ্ডিতের জয়ধ্বনি সহকারে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন।

কাজীসাহেবও হরিনাম সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া, মহাপ্রভুর সম্মান রক্ষার জন্য কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিলেন। হরিনামের এমনি মন-মাতান প্রাণ-জুড়ান শক্তি যে, বিধর্ম্মী চাঁদ খাঁও কিছুক্ষণের জন্য সেই শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া নেত্রনীর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তারপর সকলের নিকট অতি বিনয়ের সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। চাঁদ খাঁ সেই হইতে এক প্রকার হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া ছিলেন; হরিনাম শুনিলে তাঁহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বহির্গত হইত। এখনও নবদ্বীপে চাঁদ খাঁর কবরে, ভক্ত বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ, মৃত-শাসনকর্ত্তার সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

আজকাল ধর্ম্ম-প্রচারকগণ কত উপদেশ দেন—কত কথা বলেন, কিন্তু শ্রোতার কর্ণে সে কথা বা উপদেশ অতি অল্পক্ষণও স্থান পায় কি না সন্দেহ। কিন্তু নবদ্বীপে নিমাইচাঁদের এমন শক্তি ছিল যে, তিনি মুহূর্ত্তে একটী মাত্র ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত করিতে পারিতেন, হরিনাম-মহামন্ত্র বলে মহা পাষণ্ডকেও নত করিয়া, তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন করাইয়া লইতে পারিতেন। যেমন বাজীকর মায়ায় মুগ্ধ করিয়া, কত প্রকার খেলায় মানুষকে বশীভূত করে—সেইরূপ মহাপ্রভু লীলামত্ত হইয়া এক একবার হরিনামের আবেশভরা নৃত্যে যে কত শত পাষণ্ডকে এককালে বশীভূত করিতেন, তাহার স্থিরতা করা দুঃসাধ্য।

মানবকে বশীভূত করিয়া লীলা প্রচার করিতে হইলে, দৈবশক্তির

প্রয়োজন, নতুবা কেবল বিদ্যা-বুদ্ধিতে কাজ হয় না। নবদ্বীপের ন্যায় মুসলমান সুরক্ষিত নগরে, বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপের মত প্রবল ক্ষেত্রে নিমাই যে এত প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন— কেবল ঐশীশক্তির পূর্ণত্বই তাহার একমাত্র কারণ। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে যে ভগবানের অবতার বলিয়া ভক্তগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহার এই সকল অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সে বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকে না। তাঁহার পদার্পণে নদীয়া পবিত্র এবং নবদ্বীপ যে তীর্থ হইয়াছিল—তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে।

———

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রূপ-সনাতন।

কাজীসাহেব নিমাইয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে যথেচ্ছা হরিনাম করিতে হুকুম দিলেন এবং বলিলেন--"তিনি কিম্বা তাঁহার কোন অনুচর আর কখন তোমাদিগকে হরিনাম কবিতে বাধা দিবে না, বরং এ কার্য্যে তোমাদের সহায়তা করিবে।" কাজীও নিমাই পণ্ডিতের প্রেমেব আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া, সময়ে সময়ে মধুব হরিনাম উচ্চারণ করিতেন।

নিমাইয়ের এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কবিয়া এবং সদাসর্ব্বদা তাঁহাকে ভাবাবিষ্ট চিত্তে কালযাপন করিতে দেখিয়া, সকলে ভগবান ভাবে তাঁহার পাদপদ্মে নত হইয়া পড়িল। শচীব নিমাই এখন একপ্রকার উন্মাদ—হরিপ্রেমে মাতোযাবা। ভক্তভাব হইলে প্রভু এইরূপ আবিষ্ট চিত্তে থাকেন, ঈশ্বরে কিরূপ ভাবে তন্ময় হইতে হয়, ভক্তকে তাহা দেখাইয়া দেন। আর যখন ভগবদ্ভাব হয়—তখন তিনি সকলকে "নিজেই ঈশ্বব, নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণ" এই ভাব দেখান, শ্রীমন্দিরে বিগ্রহমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিয়া, তাহার স্থলে আপনি উপবিষ্ট থাকিয়া ভক্তকে অভয় প্রদান করেন। নিমাইয়ের নানাভাব—কখন রাধাভাব, কখন বলরামভাবও হইয়া থাকে।

ভগবান জীবোদ্ধারের জন্য নদীয়ায় অবতার হইয়াছেন। শচীদেবীর

নিমাইচাঁদই শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি অপরাপর যুগের মত অবতার হইয়াছেন বুঝিয়া, চারিদিক হইতে ভক্তগণ নবদ্বীপে সমবেত হইল এবং প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিল—নদীয়া হরিনাম-স্রোতে ভাসিয়া গেল। নিমাইয়ের কিন্তু তাহাতেও সাধ মিটিল না, তিনি সমগ্র দেশকে হরিনামে বিভোর করিতে—নামামৃত পানে সঞ্জীবনী-শক্তি দান করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, সমস্ত গৌড় নগর ঘুরিয়া প্রেম বিলাইবার ইচ্ছা তাঁহার বলবতী হইল।

নিমাই পাগলের পারা দিশাহারা হইয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিলেন, ভক্তগণ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই—নিদ্রা-তন্দ্রা তিরোহিত হইয়াছে; নামসুধা পানে জীবনের সমস্ত বষাদ-অবসাদ ঘুচিয়া গিয়াছে—তাই সকলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া, প্রমের পাগল গোরাচাঁদের অনুগমন করতঃ জীবন সার্থক করিতেছে।

তখন সমগ্র গৌড়নগরের নবাবত্ব লাভ করিয়া হোসেন সাহ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার নামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই কম্পান্বিত কলেবর। প্রেমবিহ্বল নিমাই পণ্ডিত কাহারও দর্প রাখেন না—কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। তাই আজ নবদ্বীপের কাজী চাঁদখাঁর মত হোসেন সাহকেও দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতে চলিয়াছেন। চাঁদখার প্রবল কোটাল, পশুভাবাপন্ন জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া, প্রভু এখন কাহার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? একজন বিজাতীয় নরপতিকে ধর্ম্মশিক্ষা দানে উদ্ধার করিবার জন্য—তাঁহার এত প্রয়াস, এত আকাঙ্ক্ষা, এত অনুরাগ!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মুসলমান রাজত্বের যাবতীয় কর্তৃত্ব-ভার হিন্দুগণের

উপবন্ত ন্যস্ত থাকিত ; রাজ্যের বড় বড পদে হিন্দুগণই নিযুক্ত হইতেন। হিন্দুগণ যে সকল কার্য্যেব উপযুক্ত এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধাসম্পন্ন— মুসলমান নরপতিগণ তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেন। তাই গৌড়েব মুসলমান বাজা হোসেন সাহেব অধীনে সন্তোষনাথ ও অমরনাথ নামে দুইজন দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ, প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাবা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হোসেন সাহ তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রীত্ব প্রদান কবেন।

বাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া, দুই ভ্রাতায নানাবিধ অসৎ উপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন কবিতে লাগিলেন। ইহারা যেরূপ কুকর্ম্ম কবিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সৎকর্ম্মেও তাঁহাদেব ধন সেইরূপ পরিমাণে ব্যয়িত হইত। নদীয়ার দুঃস্থ পণ্ডিতগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতে ইহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। নিমাই ইহাদেব মনোগত ইচ্ছা বুঝিতে পাবিয়া, উদ্ধাব সাধনে যত্নবান হইলেন। ইহাদের পিতা কুমারদেব ও জননী রেবতীদেবী পুত্রদ্বয়ের মঙ্গল কামনায় সতত ঈশ্বর স্থানে এই প্রার্থনা করিতেন যে, তাঁহাদের হৃদয়ে যেন ভগবদ্ভক্তির প্রাচুর্য্য সম্পাদন হয়, এইজন্য সকল দেব-দেবীব নিকট তাঁহারা কায়মনে মানসিক করিতেন। পিতামাতার কাতর প্রার্থনায় জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষনাথ ক্রমশঃ ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল ; কিন্তু অমরনাথ বিদ্যাবুদ্ধির অল্পতা হেতু এবং নানা প্রলোভনে পড়িয়া অধর্ম্মের পথে পরিচালিত হইতে লাগিল দেখিয়া, ধার্ম্মিক পিতামাতা জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত কনিষ্ঠকে গৌড নগবে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। অল্পায়াসেই এই ব্রাহ্মণ পুত্রদ্বয় গৌড়ে আসিয়া দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধী লাভ করতঃ,

হোসেন সাহের মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তীক্ষবুদ্ধি প্রভাবে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যও তাঁহাদের নিকট কঠিন বলিয়া বোধ হইল না এবং রাজাও তাঁহাদের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

যাহার যত বিষয়-বৈভব, তাহার ভাবনা-চিন্তা তত বেশী। নিমাই যেদিন সদলবলে হোসেন সাহের রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন—লক্ষ লক্ষ লোক যখন তাঁহার সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে দিক-দেশ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল—তখন হোসেন সাহ সেই বিষম কলরব শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন। মনে করিলেন—বুঝি কোন শত্রু তাহার পুরী আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি মন্ত্রীদ্বয়কে ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। দরিব ও সাকর বাহিরে আসিয়া প্রভুর সেই ভুবনভুলান রূপে মোহিত হইয়া গেলেন। দরিব একেবারে বিমোহিত হইয়া প্রভুর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; সাকর নত হইলেন বটে, কিন্তু দরিবের মত বিগলিত হইলেন না। নিমাই ইহাদের দুই ভাইকে রূপ-সনাতন নাম দিয়া, রূপকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলে রূপ সেইদিনই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন। এত বড় একটা মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে—এত বিত্ত-বিভব, অতুল সম্মানের এরূপ মোহজাল কাটিতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। যাহার বিবেক-বহ্নির উদয় হয়—সংসারের মায়া-মোহ অতিক্রম করিতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হয় না।

সনাতনের প্রাণ এখনও ঠিক হয় নাই; মন এখনও সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্তরূপে গঠিত হয় নাই, কাজেই তিনি আরও কিছুকাল মুসলমান

পত্রখানি প্রদান করিলেন। সাকর মল্লিক শ্লোকের পদ পূরণ করিয়া যাহা পাঠ করিলেন তাহা এইরূপ ঃ—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্ব মনঃ স্থিরং
নশ্বরং জগদিদমবধারয়॥"

এইজন্য শাস্ত্র বলেন যে—"পণ্ডিত শত্রু হইলেও ভয়ের তত কারণ নাই, কারণ, সামান্য কোনও সূত্রে একদিন না একদিন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে তিনি শত্রুতা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন।"

সত্য সত্য তাহাই হইল। সাকর মল্লিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সদুপদেশ পাইয়া নিজের দুর্বৃত্ততার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই ত, যে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলীর সংখ্যা ছাপান্ন কোটী এবং যাহারা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী এখন কোথায়? যে রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রবল প্রতাপে রক্ষকুলপতি রাবণ সবংশে নিধন হইল—সেই রামের রাজ্য অযোধ্যাই বা কোথায়? অতএব জগতের সকলই নশ্বর। কিন্তু হায়! আমি এ কি করিতেছি? সনাতনের চিত্ত স্থির হইলে—অহমিকার অপগমে চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি বিশেষ সন্তপ্তচিত্তে ব্রাহ্মণের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে স্ববাসে থাকবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

সেইদিন হইতে সনাতনের ভাবান্তর হইল। ভগবান কখন্ কাহাকে কোন্ দিক দিয়া উদ্ধার করেন—কি গুপ্ত সূত্র টানিয়া জীবের জীবনের

পথ মুক্ত করিয়া দেন—তাহা তিনিই জানেন। সনাতন ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সুস্থির হইলেন; জগতের সমস্ত যে নশ্বর, জীবনও যে ক্ষণস্থায়ী—এই চিন্তা করিয়া তিনি দাদার মত সংসার ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পারত্রিক উন্নতির জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। রাজকার্য্য আর তাহার ভাল লাগিল না, তিনি অনবরত রাজবাটীতে অনুপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে কয়েকবার সাবধান করিয়া দিলেন; কিন্তু সনাতন রাজার কথা গ্রাহ্য করিলেন না, গৃহে বসিয়া কেবল ধর্ম্ম-চর্চ্চায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সনাতনের এইরূপ অবহেলা দেখিয়া, হোসেন সাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সনাতন নিরুপায় হইয়া কারাধ্যক্ষকে বহু অর্থ উৎকোচ প্রদান করতঃ কারামুক্ত হইয়া একেবারে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। সনাতনের চিত্তবিকার দূরীভূত হইয়াছে এবং সংসারাসক্তি মিটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া—দীনের দয়াল প্রভু নিমাই তাঁহাকে হরিনাম-মহামন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। সনাতন পরমগুরু নিমাইয়ের অপূর্ব্ব শক্তিবলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং পূজনীয় অগ্রজের সহিত ধর্ম্ম-চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। হোসেন সাহ প্রভুর অমিত প্রভাব দেখিয়া অবশেষে তাঁহার নিকট নত হইয়া পড়িলেন। জীবের উদ্ধার সাধন জন্য হরিনাম প্রচার, পাষণ্ড নাস্তিকগণকে আস্তিক করিয়া তাহাদের জীবনের অন্ধকারময় পথ হরিনামের প্রেমালোকে উজ্জলীকৃত করিয়া, মুক্তির পথ দেখাইয়া দেওয়াই—শ্রীগৌরাঙ্গ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আচণ্ডালে প্রেম দান করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার করতঃ

বঙ্গদেশে প্রেম-ধর্ম্মের প্রবল বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিতে লাগিলেন। যেখানে অত্যাচার, যেখানে উৎপীড়ন—যেখানে কলহ-বিবাদ—নিমাই সেইখানে গমন করতঃ প্রবল শক্তিপ্রভাবে তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া—প্রেমসূত্রে গাথিয়া দিতে লাগিলেন। সকলেই এক প্রাণ, এক আত্মা হইয়া হরিনামে মত্ত হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে দেশে এক নব-জাগরণের সূত্রপাত হইল। এমন মধুর নাম কেহ কখনও শুনে নাই—কেহ কখনও বলে নাই, হইাতে যে এত মধু—এত প্রেম—এত শান্তি বিরাজিত, তাহা পূর্ব্বে কেহ অনুভব করে নাই। হরিনাম ত অনেকেই করিয়া থাকে, কিন্তু নিমাই-নিতাইয়ের মুখে এ নামে যে সুধা ক্ষরণ হয়, তাহা আর কাহারও মুখে হয় না।

দেশ যখন হরিপ্রেমে এইরূপ ডগমগ এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যখন বাঙ্গালা দেশকে এইরূপে ছাইয়া ফেলিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন নাম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহারা হইতে লাগিল—তখন প্রভু নিমাইচাঁদ শ্রীবাস, অদ্বৈত্য এবং নিতাই প্রভৃতির উপর কার্য্যভার দিয়া দেশত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। প্রাণ আর এত ছোট বন্ধনের মধ্যে বাঁধা থাকিতে চায় না, তাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভুর দেশে দেশে নাম প্রচারের ইচ্ছা বলবতী হইল। কিন্তু তিনি একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অলৌকিক ঘটনা।

ভাবোন্মাদ নিমাইয়ের অবস্থা কেহ বুঝিতে পারে না। অহরহঃ হরিনামে বিভোর, আবার কখন রাধাভাব হইয়া "কৃষ্ণ কোথা—কৃষ্ণ কোথা" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। ভক্তগণ প্রভুকে একদণ্ড কাছ ছাড়া করেন না আর প্রভুও ভক্তগণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। প্রভু প্রায়ই শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন করেন।

শ্রীবাসের একটী পুত্র অত্যন্ত পীড়িত ছিল। একদিন প্রভু ভাবোন্মাদ হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন—ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এমন সময় শ্রীবাস গৃহে গিয়া দেখিলেন, পুত্রের অন্তিম কাল উপস্থিত। তিনি পুত্রকে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই পুত্রটী ইহলোক ত্যাগ করিল। রমণীগণ চিৎকার করিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু পাছে বাহিরে প্রভুর কীর্ত্তনে কোনও ব্যাঘাত হয়, এইজন্য তিনি মিনতি করিয়া সকলকে চুপ করাইলেন।

শ্রীবাসের পুত্র-বিয়োগ বার্ত্তা বেশীক্ষণ অপ্রকাশ রহিল না। ভক্তগণ শুনিলেন, ম্রিয়মান হইয়া মনে করিতে লাগিলেন—যেখানে ভগবান স্বয়ং লীলারত, সেখানে এইরূপ ভাবে জীবের জীবন নষ্ট হয়—ভক্ত পিতা এইরূপে মনোকষ্ট পায়? সকলের মনে দারুণ দুঃখের সহিত সন্দেহ উপস্থিত হইল। শ্রীবাসের কিন্তু তাহা হয় নাই, পুত্র-বিয়োগে তিনি

একটুও বিচলিত না হইয়া, প্রভুর সঙ্গে নৃত্যানন্দে যোগদান করিলেন। কি মায়া মোহের অতীত অবস্থা। এইমাত্র যাব উপযুক্ত পুত্র-বিয়োগ হইয়াছে, সে কোন প্রাণে আসিয়া আনন্দ মগ্ন হইল? সাধারণ মানব আমরা, তাই বুঝি যে পুত্রশোকে আনন্দানুভব অসম্ভব; কিন্তু যাঁহাবা আত্মানন্দে বিভোর—সংসারের নশ্বরত্ব যাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ আনন্দ—এরূপ সুখানুভব অসম্ভব নহে। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, ভাবের ঘোরে যাঁহাদেব জীবন বিঘূর্ণীত হইতেছে, তাঁহারা ইহকালকে স্বপ্ন বলিয়াই অনুভব করেন। পরকালই তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বস্ব, পরকালের চিন্তাই তাঁহাদেব মহা চিন্তা। মৃত্যু তাঁহাদের দুঃখের নহে, যৌবন-জরার ন্যায় অবস্থা পরিবর্ত্তন, তাঁহাদের নিকট মহা সুখের সুখ-সম্মীলন। তাই শ্রীবাস নিরানন্দ না হইয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন। যখন আনন্দময় মহাপ্রভু তাঁহাব আঙ্গিনায় আনন্দবত, তখন তাঁহাব গৃহে নিবানন্দ কি কখন সম্ভব।

মরি মরি। শ্রীবাসের মত ভক্ত কয় জন আছে? বাটীর মধ্য হইতে করুণ ক্রন্দন শুনিয়া, ভক্তগণ একে একে অস্থিব হইয়া নৃত্যে বিরত হইতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গেরও ভাব বিপর্য্যয় হইল, প্রাণ যেন তাঁহার কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। অন্তর্যামী প্রভু শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন—"শ্রীপাদ! তোমাব বাটীতে কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?"

শ্রীবাস বলিলেন—"অসম্ভব কথা প্রভু! যেখানে তুমি স্বয়ং উপস্থিত, সেখানে কি কোন দুর্ঘটনা হইতে পারে?"

শ্রীগৌরাঙ্গের বিশ্বাস হইল না, তিনি ভক্তগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন। তাহারা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"হাঁ প্রভু! পণ্ডিতের পুত্র ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছে।"

নিমাই পণ্ডিতের করুণ অন্তঃকরণ দ্রব হইল। প্রিয় ভক্ত শ্রীবাসের দুঃখে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীবাস সকলকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"তোমরা কি করিলে, আমি পুত্রশোক অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু মহাপ্রভুর অশ্রুজল আমার পক্ষে অসহ্য। প্রভু! আপনি স্থির হউন, পুত্র গিয়াছে তাহাতে আর হইয়াছে কি? ঠাকুর, আমি ভুবন-মোহন চিদঘন আনন্দময় মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন কখনও দেখিতে পারিব না, আপনি যেরূপ ছিলেন—সেই ভাব ধারণ করুন।"

নিমাই শ্রীবাসের হৃদয়-নিহীত গভীরতম ভক্তিভাব—তাঁহার মায়া-মোহের অতীত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, বিভোর চিত্তে বলিলেন—"মৃতের দেহ বাহিরে আনয়ন কর।"

অনুমতি পাইয়া সকলে শ্রীবাস-পুত্রের মৃতদেহ প্রভুর নিকটে আনয়ন করিল। সেই সুন্দর সুললিত দেহ দেখিয়া নিমাই বলিলেন—"কে বলিল বালক মারা গিয়াছে? মরি মরি, এ দেহ কি মৃতের হইতে পারে? তাহা হইলে যে কত বিবর্ণ হইয়া যাইত, এ যে জীবিত।" এই বলিয়া শচীর দুলাল আনন্দময় মূর্ত্তিতে নিকটে গমন করতঃ সেই ভক্ত শিশুকে আনন্দ-আবরণে আবরিত করিয়া বলিলেন—"বৎস! কিসের নিমিত্ত তোমার এ শয়ন? উঠ—জাগরিত হও।"

শব তৎক্ষণাৎ নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রভুর কথার উত্তর দান করিল। বলিল—"প্রভু! এ জগতে আমার সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কাজেই এস্থান আমার আর ভাল লাগিতেছে না। আমি নবজীবনে

নূতন স্থানে যাইতেছি; আপনি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করুন।" এই বলিয়া শব হরি হবি ধ্বনি করিয়া আবার নীরব হইল। এইবাব তাহার শরীর মৃতের ন্যায় বিবর্ণ, জ্যোতিঃহীন হইল, দেহী দেহ-গেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শিশুর মুখের কথা শুনিয়া সকলে বুঝিল যে, তাহাব আয়ূ শেষ হইয়াছে; ইহজীবনের কার্য্য তাহার ফুরাইয়াছে, তাই তাহার মহা-প্রস্থানের সময় উপস্থিত। পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন শোক দুঃখ হইতে বিরত হইলেন। সকলে শ্রীগৌরাঙ্গের অভয় পদে আত্মসমর্পণ করিয়া মৃতের সৎকার করতঃ উচ্চরোলে হরিধ্বনি করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

শ্রীবাসের পুত্র পরলোক গমন কবিলে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাবপর বলিলেন—"নদীয়াব অল্পবয়স্ক বালক পর্য্যন্ত যখন শ্রীহরির নাম-মাহাত্ম্য এরূপ ভাবে বুঝিয়াছে, তখন আর নদীয়ায় কালক্ষেপ করা উচিত নয়, অন্য স্থানে ইহাব প্রচার করিতে হইবে। একস্থানে বসিয়া সময় নষ্ট করিলে কি হইবে, সময় ত কাহার হাত ধরা নয়। প্রভু সেদিন সকলকে আনন্দ দান করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

——:০:——

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতা-পুত্রে।

নিমাই পূর্ব্বে আসক্তির বশে সংসারের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। বিদ্যা উপার্জ্জন, ধন উপার্জ্জন প্রভৃতির জন্য টোল স্থাপন করিয়া এখন একেবারে নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জীবের দুঃখ দেখিয়া তিনি আর সংসার করিতে পারিতেছেন না। তাই সংসার ত্যাগের সংকল্প এখন তাঁহার মনোমধ্যে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়াছে। সংসারে এরূপ ভাবে আবদ্ধ থাকিলে সকলে তাঁহাকে ভেকধারী বলিবে; বুঝি অর্থ উপার্জ্জনে—সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যই নিমাই এরূপ কপটতাচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং লোকের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য, সাধারণ জনগণকে শিক্ষা দিবার জন্য—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে না ঘুরিলে, ধর্ম্মপ্রচার হইবে না—বৈষ্ণব-ধর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তিও বাড়িবে না।

ভক্তগণের নিকট নিমাই আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন; সকলে শুনিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইল; যাহারা ভক্তিমার্গের চরমে উঠিয়াছিল, তাহারা বুঝিল—বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিবার জন্যই প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ। সংসার মদে মত্ত হইয়া কেবল নাম প্রচার করিলে, লোকে তাঁহাকে ত্যাগী বলিবে না—তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে না। অতএব জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য গৃহ-ত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রভু এইজন্য নবদ্বীপ

অন্ধকার কবিয়া, নানাস্থানে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার কবিতে—ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

নিমাইয়ের গৃহ-ত্যাগ সঙ্কল্প আর অপ্রকাশ রহিল না। ক্রমে ক্রমে শচীদেবীব কর্ণেও একথা প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—একদিন একটী সন্ন্যাসী আসিয়াছিল, নিমাই তাহাকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়াছিল; তবে কি তাঁহারই প্রবোচনায় নিমাই এই কাজ কবিতে যাইতেছে? নিমাই যেদিন হইতে ভাবে বিভোর হইতেছে—হবিনামে মত্ত হইয়া সময়ে স্নানাহার করিতে ভুলিয়া যাইতেছে, অমন সোণাব বধূমাতাকে যখন অগ্রাহ্য করিতেছে—তখন নিশ্চয়ই যে সে মনে মনে আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য একটা সংকল্প পাকাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

পাছে বাছা আমার সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়, পাছে গৃহত্যাগ করে ভাবিয়া আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলাম। অমন পরমা সুন্দরী, কার্য্যকুশলা, পতিভক্তিপরায়ণা বধূ ঘবে আনিলাম, ভাবিলাম—নিমাই এইবার ভাল করিয়া সংসারী হইবে, সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখিবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি হিতে বিপবীত হইল। সে আর বধূমাতার প্রতি ফিরিয়াও চায় না, গৃহে শয়ন কালে কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। বধূমাতা তাহা শুনিয়া মুখে কিছু না বলুন—মর্ম্মদুঃখে দহিয়া মরেন। স্বামীর চিন্তা করিয়া তাঁহার দেহ আধখানি হইয়া গিয়াছে, তাই সুস্থ হইতে দিন কয়েকের জন্য পিতৃগৃহে পাঠাইয়াছি; তাই কি সে সেখানে থাকিতে চায়! কিন্তু আজ আবার এ কি শুনি—তাহা হইলে যে ঘোর সর্ব্বনাশ।

নিমাই আহারের পর আবেগ ভরে বসিয়া আছেন—এখনও কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। শচীদেবী পুত্রের ভাব দেখিয়া এবং লোকমুখে তাহার মর্ম্মান্তিক প্রতিজ্ঞা শুনিয়া একেবারে হতাশ হইয়াছেন। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই ত তিনি চিন্তা-জ্বরে জর জর হইয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যসত্য কি তাঁহার সোণার গৌর গৃহত্যাগ করিয়া, সেই জ্বরে বিকার আনিবে? শচীদেবী পুত্রের নিকটে আসিয়া বসিলেন। স্নেহের ছাওয়ালের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহময় গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ নিমাই! লোকের মুখে কি কথা শুন্‌তে পাচ্ছি বাবা, কথা কি সত্যি?"

নিমাই চমকিত হইলেন। জননীর ভাব দেখিয়া—তাঁহার জীর্ণ শীর্ণ বিষাদক্লিষ্ট বদন দেখিয়া, সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না, নীরবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন।

শচীদেবী বলিলেন—"কোন কথা কহিতেছ না যে? আমার দিব্য, কথাটী সত্য কি না বল?"

নিমাই এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; সর্ব্বনাশ হয় হউক, তথাপি সংসার ত্যাগ করিয়া জীবে হরিনাম দান করিবেন। তিনি বিচলিত না হইয়া বলিলেন"—মা! পিতামাতার ঋণ জীবনে শোধ হয় না, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় জননীর ঋণ, আমার মত অকৃতী-সন্তান কখনও শোধ করিতে পারিবে না। মা! তুমি কিছু মনে করিও না, প্রাণ আর আমার সংসারে মত্ত হইতে চায় না; সর্ব্বদাই যেন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আকুল হইয়া উঠিতেছে। পুত্রের মঙ্গল মাতার প্রার্থনীয়; মা, তুমি আমাকে অকপটে বিদায় দাও, আমি সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে কোন্ গর্ভধারিণী জননী প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারে? নিমাইয়ের নির্ঘাত বচন শুনিয়া, শচীদেবী পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। কোমল প্রাণ নিমাইয়ের মুখে আজ এই মর্ম্মঘাতী প্রার্থনা শুনিয়া শচীদেবী মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বলিলেন—"হাঁরে নিমাই। এই কি উচিত—এই কি তোমার মাতৃভক্তি?" শচীদেবী বেশী কাতরতা প্রকাশ করিলেন না, পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমার সংসারে দুইটী মাত্র প্রাণী, আমার অদৃষ্টে ত সুখ নাই দেখিতেছি। কিন্তু আনন্দ-প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া, সৌভাগ্যবতী ধনী-তনয়া হইয়াও যে তোমার মুখ চাহিয়া এই পর্ণকুটীরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উপায় কি হইবে? সে একথা শুনিলে কি করিবে—একবার ভাবিয়াছ কি?"

নিমাই আবার মস্তক অবনত করিলেন। অনিন্দ্যসুন্দরী পত্নীর সেই অনুপম ভক্তি-শ্রদ্ধা—তাঁহার সেই অতুলনীয় কমনীয়তার কথা মনে পড়িয়া, নিমাইকে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ করিয়া রাখিল। তাহার পর সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া বলিলেন—"মা। যখন তোমার জন্য ভাবনা হইল না, তখন তাহার জন্য এত ভাবনা কিসের? আমি কোনরূপ চরিত্র-দোষে দোষী হইয়া তাহার প্রতি বিরূপ হইতেছি না। আমার জীবনান্ত হইলে তাহার গভীর দুঃখের কারণ হইত; কিন্তু আমি জীবিত থাকিয়া দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিব—সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, ইহাতে তাহার ত মুখোজ্জ্বলই হইবে? আর সে আমার হইয়া তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইবে। ইহাতে তাহার ত তত দুঃখের কারণ দেখি না?"

শচীদেবী পুত্রের এ সকল কথায় মনে শান্তি অনুভব করিতে

পারিতেছেন না। তিনি দুঃখিত স্বরে বলিলেন—"বাবা! সকলে তোকে ধার্ম্মিক বলে; জানি তোর হৃদয় অতি কোমল এবং জীবের প্রতি তোর খুব দয়া। কেবল আমার প্রতি—বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি, আর নদের ভক্তদেব প্রতি তোর কিছুমাত্র দয়া নেই।" এই বলিয়া শচীদেবী অঞ্চলে নয়নজল মোচন করিলেন।

নিমাইয়ের প্রাণ কোমলতাময়, জননীর দুঃখ দেখিয়া বলিলেন—'মা। তুমি যদি ঐরূপ দুঃখ কর, প্রাণ খুলিয়া বিদায় না দাও, তাহা হইলে আমার সংকল্প ব্যর্থ হইবে এবং জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য গৃহত্যাগও করিতে পারিব না। মা! জীবের দুঃখ মোচন এবং জীব-সেবায়ই মানব-ধর্ম্ম। যে সন্তান এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহার জনক-জননী ধন্য—তাহাদের কুল পবিত্র। তুমি জানিয়া শুনিযাও যদি তাহাতে দুঃখ কর, তাহা হইলে আমাকে সামান্য জীবের মত গৃহে আবদ্ধ হইয়া কেবল পশু-জীবন বহন করিতে হইবে। মানুষের পুত্র পশু হয়, ধর্ম্ম-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়—ইহা কি তোমার মত জননীর অভিপ্রেত?"

শচীদেবী পুত্রের মর্ম্মঘাতী যুক্তিতে পরাস্ত হইলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া অনুমতি দিতে সাহস করিলেন না।

ক্রমে রাত্রি হইল। ইতিমধ্যে দুই একজন ভক্ত প্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিত্তও আজ অতি বিষণ্ণ; কিন্তু মাতা-পুত্রের ঐ ভাব দেখিয়া তাঁহারা নিজ স্থানে গমন করিলেন। মনে করিলেন, জননী পুত্রকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেছেন—এ সময় বাধা দেওয়া উচিত নয়।

অনেক দিন পরে নিমাই আজ গৃহে বাস করিতেছেন। জননী শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া, পুত্রের নিকট শয়ন করিলেন; নিমাইও

আজ জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে শেষ শয়ন করিলেন। নিমাই দারুণ চিন্তাব আবেগ-আবেশ ভাবে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন; জীবেব হাহাকার, তাহাদেব পরিত্রাহী রব যেন তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। শচীদেবী পুত্রেব পার্শ্বে নিদ্রিতা হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন—কংস-কাবাগারে শ্রীকৃষ্ণ জননী যেমন স্বপ্ন দেখিয়া বিস্ময় আবেশে বলিয়াছিলেন—"প্রভু! ওরূপ সম্বরণ কর, এযে অসম্ভব। যাঁহাব উদরে ব্রহ্মাণ্ড—যিনি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদব, দেবকী তাঁহাকে উদবে ধরিয়াছে? কমল আঁখি! এতে যে তোমাব অমান্য হইবে।" আজ শচীদেবীও সেইরূপ দেখিতেছেন, তাঁহাব পুত্র যে সামান্য নয়, ভূ-ভাব হরণেব জন্য স্বয়ং ভগবান যে তাঁহার গর্ভকোষে আশ্রয় লইয়া—আজ নিমাইরূপে লীলা বিস্তাব করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পাবিয়া শচীদেবী "নিমাই নিমাই" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া শশব্যস্তে ভীতা-চকিতা জননীকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ কবিয়া বলিলেন—কেন মা! এই যে আমি, তোমার আঁচলে আঁচলে রহিয়াছি।'

জননী স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন—"বৎস! দয়া করিয়া তুমি আমার পুত্র হইয়া জন্ম সার্থক করিয়াছ। এখন বুঝিলাম—তোমাব কার্য্য অনেক, অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিও। আমি আব তোমার কার্য্যে বাধা দিব না।" অকপটে জননীর অনুমতি পাইয়া নিমাই যারপরনাই আনন্দিত হইলেন।

প্রাতঃকাল হইলে শচীদেবী সর্ব্বানন্দমনে পুত্রের ভোগের জন্য আহারীয় প্রস্তুত করিতে গমন করিলেন। এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া

সঙ্গিনীগণের মুখে স্বামীর গৃহত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সেইদিনই পিত্রালয় হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে প্রাণ-প্রিয়ধনকে দেখিয়া একগাল হাসি হাসিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। বেহারার হুড়াহুড়ি শুনিয়া, শচীদেবী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—বধূমাতা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। অশুভ কার্য্যে প্রিয়জনের প্রাণ স্বতঃই সতর্ক হইয়া পড়ে, প্রাণে প্রাণে সে বার্ত্তা জানিতে পারে। এই গোলযোগে পতিব্রতার প্রাণ যে পতির জন্য কাতর হইবে—বিষ্ণুপ্রিয়া যে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি? তিনি বধূমাতাকে সুখালিঙ্গন করিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর পদধূলি লইলে, শচীদেবী তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া "পতিব্রতা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রতিবাসিগণ সকলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিতে আসিল, কিন্তু তাহাদের কাহারও মুখে আর সেরূপ হাস্য-কৌতুক দেখিতে পাইলেন না, গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণে সকলেই বিষণ্ণ ও মর্ম্মাহত হইয়াছে যাঁহাকে লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার এত মান—সেই যদি চলিয়া যায়, কায়া চলিয়া গেলে ছায়ার আদর কে করে বা কতক্ষণ থাকে? সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া এবং দেখা দিয়া চলিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গিনীগণের ভাব দেখিয়া, জনরব যে সত্য তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

ক্রমে আহারাদি শেষ হইল। অপরাহ্নে নিতাই, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত কথা কহিতে যেন তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে—বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না; কেবল আনমনে দাঁড়াইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রভুর মধুর ভাব দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বহুদিনের পর আসিয়া, গৃহের

মধ্যে স্বামীর শয্যা প্রস্তুত করিতেছিলেন। পরম ভক্ত নিতাই ও গদাধরকে দেখিয়া, নিমাই বাহিরে আসিতেছেন—এমন সময়ে শোক-বিহ্বলা মর্ম্মপীড়িতা জননী নিমাইকে হাত নাড়িয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন; নিতাই গদাধর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শচীদেবী বলিলেন—"তুমি যে বলিয়াছিলে, কীর্ত্তনের সময় যখনই ইচ্ছা করিবে তখনই আমার দর্শন পাইবে, ভক্তগণ কখন আমা ছাড়া হইবে না, আর আমিও কখন তাহাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না—নিমাই! এ সকল কথা যেন তোমার সত্য হয়।"

নিমাই অতি মধুর মনমোহন স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"শচীনন্দন কখন মিথ্যা কথা বলে না মা; যাহা বলিয়াছি—সবই সত্য হইবে, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিও না। আমি সময়ে সময়ে আসিয়া নবদ্বীপের ভক্তবর্গ এবং তোমার সহিত দেখা করিব, সে বিষয়ে মা তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

বিষ্ণুপ্রিয়া যদিও মাতা-পুত্রের এই সকল কথা শুনিলেন, তথাপি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন—আজ রাত্রে স্বামীর পদে ধরিয়া এ কথার সত্যতা জানিয়া লইবেন। তাই তিনি মনের সহিত শয্যা প্রস্তুত করিতেছেন; স্বামী ফুল বড় ভালবাসেন বলিয়া আজ মনের সাধে মালা গাঁথিতেছেন।

একে একে কত ভক্ত আসিতেছে, প্রভুর সহিত কথা কহিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। সকলেই যেন ম্রিয়মান—মন ভার ভার, প্রাণ যেন কি এক বিষম দুঃখের দাব-দাহে পুড়িয়া খাক্ হইতেছে—তাই কথা কহিতে পারিতেছে না, কেবল নিমাইয়ের মুখের প্রতি

চাহিয়াই কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। নিমাই সকলকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিতেছেন—"ভয় কি তোমাদের? তোমরা সকলে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর। আমি কখনই তোমাদের ভুলিয়া থাকিব না।"

—:০:—

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগ।

বহুদিনের প্রিয়সঙ্গ ছাড়িতে প্রাণ কেমন কেমন করে, হাজার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হইলেও মানব দুঃখ-অবসাদে মগ্ন হইয়া থাকে। জগত-জীবের জন্য নিমাইয়ের চিত্ত আকুল, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া প্রাণ উচাটন হইলেও—এ সুখের আবাস, এ প্রিয়সঙ্গ ছাড়িবার পূর্ব্বে তিনি যেন কিছু দুঃখভারাক্রান্ত হইয়াছেন। ভক্তগণের ছল ছল নয়ন, মাতার শোক-দগ্ধ বদন এবং প্রিয়ার অব্যক্ত দুঃখ-বেদন দেখিয়া, মহাপ্রাণ—উদার প্রকৃতি, পরদুঃখ কাতর নিমাইয়ের কোমল হৃদয় দারুণ ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আজ সমস্ত দিন গৃহে আবদ্ধ হইয়া, জননী ও পত্নীর কাছে কাছে ঘুরিতেছেন। যেন জন্মের শোধ তাঁহাদের সুখ দান করিয়া, চিরদুঃখ সাগরে ডুবাইবার জন্য—নিমাই আজ ঘর-সংসারে এক মন দিয়াছেন। ভক্তগণ আজ বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন না, যাহাতে প্রভুর মন সংসারে এইরূপ প্রকৃষ্টরূপে আসক্ত হয়—ইহাই তাহাদের ইচ্ছা।

সন্ধ্যার পর নিমাই আহারাদি করিলেন। শচীদেবী বধূমাতাকে আহারাদি করাইয়া, বহুদিনের পর আজ শেষ স্বামী-সম্মিলনে পাঠাইয়া দিয়া—নিজে অপর গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাবনা-সাগরে নিমগ্না হইলেন। নিমাই যে ভগবান, তাহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। ভগবান যে এত দিন তাঁহাকে "মা" বলিয়া ধন্য করিয়াছেন—এই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

এই ভাগ্য চিরস্থায়ী হইলে কি সুখই হইত? কিন্তু এ সৌভাগ্য কি কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে? বসুদেব-দেবকীর ঘটে নাই—নন্দ-যশোদাও সে পরম সুখে বঞ্চিত হইয়া, শেষে অজস্র রোদনে ধরাতল ভাসাইয়া, অন্তিম চিন্তায় সে জ্বালা চিরনির্ব্বাণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মা হইয়াও যখন কেহ সুখী হইতে পারেন নাই—তখন আমি কেমন করিয়া হইব? পিতামাতাকে দুঃখ দেওয়াই যে তাহার সুখ। আর এই দুঃখ পাইয়া, অনবরত "হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিলে, অন্তিমে যে তিনি পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়া উদ্ধার করেন—আমার ভাগ্যেও কি তাই হইবে। নিমাই, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার সমস্ত জীবন গেল, কিন্তু দেখিস্ বাপ! অন্তিমে যেন তোর দেখা পেয়ে, এ জীবনব্যাপী কান্নার অবসান ক'রতে পারি। অন্তর্য্যামী তুই, তোর চিরদুঃখিনী মাতার এই অনুরোধ পূর্ণ করিস্ বাপ! শচী-দেবী বিষম চিন্তায় তন্ময় হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছেন, কোন প্রকার সংজ্ঞা নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া আহারাদির পর গৃহে প্রবেশ করিয়া, আরাধ্য-পদ কোলে তুলিয়া বসিলেন। ম্রিয়মান—মুখে হাসি নাই, চক্ষু বহুদিনের পর সেই প্রাণপ্রিয় বস্তুর দর্শন পাইয়াও সুখবোধ করিতে পারিল না; শ্রুত জনরব তাঁহার প্রাণ আকুল করিয়া দিল। তিনি সেই দেবারাধ্য পদে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তাঁহার নয়নে জল দেখিয়া নিমাই বলিলেন—"তুমি কাঁদছো, কেন কি হয়েছে? এতদিনের পর দেখা হ'ল—কোথায় আনন্দ কর্ব্বে, না তুমি কাঁদছো? তোমার কান্না যে আমি কখন দেখতে পারিনা বিষ্ণুপ্রিয়া!"

বিষ্ণুপ্রিয়া শোক সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা সাগর রূপ ধারণ করিয়া যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল। আহা! স্বামী গৃহত্যাগ করিবেন—একথা শুনিলে কোন্ পতিব্রতার চিত্ত অস্থির না হয়? সতী একবার "না" বলিয়া পদযুগল আরও যতনে বক্ষে ধারণ করিলেন

"না, না হাঁ? না ব'লে যে আরও বেশী কাঁদতে লাগ্‌লে?"

"প্রভু! আমি দাসী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

"প্রিয়ে! তোমার অপরাধ কিসের? বরং আমিই তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি।"

সতী জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিলেন—"দাসীর নিকট প্রভুর অপরাধ হইতে পারে না। আমি বহুজন্মের পূণ্যফলে এই পদ সেবার অধিকার পেয়েছি; তুমি কি আমায় সে অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রবে?"

"কেন প্রিয়ে! কেন তুমি এ কথা ব'লছো?"

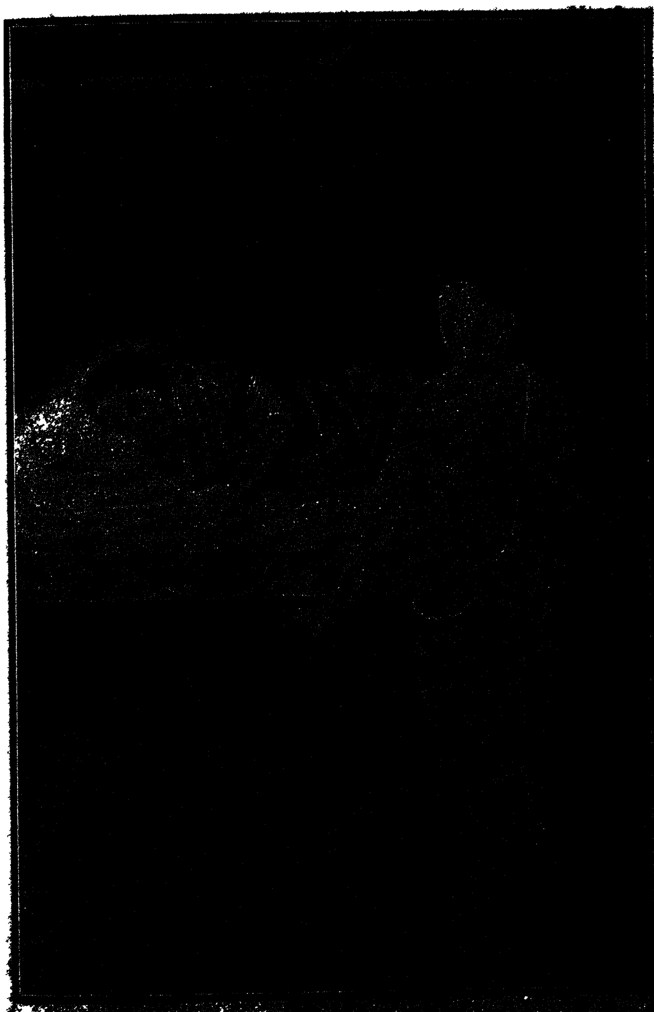
"প্রভু! আমি তোমার দাসীর উপযুক্ত নই, তথাপি দয়া ক'রে তোমার চরণ সেবার অধিকারী ক'রেছো। তুমি সকলকে সকল অধিকার দিয়ে সুখী ক'রেছ; কেবল আমার প্রতি কি বিরূপ হবে?"

"দেখ প্রিয়ে! আমি আর আমার বশীভূত নহি, যেন দিন দিন কেমন এক রকম হ'য়ে যাচ্ছি, তাই অন্যমনস্ক ভাব। সতি! তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

"প্রভু! আবার ঐ কথা কেন? তোমাকে ক্ষমা করিবার অধিকার আমার কোথায়? আমি দাসী, চিরদিন ঐ পদ সেবার অভিলাষী, আমার প্রতি সদয় হও।"

"তোমার প্রতি নির্দ্দয় ত আমি কখনই নই। তবে যদি অজানিত

গৃহত্যাগ।



উঠ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া উঠ গো ত্বরায়।
প্রাণের দয়িত তব গৃহ ছাড়ি যায়॥

কোন প্রকারে ব্যথা পেয়ে থাক, তার জন্য কেঁদ না, স্থির হও। বিষ্ণুপ্রিয়া। এত অভিমান কেন প্রেয়সি ?”

“হৃদয় সর্ব্বস্ব। তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব, মান অভিমান তোমা ছাড়া আর কার উপর ক’রবো ? সতী স্ত্রীর নিকট স্বামী শুধু বাহিরের বস্তু নয়, অন্তরের অন্তর্যামী-দেবতারূপে চির অধিষ্ঠিত। তথাপি প্রাণ চায়—সর্ব্বদা বাহ্যদৃষ্টিতে অহরহঃ ঐ রূপ দেখি, তুই একবার দেখে সাধ মিটবার নয়।”

বিষ্ণুপ্রিয়া যতই স্বামীর গৃহত্যাগের কথা প্রাণে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, ততই প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল, বলি বলি করিয়া সে হৃদয়-বিদারক কথা যেন বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি পতিপদ কোলে লইয়া, কাঁদিয়া শয্যাতল ভাসাইতে লাগিলেন।

নিমাই অভিমানিনী পত্নীর শোকাবেগ সান্ত্বনা করিবার ছলে বলিলেন —“তুমি এখনও কাঁদছো, তবে কি হাসিমুখে কথা কবে না ?”

বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে অশ্রু আর ধরিল না, অবিরল ধারে গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল। তিনি ধরা গলায়, ভরা আওয়াজে বলিলেন—“শুন্‌ছি তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে যাবে ?”

“আমি কখন কাহাকেও ছাড়ি না; কেহ একান্ত ছাড়িলেও, আমি তাহার সহিত একেবারে ছাড়াছাড়ি হই না; গুপ্তভাবে কাছে কাছে থাকিয়া তাহাকে অনবরত চক্ষে চক্ষে রাখি। তবে তুমি অমন কথা কেন বলছো বিষ্ণুপ্রিয়া ?”

“আমি অনেকের মুখে শুনে বাপের বাড়ী থেকে দৌড়ে আস্‌ছি; আমাকে কেন বঞ্চনা ক’রছো প্রভু ? আমি চিরদিন ঐ পদে দাসী হ’য়ে

থাকিবার বাসনা ক'রে—আমাব জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য তোমাতে বিসর্জ্জন দিয়েছি। এখন তুমি বিরূপ হ'লে দাসীব গতি কি হবে নাথ!"

শক্তি চঞ্চল হ'লে দেহ-মন-প্রাণ সচঞ্চল হইয়াই থাকে। নিমাই প্রণয়িণীকে অবরুদ্ধ কণ্ঠে রোদন কবিতে দেখিয়া বলিলেন—"বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রাণেশ্বরী—লক্ষ্মীস্বরূপিণী। সমস্তই কি ভুলিয়া যাইতেছ, মোহবশে এত আচ্ছন্ন কেন? আমি যে জন্ম-জন্মান্তর, যুগ-যুগান্তব তোমার অমুচ্চ প্রেম-ঋণে আবদ্ধ। তোমার প্রেম-ঋণ শুধিবাব জন্য—দাসখতেব উসুল দিবার জন্যই ত আজ আমায় এই যুগাবতাব গ্রহণ কবিতে হইয়াছে। লোকের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া প্রেম-ধন বিতরণ কবতঃ তোমার ঋণ পরিশোধ করাই ত এ অবতাবের কার্য্য। সে কার্য্য যে আরম্ভ কবিতে হইয়াছে, আর যে বিলম্ব করিতে পারি না?"

সংসার বড ভীষণ স্থান, এ স্থানের মায়ায় মুগ্ধ হইলে দেবদেবীরও চৈতন্য থাকে না; ব্রহ্মা বিষ্ণুই যখন অচৈতন্য—তখন জীবেব কথা কোন্ ছার! বিষ্ণুপ্রিয়া মোহাভিভূতা সামান্য রমণীব মত নিমাইয়ের নিগুঢ় রহস্য-তত্ত্ব তলাইয়া না বুঝিয়া বলিলেন—"তুমি সত্য সত্যই যদি সন্ন্যাসী হও, তাহ'লে আমাদের দশা কি হবে?"

নিমাই আরও ভাল কবিয়া বুঝাইবার জন্য বলিলেন—"প্রেমময়ি! আমি চিরদিনইত প্রেমেব-সন্ন্যাসী রূপে ভক্তের প্রেমাধীন হ'য়ে, প্রেমের বোঝা শিরে লয়ে সংসারে যাতায়াত করি। প্রেম বিনা আমি কিছুই ভালবাসি না, প্রেমই আমার সর্ব্বস্ব। প্রেমেই আমার জীবন—প্রেমেই আমার জাগরণ; প্রেম পেলে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তে পারি। প্রেম পেলে, যোগী-গৃহী কি বলো—আমি চণ্ডালেরও দাসত্ব কর্ত্তে স্বীকৃত হই।

প্রমিকের দেওয়া বিষও আমি অমৃত বলে ভক্ষণ কত্তে পারি, এইজন্য সকলে আমাকে হৃদ্‌বিহারী প্রেমের ছবি বলে ডাকে। প্রাণেশ্বরি! তুমি ত চিরদিন আমায় প্রেম-ডোরে বেঁধে রেখেছো, পালাবার উপায় কোথায়? একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি—কে তুমি, কে আমি।"

তবুও বিষ্ণুপ্রিয়ার মোহ টুটিল না—ভাব-বিপর্য্যয় হইল না। তবে এবার যেন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"প্রভু তুমি, দাসী আমি, যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর।" সুসময় অতিবাহিত হয় দেখিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ হস্ত-রচিত ফুলের মালাগুলি স্বামীর কমনীয় কণ্ঠে দুলাইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যেন কোন অজানা যুগস্মৃতি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল, যেন কোনও অপরিসীম বিস্ময়-বিস্মৃতির অগাধ সলিলে নিমজ্জিত মনোময় পবিত্র ভাব তাঁহার মনে উঁকী মারিতে লাগিল। তিনি যেন কতবার এইরূপ আনন্দ ফুলহার প্রিয় গলে পরাইয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিয়াছেন। প্রাণপ্রিয় এই প্রাণের বস্তু যেন তাঁহাকে কতবার ফাঁকী দিয়া, এইরূপ নাগর বেশে অন্য নাগরীর মন যোগাইয়াছেন এবং তিনিও মানভরে প্রভুত মানের দায়ে দাসখৎ লিখাইয়া লইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। আজ সেই সকল বিস্মৃত-স্মৃতি স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইলে, তিনি বিভোর হইয়া স্বামীর পদতলে লুটাইতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর মোহঘুমে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নিমাই বহুক্ষণ প্রিয়ার সেই অতুলনীয়, ত্রি-জগতের তুলনাতীত সুন্দর আনন পলকবিহীন-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তারপর তুলসী চন্দনে সে সুন্দর বরবপু সাজাইয়া, একবার প্রেমের চুম্বন দান করিয়া

জন্মের শোধ উঠিয়া বলিলেন—"এ জন্মে যা হবার হ'ল ; প্রেম-ঋণ সব পরিশোধ হ'ল না। জগজ্জীবের দুর্গতি দেখে, তোমায় ছেড়ে যেতে হ'লো, কিন্তু মনে জেনো তোমাতে আমাতে অভেদ ; বিচ্ছেদ কখন হবে না—হইবারও নয়।" ইহাই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া নিমাই হৃদয়ের বলে প্রিয়াব প্রিয়-বন্ধন তুচ্ছ করিয়া বাহিবে আসিলেন। বিশ্বপ্রেমিক সিদ্ধার্থ যেমন সপ্তপ্রসূতা গোপাব প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন কবিয়া, বিপুল বাজৈশ্বর্য্যের ভোগ-লালসায় জলাঞ্জলি দিযা, পিতামাতাব স্নেহপাশ ছেদন কবিয়া—জীবেব জরামৃত্যু-ভয় নাশের জন্য, জীবকে অহিংসা পরমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া মুক্তি-পথেব পথিক করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিযাছিলেন—আজ প্রেমাবতার নিমাই—ভক্তিতে গদগদচিত্ত নদেব নিমাই—শচী-জগন্নাথেব আনন্দবর্দ্ধন, সতী-শিবোমণি বিষ্ণুপ্রিয়াব প্রাণধন গৌরাঙ্গ সুন্দব, নবদ্বীপের অকলঙ্ক জ্যোতিস্ক ভাস্বব বিশ্বম্ভব—প্রিযাব প্রেমালিঙ্গন ছিন্ন কবিয়া, মাতার অমিয়মধুব স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মীয স্বজনেব বিবহদীর্ণ হৃদয়ে শোকশেল হানিযা—প্রেমময হবিনাম বিতরণে জীবেব মুক্তিপথ প্রশস্থ কবিবাব জন্য, অনন্ত পৃথিবীব অনন্ত আকাশতলে প্রেমমুগ্ধ হইয়া, ভিখাবীর বেশে লোকেব দ্বাবে দ্বাবে অধম-তাবণ হবিনাম বিলাইবাব জন্য গৃহত্যাগ কবিলেন। এত বাধা, এত বিঘ্ন, এত হাহুতাশ—তাঁহাকে বাঁধিয়া বাখিবার জন্য এত চেষ্টা—কিছুই নিমাইকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পাবিল না। যথার্থ ত্যাগ মানুষকে এইরূপই দিশাহারা—পাগল পারা কবিয়া তুলে। বিশ্বহিতে যাহার হৃদয় একবাব মজিয়া উঠে, অকাতবে ভোগ-ত্যাগ তাঁহার এইরূপ বিস্ময়কর, চমকপ্রদই হইয়া থাকে!

বিষ্ণুপ্রিয়া জানিলেন না—বুঝিলেন না যে, চকিতের মধ্যে তাঁহার কিরূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইয়া গেল এবং কি ভীষণ অশনি তাঁহার শীরে নিপতিত হইল। তিনি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার মত সৌভাগ্যবতী জগতে আর কে আছে। কে এমন জগৎ-দুর্লভ স্বামীর পদে আত্মবিক্রয় করিতে পারিয়াছে?

হৃদয়ের মধ্যে স্বামীর সেই দুর্লভরূপ দেখিতে দেখিতে যেন হঠাৎ বিকৃত হইয়া গেল, কে যেন সেই সুন্দর চাচর চিকুব-মণ্ডিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিলেন, হাতড়াইয়া দেখিলেন—প্রাণপতি পার্শ্বে নাই। আলো ক্ষীণ হইয়াছিল, উজ্জল করিয়া এদিক ওদিক দেখিলেন, তারপব প্রাণফাটা দুঃখে বলিলেন—"কাল নিদে! কেন তুমি পাপিনার চক্ষে আসিয়া, স্বামীর অদর্শন যাতনা ভোগ কবাইলে? এই অদর্শনই কি চির-যন্ত্রণাদায়ক হইয়া অভাগিণীকে দগ্ধ করিয়া মারিবে?" সতী ভীত-চকিত নেত্রে, আলুথালু বেশে শাশুড়ীব গৃহদ্বারে গিয়া দ্বারে আঘাত করতঃ বলিলেন—"মা। মা! উঠ, সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

শচীদেবীর নিদ্রা নাই, কখন অদৃষ্ট ভাঙ্গিবে—পৃথিবী অন্ধকার হইবে, তাহাই ভাবিতে ছিলেন; এক্ষণে বধূমাতার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া বুঝিলেন—বজ্রপাত হইয়াছে। তাডাতাড়ি বাহিরে আসিবা ডাকিলেন—"নিমাই! নিমাই!" প্রাঙ্গনে আসিয়া প্রাণের ডাকে ডাক ছাড়িয়া ডাকিলেন—"নিমাই! ও নিমাই!" কিন্তু সকলই বৃথা হইল, কেবল প্রতিধ্বনি সাড়া দিল—"নাই—নাই—নাই!"

শচীদেবীর প্রাণপণ ডাকে প্রতিবেশী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জাগিয়া

উঠিল। তাহারাও জনরব শুনিয়া মর্ম্মদুঃখপূরিত প্রাণে কেবল ভগবানের নিকট নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা প্রদানের প্রার্থনা করিতেছিল, তাহারাও উৎকর্ণ হইয়া শুইয়াছিল—একগুঁয়ে নিমাই কখন কি করে। শচীদেবীর মর্ম্মভেদী হাহাকার শুনিয়া সকলে বুঝিল—নিমাই সকলকে কাঁদাইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। বিশাল নবদ্বীপ নগরীর মধ্যে হাহাকার উঠিল—আনন্দময় নদীয়ার প্রতি গৃহ ক্রন্দন-রোলে ভরিয়া গেল। নিমাইয়ের বিরহে সেদিন কোন গৃহে কেহ প্রাণ ভরিয়া আহার করিতে পারিল না, কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসিল না। শোকের দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে নবদ্বীপ অন্ধকারময় হইল; গ্রামবাসীরা সমস্তদিন ইতস্ততঃ নিমাইয়ের অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে হতাশ-হৃদয়ে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস গ্রহণ।

জননীর ক্রন্দন—প্রিয়বাদিনী পত্নীব বিরহদীর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস—বন্ধুবর্গেব প্রবোধ বচন—কিছুতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নিমাইকে নিরস্ত করিতে পাবিল না। তিনি সেইদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ কাটোয়ার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিমাই ঠিক পাগল—প্রেম-বিহ্বল ভাবে চলিয়াছেন; প্রেম পবিপূর্ণ তনু, নয়নে প্রেমনীর, অঙ্গ প্রেম-পুলকিত, মুখে মধুময় প্রেম-হাসি। আজ নিমাইয়ের সেই রূপ যে দেখিল—সেই ধন্য হইল। নিমাই ক্রমশঃ কেশব ভারতীর বাটীর সম্মুখীন হইলেন। ভারতী মহাশয় সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, মায়া-মোহের অতীত; তথাপি আজ নিমাইয়ের রূপ দেখিয়া—প্রেমপূরিত এই লাবণ্য দেখিয়া চমকিত হইলেন! ইতিপূর্ব্বে তিনি নিমাইকে দেখিয়াছেন, কিন্তু আজিকার এ ভাব দেখিয়া ভারতীর হৃদয় স্তম্ভিত হইল। তিনি শশব্যস্তে গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন—"নিমাই! এ কি কবিয়াছ? এ নবীন বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া এতদূর আসিয়াছ, তোমার জননীর এবং পত্নীর দশা কি হইবে?"

নিমাই বলিলেন—"সকলের কর্ত্তা ভগবান, যাহা হইবে—তাহা হইতে তিনিই তাহাদের রক্ষা করিবেন। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া এই ভবার্ণব নিস্তারের উপায় আমাকে বলিয়া দিন। জীবকে নিস্তার

করিয়া, কিরূপে নিজে নিস্তার হইব—তাহারই পন্থা প্রদর্শন করুন। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া, যাহতে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আমার মতি হয়—সেইরূপ দীক্ষা দান করিয়া আমায় ধন্য করুন।"

কেশব বলিলেন—"বৎস। আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী। সন্ন্যাসী হইয়া গৃহীকে দীক্ষাদান করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ। তুমি অন্য কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর।"

নিমাই বলিলেন—"প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে আমি উদাসী হব—আজ হইতে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, আপনি আমাকে দীক্ষা দান করুন।"

"বৎস! এ বড় কঠিন আশ্রম, সংসারের যাবতীয় মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া—সকল প্রকার ভেদজ্ঞান বিরহিত হইয়া, সেবা ব্রত ধারণ করতঃ এ জীবন কাটাইতে পারিলে—তবে সন্ন্যাসী হওয়া যায়। সন্ন্যাস-আশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ এবং ত্যাগই এই আশ্রমের প্রধান অবলম্বন। বৎস। তুমি কি সেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিবে?"

"প্রভু। যেরূপ বলিবেন—আমি সেইরূপই করিব। আজীবন ত্যাগ-মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছি, সংসারী হইয়াও সংসার-বিরাগ আমাকে এতদূর অগ্রসর করিয়াছে, এক্ষণে আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। দীক্ষা বিনা জগতে যে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না প্রভু। এক্ষণে আপনি কৃপা না করিলে—বুঝি আমার এতদিনের মহাব্রত ভঙ্গ হয়।"

"বৎস। পাছে তোমার জননী ও পত্নীর অন্তরে দারুণ বেদনা হয়, একমাত্র পুত্রশোকে পাছে বৃদ্ধা শচীদেবী পাগলিনী হইয়া পড়েন—এই জন্য ভয় হয়। কি করিতে কি করিয়া, শেষে কি সতী-রোষানলে আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইবে? সে রোষ যে বড় ভীষণ।

"প্রভু! চিন্তা করিবেন না, আমি তাঁহাদের সকলকে একরূপ বুঝাইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে দীক্ষা দান করিয়া আমায় শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন।"

"নিমাই! তোমার কৌশল বুঝিয়াছি। আমার সাধ্য কি যে তোমায় শিষ্য করি, আমি তোমার গুরু হইব—এমন সাধ্য আমার কোথায়? জগদগুরু তুমি, তবে লোকশিক্ষা দিবার জন্য এবং এ দীনের শোসৌভাগ্য বাড়াবার জন্যই তোমার এই ছলনা। আজ আমি ধন্য! জগতের লোক দেখুক—দীন কেশব ভারতী আজ জগদগুরুর গুরু হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিতেছে।"

নিমাইয়ের আগ্রহাতিশয়ে কেশব ভারতী অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দীক্ষা দানের আয়োজন করিলেন। একজন ক্ষৌরকারকে আনাইয়া নিমাইয়ের সেই চাঁচর চিকুর মণ্ডিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হইল। তারপর সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করাইয়া—শ্রীঅঙ্গে অরুণ বসন পরিধান করাইয়া—কণ্ঠে তুলসীর মালা পরাইয়া যোগী সাজাইলেন। সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ অপরূপ অঙ্গে কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া, গৌরাঙ্গদেব দেব-প্রভায় উদ্ভাষিত হইলেন। এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভারতী মহাশয় মুগ্ধচিত্তে তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন।

নিমাইয়ের বয়স তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ, যৌবন-তেজে সমস্ত অঙ্গ পরিপূর্ণ। তাহার উপর এই তেজোময়—এই ধর্ম্মময় সাজসজ্জায় গৌরাঙ্গ অঙ্গে স্বর্গের সুষমা খেলা করিতে লাগিল। সেদিন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির শুভবাসর সমাগত, কেশব ভারতী এই মহামহেন্দ্রক্ষণে অতি সন্তোষচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ

করাইলেন। শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া ধন্য হইলেন। সিদ্ধার্থ যেমন সন্ন্যাস গ্রহণের পর "বুদ্ধনাম" গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানের প্রভাজাল মণ্ডিত হইয়া জগৎ উদ্ভাষিত করিয়াছিলেন, আজ দীক্ষা গ্রহণের পর, কেশব ভারতীও নিমাইকে "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" নাম প্রদান করিয়া, তাঁহার সাংসারিক যাবতীয় মোহপাশ ছেদন করিলেন।

মহাপ্রভু এইবার হরিনামে পাগল হইয়া, চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কেবল বলিতে লাগিলেন—"কলির জীব। এস, যাগ-যজ্ঞ, বার-ব্রত কিছুই পালন করিতে হইবে না, প্রাণ ভরিয়া কেবল "হরিনাম" উচ্চারণ কর, তাহা হইলে আর কোন পাতক থাকিবে না, তোমরা অবহেলায় হাসিতে হাসিতে ভবের এই দুস্তর সাগর পার হইয়া, স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে। জীব! ভয় নাই, ভব-ভয়হারীর এই মহামন্ত্র গ্রহণ কর—প্রাণ ভরিয়া এই নামসুধা একবার পান কর, তোমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা দূর হইবে, ভবের কোনও ভাবনা থাকিবে না। এস পাপী—এস তাপী—এস পণ্ডিত—এস অধম জীব! প্রাণভরে বল হরি হরিবোল।"

জগতের সুবিখ্যাত অদ্বিতীয় পণ্ডিত "নদের নিমাই" আজ প্রেমের পাগল হইয়া, জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। প্রেমাশ্রু-জলে ভাসিয়া আচণ্ডালকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কে আছ ভাই পাপী-তাপী—এস, আমাকে ধন্য কর, বদনভরে হরি হরি বল—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। দিন ব'য়ে যায়—নাম-সুধারস পান করিয়া জীবন সার্থক কর।"

যে শ্রীচৈতন্যের ঐ প্রেমোন্মাদ ভাব দেখিল—সেই বিহ্বল প্রাণে তাহার চরণে পড়িয়া হরিনাম গ্রহণ করিল, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব অবতার রূপে তাঁহাদের কৃপা করিলেন। সকলেই মহাপ্রভুর পদস্পর্শে আময়-পবিত্র, সুধার আধার হরিনাম বলে উন্মাদ হইয়া, তাঁহার অনুসরণ করিল লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুনরাগমন।

দেশ মাতিয়া উঠিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম প্রচারে দেশে ধর্ম্মের বান ডাকিল। এনাম গ্রহণে জাতি বিচার নাই—পণ্ডিত মূর্খ নাই—অধিকারী-অনধিকারী নাই—ক্ষমবান-অক্ষম নাই। যে যেরূপ অবস্থার লোক এবং যতই পাতকী হউক না কেন, এনাম গ্রহণে নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে। শ্রীচৈতন্য ডাক দিয়া বলিলেন—"কাহারও চিন্তা করিবার কিছু নাই, সকলে আইস, হরিনাম কর। একবার হরিনাম করিলে জীবের যত পাপ হরণ হয়—জীবন ভরিয়া জীব তত পাপ করিতে সক্ষম হয় না। কলির জীব! আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না, নাম-সাগরে ঝাঁপ দাও। সালক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, নির্ব্বাণ—যে যেরূপ মুক্তির অভিলাষী হও, এই সুধামাখা নামে—প্রেমময় শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে, তাহাকে সেইরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে। হরি হইতেও হরিনামের মাহাত্ম্য বেশী।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপে পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া সমস্ত গ্রাম, নগর, হরিনাম রসে ভাসাইয়া আর একবার স্বদেশে আগমন করিলেন। যেদিন নিজ ভক্তজনকে ফাঁকি দিয়া, গভীর রজনীতে একাকী গৃহত্যাগ করিলেন—কাহাকেও না জানাইয়া প্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন ভক্তগণ প্রভু-বিরহে একান্ত কাতর হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটী

করিতে লাগল। প্রাণ যাক্ আর থাক, তথাপি প্রভুকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিব, শচীমাতা ও প্রভু-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার শোকাপনোদন করিব।

শচীদেবী সমস্ত জানেন—সমস্ত দৈববাণী তিনি শুনিয়াছিলেন। তথাপি সেইদিন হইতে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া কেবল "হা নিমাই—হা বৎস" বলিয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ভক্তগণ পায়ে ধরিয়া নানা প্রকারে আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন, আর বক্ষে করাঘাত করিয়া কেবলই বলিতেছেন—"সেদিনকার কাল-নিদ্রাই আমার কাল হইল। হতভাগিণী আমি, যদি ঘুমাইয়া না পড়িতাম—তাহা হইলে প্রভু কি দাসীকে এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া যাইতেন পারিতেন? যদিও যাইতেন—তাহা হইলে আমি কি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিতাম? হায়, এখন আমি কি করি, সে আরাধ্য-মূর্ত্তি না দেখিয়া যে আমার জীবন ভার বোধ হইতেছে, কেমন করিয়া এজীবন ধারণ করিব?" সতী কখন ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছেন, কখনও বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিতেছেন—"হা প্রভু! হা দয়িত! দাসী কি দোষে দোষী হইল—পদসেবায় বঞ্চিত হইল কেন? তুমি যে বলিতে—বিষ্ণুপ্রিয়া! তোমাকে ছাড়িয়া আমি একতিলও থাকিতে পারি না। প্রাণেশ্বর! এই কি তার নিদর্শন?"

শোকের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি এই বিবশা-রমণীদ্বয়কে প্রতিবেশী সকলে সান্ত্বনা দিতেছেন, আশা দিয়া বলিতেছেন—"আমরা নিমাইকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিব।" কিন্তু প্রাণে প্রাণে সকলেই হতাশ হইয়া, মনে মনে বলিতেছে—"নিমাই কি সেই নিমাই, চোর স্বভাব যে তার চিরকাল।"

ভক্তের নিকট ভগবান কতদিন গোপন থাকিতে পারেন? প্রাণের ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে—আকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে—তিনি ভক্তকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না। যেদিন প্রভু গৃহত্যাগী হইলেন, সেইদিনই গদাধর, চন্দ্রশেখর, ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রাণের আবেগে জীবনপণ করিয়া চারিদিকে ছুটিল। নিত্যানন্দ প্রভুর অপকট ভক্ত, চৈতন্য অবতারে তাঁহার মত ভক্ত কেহ ছিল না, প্রভু বলিয়াছিলেন—নিত্যানন্দ! তুমি ও আমি অভেদ আত্মা। নিত্যানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া, শেষে কাটোয়ায় গমন করিলেন এবং প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে শান্তিপুরে পরমভক্ত অদ্বৈতের ভবনে আনয়ন করিলেন। ভক্তগণ বহুদিনের পর আবার তাহাদের আরাধ্য দেবকে দেখিয়া, ভক্তিগদগদ চিত্তে প্রেমপুলকে পুলকিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইল।

শ্রীচৈতন্য আজ প্রকট হইলেন। সকলেই বুঝিল—ইনি আর কেহ নহেন, জগদারাধ্য ভগবান। এতদিন দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে সখ্যতা করতঃ কেবল ভক্তবৎসল নামের মর্য্যাদা বাড়াইতেছেন। সন্ন্যাসীর স্ব-ভবনে আসা এবং প্রণয়িণী দর্শন করা নিষিদ্ধ; তাই প্রভু চৈতন্যদেব অদ্বৈতাবাসে অবস্থান করিয়া, জননীর দর্শন জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জনক-জননীর দর্শন দেব-দর্শন, কোন আশ্রমেই বাধা নাই, নিত্যানন্দ আসিয়া শচীদেবীকে সংবাদ দিলেন। শচীদেবী আনন্দে বিহ্বল হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনিলেন—বিষ্ণুপ্রিয়ার যাওয়া নিষেধ, কারণ স্ত্রী-দর্শন সন্ন্যাস আশ্রম বিরুদ্ধ—তখনই একটু

ম্রিয়মানা হইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"মা আমাব! এমন ভাগ্যও তুই ক'বে এসেছিলি?"

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন তন্ময়, সে বিষাদ ভাব তাঁহাব তিবোহিত হইয়াছে। তিনি প্রত্যহ রজনীযোগে সেই প্রিয়মূর্ত্তি দর্শন কবিয়া, প্রাণে সান্ত্বনা লাভ কবিতেছেন। প্রভু তাঁর জীব-দুঃখ দুরীকরণেব জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান রূপে সকলের নিকট পূজিত হইতেছেন—তিনি সাক্ষাৎ প্রেমেব অবতার—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী সতী নিজ দয়িতের এইরূপ উন্নতি—এরূপ সুখ্যাতি শুনিয়া আনন্দ বিভোর, এখন আর তাঁহাব অন্তব সেরূপ শোক দহনে দহিয়া খাক হইতেছে না। তিনি অকাতরে শাশুড়ীকে বলিলেন—"মা! আমি চিবকাল কাঁদিতে আসিয়াছি—কাঁদিয়াই জীবন কাটাইব। তুমি যাও, আমাব জন্য চিন্তা কবিও না। কি জানি—পাগল স্বভাবেব বশবর্ত্তী হইয়া যদি তিনি তোমাকেও আবার দেখা না দেন! মা, প্রভু আমায় কাঁদাইবার জন্যই ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন, আমি আজীবন কাঁদিতেই থাকিব; তবে আমার জন্য তুমি এ শুভ মুহূর্ত্ত কেন নষ্ট কর মা! তুমি এখনি যাও।"

"মা! বিধাতা তোর কপালে এত কষ্টও লিখেছেন—" বলিয়া বুড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে নিতাইয়ের সহিত পুত্র দর্শনে গমন কবিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া কপালে কবাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হায়! যদি আমি পত্নী না হইয়া প্রভুর সেবিকা-দাসী হইতাম, তাহা হইলে তিনি কখনই চরণে ঠেলিতে পারিতেন না।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার তখনকার সেই বিষাদ-জড়িত মূর্ত্তি দেখিলে, বাস্তবিকই প্রাণ ফাটিয়া যায়। একজন সঙ্গিনী তাঁহার দুঃখ দেখিতে না পারিয়া

বলিল—"প্রভু যখন এত কাছে আসিয়াছেন, তখন আমি কিছুতেই ছাড়িব না; একবার তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার একটা বিহিত করিবই করিব। আহা! অভাগিণী আজীবন কেমন করিয়া এই অসহ্য বিরহ ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে?" এই বলিয়া সেও শান্তিপুরাভিমুখে রওনা হইল। সকলে কত নিষেধ করিল—কিন্তু সে কাহারও কথা শুনিল না।

অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ বলিতেছেন—"প্রভু! পৃথিবীকে প্রেমময় করিবার জন্য, আ-চণ্ডালে হরিভক্ত করিবার জন্য তোমার জন্ম। কিন্তু প্রভু! এ কি ক'রলে? নিরস জ্ঞান-পথের পথিক হইয়া, কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিলে, তোমার প্রেমময় নামে যে কলঙ্ক হবে ঠাকুর!"

শ্রীচৈতন্য সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—"ভক্তগণ! কোন চিন্তা করিও না। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, কৃষ্ণ-প্রেম বিতরণে অবহেলা করিব না, আর এই সন্ন্যাস-ব্রতই আমাকে সে পন্থা অনুসরণে বিশেষ সাহায্য করিবে। এস—আজ সকলে প্রাণ ভরিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করি।" উন্মত্ত নিমাই প্রেমভবে অতি দীনহীন বেশে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ঐ ডোর-কৌপিন পরা ভিক্ষুকের বেশ দেখিয়া, সকলে আকুল প্রাণে গাহিলেন :—

"কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হ'য়ে ব'লছ হরি।
ওরে ব্রজের মাখন চোর, তুমি কার ভাবে প'রেছ কৌপিন-ডোর॥"

শ্রীচৈতন্য যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার, এখনকার এই ভাব দেখিয়া তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকি নাই। তিনি যে

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার প্রেম-ঋণ শুধিবার জন্য—তাঁহার নিকট দাসখতের উজ্জ্বল দিবার জন্যই যে আজ গৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি যে সখীভাবে সাধনা করিয়া শ্রীরাধার প্রেম-ঋণ পরিশোধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, এত দীনহীন বেশে লোকের দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া শ্রীরাধার প্রাণের ধন হরিনাম বিলাইতেছেন—ইহাতে আর কেহ সন্দেহ করিতে পারিল না। পরমাপ্রকৃতি, শ্রীশক্তি রাধামন্ত্রে শক্তিমন্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য যে ভূ-ভার হরণ করিতে আসিয়াছেন—তাঁহার কার্য্যকারণ দেখিয়া সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। যে সকল আসক্তি মানুষ হইয়া কখন ছাড়িতে পারা যায় না, শ্রীচৈতন্য জীবের মঙ্গলার্থে তৎসমস্তই অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। দেবভাবে ভাবিত—দেবতার অবতার ভিন্ন এরূপ ত্যাগ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

শচীমা ভক্তগণের সহিত অদ্বৈত-ভবনে আসিয়া দেখিলেন—নিমাই উন্মত্ত হইয়াছে, ঠিক ভিক্ষুকের মত বেশ ধারণ করিয়া হরিনাম করিবার জন্য সকলের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে। সকলকেই বলিতেছে—'ভাই সকল! কৃষ্ণপ্রেমে আমি যোগী সাজিয়াছি, তোমরা আমার প্রতি কৃপা করিয়া কৃষ্ণ-ভক্ত হও—প্রাণ ভরিয়া হরিনাম কর।" শ্রীচৈতন্যের কথায় আর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিতেছে না, সকলেই সমস্বরে "হরি হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিতেছে।

প্রাণেরকুমার—সোণার বরণ গৌরাঙ্গ, আজ ডোর-কৌপিন পরিয়া দণ্ডকমণ্ডলু ধরিয়া ভিখারী হইয়াছে দেখিয়া, শচীমাতা কাঁদিয়া উঠিলেন। মা হইয়া সন্তানের এরূপ ভাব কি কেহ দেখিতে পারে? শ্রীচৈতন্য জননীকে দেখিয়া শশব্যস্তে তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করতঃ

বলিলেন—"দেবি আমার, সাধনা আমার, সিদ্ধি আমার, পুণ্যবতী মা আমার—তোমারই কৃপায় আমি জগতের হিতে ব্রতী হইয়াছি। সেবক না হইলে সাধক হওয়া যায় না, আর্ত্তের সেবা, জীবে দয়া এবং তৃণ হইতেও হীন স্বভাবই বৈষ্ণবের লক্ষণ। মা! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।"

শচীদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণপুত্রকে বুকে ধরিয়া বলিলেন—"বাবা! শ্রীকৃষ্ণ তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। তুই যে সেই কৃষ্ণ—এ কথা কত লোকে এখন ঘোষণা করে। কিন্তু যে যাই বলুক, আমি কিন্তু দেখি—তুইত আমার সেই দুধের গোপাল নিমাই ভিন্ন আর কেহ ন'স্।"

জননীর কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন—"মা, আমি তোমার অকৃতি সন্তান, আমার দ্বারা তুমি জীবনে কোন সুখ পেলে না ব'লে দুঃখিতা হইও না, তুমি দুঃখিতা হ'লে আমার সব ব্রত পণ্ড হবে। সন্তানের পক্ষে জনক-জননী সকল আরাধ্য-দেবতা অপেক্ষাও বড়। তাই বলি মা, কু-পুত্র অনেক হয়—কু-মাতা কখন হয় না, মাতা কখনও সন্তানের দোষ দেখেন না। মা! যদিও আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি বাড়ী ছাড়া আমাকে তুমি যেখানে থাকিতে অনুমতি করিবে আমি সেইখানে থাকিব, তবে সন্ন্যাসী-জীবনে স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে আমায় অনুরোধ করিও না। এখন বল, কোন্ স্থানে থাকা তোমার অভিপ্রেত? আমি কিন্তু বৃন্দাবনবাসী হব বলে ইচ্ছা ক'রেছি।"

শচীদেবী বলিলেন—"না বাবা, আমি তোমায় বৃন্দাবনবাসী হ'তে দিব না, তাহ'লে তুমি আর কখন দেশে আস্‌বে না, সেইখানেই উন্মত্ত হ'য়ে প'ড়বে।"

ভক্তগণও প্রভুর বৃন্দাবনবাসের কথা শুনিয়া হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাহারও ইচ্ছা নহে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনবাসী হয়েন; তবে একবার তথায় যাইতে পারেন, কিন্তু সেখানে বাস করা কাহারও ইচ্ছা নহে। শ্রীচৈতন্য তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবেন না, তাই ভক্তগণের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন—"আপনারা অনুমতি করুন, আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব?"

প্রত্যুত্তরে শচীদেবী বলিলেন—"আমার ইচ্ছা তুমি পুরুষোত্তম যাত্রা কর, সেখানেও ত ভগবান আছেন? নীলাচলে থাকিলে আমি সময়ে সময়ে তোমার সংবাদ পাব।"

ভক্তগণ ইহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। নিতাই প্রেমে অধীর হইয়া বলিলেন—"কে কোথায় পতিত, ভীত, বিপদ্‌গ্রস্ত আছ—এস সকলে, আজ প্রভু তোমাদের উদ্ধারকর্ত্তারূপে আসিয়াছেন! এমন সুদিন আর হইবে না, দয়াল হরি আজ নিজে হরিনাম বিলাইতে—পাপীকে উদ্ধার করিতে, সকলের দ্বারস্থ হইয়াছেন। যদি ভবার্ণবে উদ্ধার হইতে চাও, যদি পাপতাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিপথের পথিক হইতে ইচ্ছা কর—এস, দীনের সখা প্রভু আজ তোমাদের আহ্বান করিতেছেন।"

হরিদাস আসিয়া বলিলেন—"প্রভু! আমি যবন—তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই আমি ভবার্ণবে ডুবিয়াছি—সমাজ হারাইয়াছি। তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই, এ দীনহীনের গতি কি হবে প্রভু?"

শ্রীচৈতন্যদেব আকুল প্রাণে বলিলেন—"ভক্তপ্রধান হরিদাস! আমি যেখানে—তুমিও সেইখানে; তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারি না। আমার ইচ্ছা, তুমিও কৃপা করিয়া আমার সঙ্গে চল।"

হরিদাস যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, তিনি প্রভুর সঙ্গী হইলেন। প্রভু জননীর অনুমতি লইয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নীলাচলে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার দাসী উপস্থিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন—"প্রভু! আপনি দীনের ঠাকুর, সকলের সন্তাপ হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এদিকে যে আপনার জনের দুর্গতির একশেষ হইতেছে। তাঁহার প্রতি কৃপা না করিলে আপনার অকলঙ্ক নামে যে কলঙ্ক হইবে, দাসীর প্রতি কি প্রসন্ন হইবেন না?"

শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন—"আমিও তাঁহার মত চিরদুঃখী, তাঁহার দুঃখ ও আমার দুঃখ এ জীবনের সাথী। এরূপ অবস্থায় আর অন্য উপায় নাই, তবে আমার এই পাদুকা লইয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন কর।"

সঙ্গিনী প্রভুর পাদুকা লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রদান করিল। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবতার পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া, তাহার পূজা করতঃ জীবনের শেষ দিনগুলি একরূপ মনের আনন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলাচলে প্রভু।

পুরুষোত্তম তীর্থ নীলগিরির অন্তরবর্ত্তী বলিয়া ইহাকে নীলাচল নামে অভিহিত করা হয়। প্রভু জননীর অনুমতি লইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নীলাচলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বড় আশা—প্রভু কলির দেবতা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দেহ ভক্তিভাবে পুলকিত হইতে লাগিল, প্রেমপুলকে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কতকক্ষণে পুরষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবেন, তাহার জন্য বিষম আগ্রহে ছুটিতে লাগিলেন। সঙ্গীগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিতেছেন না, প্রভু এমনি ত্বরিত গমনে চলিয়াছেন। প্রাণে আগ্রহ যখন বাড়ে, একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী দেখিবার জন্য মনের যখন চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়—তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, যেমন করিয়া এবং যেদিক দিয়া হউক ঈপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেই হইল।

বহু পরিশ্রমের পর সকলে পুরুষোত্তমের নিকট শ্রীভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভবানীপতির লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবে গদগদ হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরবাসী সকলেই ভগবান শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব প্রেমময়-মূর্ত্তির দর্শন কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আজ পাণ্ডাবর্গ সাক্ষাৎ যুগাবতার প্রভুর মূর্ত্তি সন্দর্শন করতঃ তাঁহার পদধূলি

গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন; সকলে সেদিন প্রভুকে তথায় অবস্থান করিতে বলিলেন। দয়াল ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তবৃন্দের কথা অবহেলা করিতে পারিলেন না; সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সেদিন শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর দেবের প্রসাদ লাভ করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভু সহচরগণ সমভিব্যাহারে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে তাঁহার আগ্রহ এত বাড়িয়াছিল যে, তিনি এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথা সময়ে ভগবান চৈতন্যদেব শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া অনুরাগ-আবেগে অধৈর্য্য হইলেন এবং ঐ মূর্ত্তি ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পুরীরাজ প্রতাপ রুদ্রের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে যখন চৈতন্যদেবকে দেখিয়াছিলেন, তখন ইনি পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আর আজ একি! এ যে ভক্তিভরা প্রেমমূর্ত্তি! মরি মরি, এমন সোণার অঙ্গে ভিখারীর বেশ কে পরাইল রে! হায় হায়! শচীদেবীর কি দুরদৃষ্ট—এমন সোণার চাঁদ ছেলে সন্ন্যাসী হইয়াছে? তিনি শশব্যস্তে কাছে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চৈতন্য সম্পাদন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সকলের গগনভেদী হরিনাম সংকীর্ত্তনে ক্রমে শ্রীচৈতন্যের মূর্চ্ছাপনোদন হইল। তিনি চেতনা লাভ করিয়া সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে নিকটে দেখিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে অভিবাদন করিলেন।

সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজ বাসায় লইয়া গেলেন এবং ভক্তিভরে তাঁহার সেবায় রত হইলেন। তিনি চৈতন্যের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বিষম পাণ্ডিত্যাভিমান তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তিনি জানিতেন—তাঁহার মত পণ্ডিত জগতীতলে আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত হইতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যে নয়। এইজন্য তিনি একদিন নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য সশিষ্য চৈতন্যদেবকে চৈতন্য-ভাগবত শুনাইতে ও তাহার ব্যাখা করিতে লাগিলেন এবং নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দেখাইবার জন্য—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং মিথং ভূতগুণোহরি॥

এই শ্লোকটীর নয় প্রকার ব্যাখা করিয়া শুনাইলেন। দর্পহারী কখনও কাহার দর্প রাখেন না। বাসুদেব জানেন না যে, এ কাহার নিকট শাস্ত্র-ব্যাখা করিতেছেন। প্রভু হাসিতে হাসিতে ঐ শ্লোকটীর অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে পড়িলেন এবং করযোড়ে পরাজয় স্বীকার করিলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, তিনি গুরুকে আদরে গৃহে রাখিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বুঝিলেন—পুস্তক পড়িয়া যে পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়, তাহার জয়-পরাজয় আছে। কিন্তু ভিতরে দেখিয়া-শুনিয়া, বুঝিয়া-পড়িয়া, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া

যাহা শিক্ষা করা যায়—তাহা একেবারে অভ্রান্ত, তাহাকে তর্ক-বিতর্কে হারাইবার ক্ষমতা এ জগতে কাহারও থাকে না।

শ্রীচৈতন্য সকলকেই সমান ভাবে দেখিতেন। তাঁহার নিকট ছোট-বড, ধনী-নিধন, জ্ঞানী-অজ্ঞানী কিছুই ভেদাভেদ ছিল না, নীচ-উচ্চ জাতিভেদ তিনি করিতেন না। তাই বলিতেন :—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

তৃণের ন্যায় সু-নীচ হইয়া তিনি সকলকেই আলিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ করিতেন এবং নিজে কৃতার্থ হইতেন। মরি মরি, এমন দয়ার ঠাকুর, পতিতের বন্ধু বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মাইয়াছে কি?

শ্রীচৈতন্য একদিন ভাবাবেশে বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, সঙ্গে কেহই নাই, সেই সময় একজন মুসলমান দর্জ্জি রাজা রুদ্রপ্রতাপের আদেশে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ডাকিতে আসিল। জানি না কোন্ সৌভাগ্য বলে সে সার্ব্বভৌমের সন্ধানে আসিয়া প্রভুর দর্শন পাইল। শুধু কি তাই—প্রভু তখন ষড়ভুজ মূর্ত্তি ধরিয়া বিহার করিতেছিলেন। যে রূপ দর্শন প্রভুর কোনও ভক্তের ভাগ্যে ঘটে নাই, সামান্য দর্জ্জি আজ তাঁহার সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইল। সে অতি দীনভাবে প্রভুর পদতলে আসিয়া উপবেশন করিয়া করযোড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু প্রকৃতিস্থ হইয়া রূপ সম্বরণ করিলেন এবং সম্মুখে মুসলমান দর্জ্জিকে দেখিয়া বলিলেন—"মোল্লা সাহেব! পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে তুমি আজ আমার দেবমূর্ত্তি দর্শন করিলে।

অতঃপর তুমি মহা সাধু হইলে; হরিনাম করিতে কখনও ভুলিও না—হরিনামেই তোমার মুক্তি হইবে।”

দর্জ্জি পণ্ডিতকে বাড়ীতে দেখিতে না পাইয়া রাজাকে গিয়া সংবাদ দিল। সে আরও বলিল—“পণ্ডিতের বাড়ী একটী মহাপুরুষ আসিয়াছেন—তিনি স্বর্গের দেবতা, তাঁহার ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি সব ভুলিয়া গিয়াছি। মহারাজ! আর আমি সামান্য রাজদরবারে চাকুরী করিব না, এক্ষণে আমি সেই রাজার-রাজার দাসত্ব করিতে চলিলাম। আপনি আমার স্থানে অন্য লোক বাহাল করুন।” এই বলিয়া দর্জ্জি সমস্ত বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়া জীবনের পথ মুক্ত করিতে লাগিল।

তখন মুসলমানগণের প্রতাপ চারিদিকেই অপ্রতিহত, কেহ তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। হিন্দুকে মুসলমান করিবার জন্য তাহারা প্রাণপণ করিতেছে, হিন্দুর মধ্যে মুসলমান-ধর্ম্ম চালাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। হিন্দুগণ ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া গৃহে গৃহে “সত্যপীরের” পূজা আরম্ভ করিয়াছে; নারায়ণের পূজা করিয়া “সত্যপীরের সীরণী, ব্রত-কথা পাঠ” প্রভৃতি করিয়া মুসলমানগণের তুষ্টি সাধন করিতেছে। এই সময় হইতেই সত্যপীরের পূজা-ভাণ করিয়া শ্রীনারায়ণের পূজা এবং মানসীক ব্রতকথা আরম্ভ হইয়া এতদিন হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে।

তখন কোন হিন্দু-রাজাই মুসলমানগণের অপ্রতিহত প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন নাই, কেবল ক্ষত্রিয়-বীর রাজা প্রতাপরুদ্র অনেক সময়ে মুসলমান-সেনাপতি ও কাজীগণকে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়া হিন্দু-সমাজের ও

হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাভক্ত, প্রতি পুণ্যতিথিতে তিনি পুরী-মন্দিরে আসিয়া দেবতার পূজা ও ভোগ প্রদান করিতেন। ধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল।

নবদ্বীপে যে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন—এ কথা প্রতাপরুদ্র শুনিয়াছিলেন, দেখিবার সাধ করিয়া রাজকার্য্যে ব্যস্ততা হেতু দর্শন করিতে পারেন নাই, আজ যাইব—কাল যাইব বলিয়া দিন কাটিয়া যাইতেছিল। আজ দর্জ্জির মুখে এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন, বুঝিলেন—প্রভু নিশ্চয়ই পুরীধাম পবিত্র করিতে আসিয়াছেন, নতুবা সামান্য মানুষ কখন ষড়ভুজমূর্ত্তি ধরিতে পারে না। আর পণ্ডিত মহাশয়ের মুখেও শুনিয়াছি—প্রভু জগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রভু আসিতেছেন। প্রভু দারুময় মূর্ত্তি—আর ইনি সজীব মূর্ত্তি। কত দিনে তাঁর দর্শন পাইব?

প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্য সময় হইলে সার্ব্বভৌম হয়ত নিজের অভিমানে মত্ত হইয়া প্রভুর মহত্ত্ব রাজ-সমীপে প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের পদে তিনি মস্তক অবনত করিয়াছেন—ভগবান চৈতন্যদেব তাঁহার সকল দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে যথার্থ চৈতন্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান ঘুচিয়া গিয়া অন্তর বিশুদ্ধ প্রেমভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তাই তিনিও রাজার নিকট মহাপ্রভুর বিষয় বর্ণনা করিবার সময় অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে রাজার মনোভাব বুঝিয়া অপার আনন্দে সমস্ত প্রকাশ করিলেন। রাজা প্রভুকে নিজ ভবনে আনিবার জন্য ভক্তিভাবে তাঁহার চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

করিতে রাজভবনে পদার্পণ করিলেন। রাজা ধন্য হইয়া সপারিষদ মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্ত্তন-রসে মাতিয়া উঠিলেন। প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর নিকট হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে বেশী বিলম্ব করিলেন না। *

অতঃপর মহাপ্রভু নীলাচলে আপনার বাসস্থান স্থির করিয়া, প্রাণের নিত্যানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। জননী ও পত্নীর সেবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া চারিদিকে হরিনাম প্রচারের অনুমতি প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ দেশে আসিয়া শচীদেবীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিমাই-নিতাই অপ্রভেদ, এক আত্মা—এক প্রাণ। বৃদ্ধা শচীদেবী নিতাইকে পাইয়া এবং তাঁহার মুখে নিজ পুত্রের সুসংবাদ এবং নীলাচলে অবস্থিতির বিষয় শুনিয়া, এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়া শেষের কয়টা দিন কাটাইতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর পাদুকা লইয়া পূজা করিয়া তন্ময়ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। প্রথম প্রথম প্রাণফাটা মর্ম্ম-যাতনায় অভিভূত হইয়া, পিতৃগৃহে যাইবার জন্য শাশুড়ীর নিকট অনুযোগ করিতেন, কিন্তু প্রভুর পাদুকা পূজার ভার পাইয়া অবধি আর তাঁহার কোথাও যাইবার ইচ্ছা নাই। এখন কেহ সে কথা তুলিলে বলেন—"স্বামীর গৃহ স্ত্রী-জাতির নিকট সকল তীর্থের সার এবং স্বর্গ হইতেও পবিত্রতম স্থান। ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণু আমার হৃদয়-দেবতার পদরজে পরম পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছে; ইহার প্রত্যেক বৃক্ষলতা তাঁহার রূপের স্বরূপ প্রদান করিতেছে। আমি এমন পবিত্র মনোরম স্থান ছাড়িয়া সুস্থ হইতে আর কোথায় যাইব? বিশেষতঃ তাঁহার আরাধ্যা জননী, যাঁহার সেবা করিয়া তিনি ধন্য হইতেন—আমি সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবীকে

ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। এখন এই মাটীতে হাড় ক'খানা রাখিতে পারিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব।

ভাগবত হরিদাস প্রভুর কাছে কাছে থাকেন। কোনও যাত্রী বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলে, তাহাদের দ্বারা প্রভুর সংবাদ— তাহার জননী, পত্নী ও নিতাইকে প্রেরণ করিতেন। নিতাই জননীসমা শচীদেবী ও প্রভুপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট দাসভাবে অবস্থান করিয়া, প্রভুর আদেশে গ্রামে গ্রামে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন।

এখন হরিদাস প্রভুর অন্তরঙ্গ মহাভক্ত, প্রভু তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারেন না। হরিদাস প্রভুর অগ্রে দেহত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া, কিছুদিন হইল সামান্য জ্বর ভোগ করিতেছেন। প্রভু অনন্যকর্ম্মা হইয়া ভক্তের সেবায় প্রাণপাত করিতেছেন। কিন্তু হরিদাস এত সেবা-শুশ্রূষায়ও আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না, দিনে দিনে দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল এবং একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর পদতলে তিনি চির-নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। ভগবান চৈতন্যদেব অতি সাদরে এই পবিত্র দেহ বুকে করিয়া তাহার শেষ সংকার করিলেন।

ভক্তবিয়োগে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া, শ্রীচৈতন্যদেব কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি সকল তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। ভারতের নানা স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইয়া, তিনি সকলের নিকট পূজিত হইতে লাগিলেন। বৃন্দাবনে কয়েক দিন অবস্থান সময়ে রূপ-সনাতনের সহিত তাঁহার মিলন হইল। তিনি ভক্তের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করিয়া—"হা কৃষ্ণ,

হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। যমুনা-জলে—বংশীবটতলে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া কত ছুটাছুটী করিয়াছিলেন। তারপর রাধাকুণ্ডে আসিয়া রাধাভাবে বিভোর হইয়া, স্বামী সহবাস-সুখে সুখী হইবার জন্য কিছুদিন স্ত্রীভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী নর-নারী এই আত্মভোলা ভিক্ষুককে দেখিয়া, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণভাবে পূজা করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ দেবতার কৃপালাভ তাঁহাদের ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই। জননীর নিকট অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া প্রভু শীঘ্র শীঘ্র তথা হইতে পুনরায় দেশে আসিলেন। অদ্বৈতাবাসে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের ধর্ম্ম।

প্রেম ধর্ম্মই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম। ভক্তির চরম প্রেম, প্রেমই চরম ভাব। এই ভাবে বিভোর হইয়া নাম গান করিতে পারিলেই, জীব সমস্ত পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তিমে ভগবানের চরণে লীন হইতে পারে।

আসক্তিসম্পন্ন কলির জীবের জন্য ভগবান মহাদেব তান্ত্রিক সাধনা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে আপামর সাধারণ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি মার্গে আসিয়া সাত্ত্বিকভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে অনেক অনুষ্ঠানের আবশ্যক। আজ মহাপ্রভু চৈতন্য যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন—কলির জীবের জন্য যে নাম-মাহাত্ম্য উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে উদযোগ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া—ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে পারিলেই জীব সংসারের সকল মায়াজাল মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিবে। এই নামের মধ্যে ভগবান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার অনন্ত নামে অনন্ত শক্তি বিরাজিত। ভগবান চৈতন্যদেব বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভবগন্মমাপি দুর্দ্দৈবমিদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখপদ্মাবনির্গত উপর্য্যুক্ত শ্লোকে বলিতেছেন—ভগবান আপনার নামের মধ্যে বহু প্রকারে নিজের যাবতীয় শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন। আর তাঁহার নাম স্মরণের কোন বিশেষ নিয়ম বা কালাকাল নাই। হায়! দয়ার ঠাকুর—তোমার এতাদৃশ মহিমাময় নাম পাইয়াও আমার এমন মন্দ ভাগ্য যে, তাহা স্মরণে আমার অনুরাগ জন্মিতেছে না।" হরিনাম ভিন্ন জগতে এমন আর কোন নাম নাই যাহাতে সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের উদ্দীপনা হয়। নামকে কেবল অক্ষর বলিয়া বিবেচনা করিলে হইবে না, নামই ব্রহ্ম। শ্রীরূপ গোস্বামী "কৃষ্ণ" এই বর্ণ দুইটীর কত মাহাত্ম্য—ইহাতে কত অমৃত পরিপূরিত রহিয়াছে—তাহা এক মুখে বলিতে পারেন নাই। নবদ্বীপে প্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও নীলাচলে ব্রহ্ম হরিদাস জীবের মঙ্গলের জন্য বাড়ী বাড়ী গিয়া এইরূপ ভিক্ষা করিয়াছিলেন যে:—

হরিদাস, নিত্যানন্দ বলে এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥

ব্রহ্ম হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ জপ করিয়া নাম সাধনায় সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এইজন্য বহু কুলীন-ব্রাহ্মণ আজও তাঁহার সাধন-পীঠে সমাগত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া থাকেন এবং রাজসভাদিতেও তাঁহার সমাদরের ত্রুটী হয় না। আর মহাপ্রভু এই হরিদাসের মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছিলেন। এইজন্য ভক্তও যে ভগবানের আরাধ্য বস্তু,

তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই। নামই ব্রহ্ম, মন্ত্র মহাশয় বলিয়াছেন:—"একাক্ষরং পরব্রহ্ম।" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু বার বার বলিয়াছেন:—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
কলিযুগে নাম রূপে কৃষ্ণের অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জীবের নিস্তার॥

কেবলমাত্র নাম জপেই জীব সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করে—জপাৎ সিদ্ধিজ্জপাৎ সিদ্ধিজ্জপাৎ সিদ্ধিনসংশয়ঃ। এই নামে সকল দুর্ভাগ্য নষ্ট হয় এবং সকল ভয়ে অভয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই নাম ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুর হইতে পুরুষোত্তম এবং তথা হইতে দাক্ষিণাত্য এবং পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রভু এই মহামহিমান্বিত নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া জীবকে জীবন্মুক্ত করিয়াছিলেন। প্রেমোন্মাদ প্রভু যে গ্রাম দিয়া গমন করিয়াছেন, সেইখানকার লোকসমূহ তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে, তাঁহার শ্রীমুখের মধুর হরিনাম শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া কাতরভাবে তাঁহার নিকটস্থ হইলে চৈতন্যদেব তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া শক্তি সঞ্চার

করতঃ সংকীর্ত্তন করিতে অনুমতি দিলেন। তাহারা নিজে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া গ্রামে গ্রামে এই সংকীর্ত্তন-মন্ত্র ছড়াইয়া কত পাপী তাপীকে যে উদ্ধার করিতে লাগিল—তাহার ইয়ত্তা কে করে?

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গোদাবরী তীরে স্নান সমাপন করতঃ কৃষ্ণনাম জপ করিতেছিলেন, সেই সময় কায়স্থ-নরপতি রামানন্দ রায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রামানন্দ চৈতন্য অবতারের কথা শুনিয়াছিলেন—ধরি ধরি করিয়া এত দিন ধরা পান নাই। আজ অপরূপ সৌন্দর্য্য বিভাসিত এই সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার আর চিনিতে বাকি রহিল না, রাজা তাঁহার পদতলে পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া কৃষ্ণনাম করিতে বলিলেন এবং তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমিই কি রায় রামানন্দ?"

রাজা অতি বিনীত হইয়া করযোড়ে বলিলেন—"আজ্ঞে, আমিই দাসানুদাস হীনমতি ভক্তাধম।"

চৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন—"সার্ব্বভৌমের মুখে তোমার কথা শুনিয়া তোমার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।"

রামানন্দ রায় একজন ভাগবতোত্তম ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট ভক্তি-তত্ত্ব-বিষয়ক নানাবিধ তত্ত্ব শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রশ্ন করিলেন। রায় রামানন্দ বলিলেন—"প্রভু স্বয়ং যখন ভক্তিরস রসিক প্রেমাবতার, তখন আপনার আমি নিকট কি তত্ত্ব প্রকাশ করিব? আমার কি ক্ষমতা যে, আপনার চিত্ত-সুখকর বিষয়সকল বিবৃত করি।"

প্রভু বলিলেন—"ভক্তের নিকট ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করিতে আমার বড় সাধ। জগতে জীবের প্রার্থনীয় বস্তু কি, তুমি তাহা প্রকাশ করিয়া বল।"

রামানন্দ অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"প্রভু! বিষ্ণুভক্তিই জীবের প্রার্থনীয় এবং স্বধর্ম্মে থাকিলেই তাহা লাভ হইয়া থাকে?"

প্রভু বলিলেন—"উহা বাহিরের উপায়, উহা অপেক্ষা আরও কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ কর।"

রামানন্দ বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণে সকল প্রকার কর্ম্ম সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—

"যৎ করোষি যদশ্নাষি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎপস্যস্তি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্॥"

প্রভু বলিলেন—"উহাও বাহ্য, আরও কিছু উৎকৃষ্টতর উপায় বল।'

রামানন্দ গীতার সেই সার কথা বলিলেন :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

প্রভু বলিলেন—"আরও কিছু উচ্চে উঠিতে পার কি?"

রামানন্দ ভক্তি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি বলিলেন—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সার। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিসম্পন্ন সাধকগণ ভগবান অচ্যুতের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পূজা করেন, অথচ সকল বস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন—ইহাই সার তত্ত্ব।"

চৈতন্য বলিলেন—"আরও কিছু উচ্চ বলিতে পার কি ?"

রায় বলিলেন—"জ্ঞানশূন্য ভক্তি তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

প্রভু বলিলেন—"ইহা কতকটা বটে, তবে আরও বেশী যদি উপলব্ধি করিয়া থাক, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া বল।"

রায় রামানন্দ বলিলেন—"তবে প্রেমভক্তিই মুলাধার, ইহার তুল্য আর কিছু নাই। যে সকল নিষ্কামী ভক্ত প্রেমভক্তির দ্বারা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন, তাহাদের সাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাই গোপীদের শান্তভাব।"

প্রভু বলিলেন—"ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী কিছু নাই ?"

রায় বলিলেন—"তবে দাস্য প্রেমই সকলের সার! তিনি প্রভু, আমি দাস—এই ভাব ভক্তের প্রাণে উদয় হইলে আর তাহার অভাব কিসের ? প্রভু! ছলনা পরিত্যাগ করুন, বলিয়া দিন—কবে আমি তোমার সেবায় নির্ম্মল হৃদয় হইয়া তোমাতে মজিয়া থাকিব ?"

মহাপ্রভু রামানন্দের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া ক্রমশঃ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—"রামানন্দ, আরও বল।"

রামানন্দ বলিলেন—"তবে সখাভাবে সাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ভাবেই ভগবান অর্জ্জুনের রথের সারথি হইয়াছিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে রাখালগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রেমই অতি দুর্ল্লভ নয় কি ?"

শ্রীচৈতন্য যেন তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না দেখিয়া, রামানন্দ বলিলেন—"বাৎসল্যভাব তবে সকলের শ্রেষ্ঠ! মা যশোদা যে ভাবে ভগবানের ভজনা করিতেন ?"

প্রভু বলিলেন—"ইহা উত্তম বটে, তবে ইহার উপরে আর কিছু আছে কি?"

রামানন্দ বলিলেন—"তবে মধুর ভাব। এই মধুর ভাবে ব্রজ-গোপীগণ তোমাকে বাঁধিয়াছেন। ব্রজগোপীদের মত অহৈতুকী প্রেম আর কাহারও নাই, নিজের সুখবাঞ্ছা বা কোন কামনা নাই, ভগবানকে সুখী করিবার জন্যই তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন প্রেম সাধনা আর কোথাও নাই।"

শ্রীচৈতন্য রামানন্দের মুখে ব্রজ-গোপীগণের প্রেমের কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া রায় রামানন্দ বলিলেন—"প্রভো! নারায়ণ যেমন ব্রহ্মাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ আমার চিত্তে নিজ শক্তির প্রেরণা করিয়া রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব শ্রবণ করিলে। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

প্রভু বলিলেন—"তুমি ভাগবত, সকল বস্তুতেই ইষ্টদর্শন করিয়া থাক। তোমার অজানিত কি আছে রামানন্দ!"

রামানন্দ বলিলেন—"প্রভো! আর কেন, মায়া ছাড়। তুমি যে কে, তাহা আমি চিনিয়াছি; এক্ষণে আমার প্রতি কৃপা কর।"

তখন প্রভু হাসিতে হাসিতে ভক্তশ্রেষ্ঠ রামানন্দ রায়ের হৃদয়-সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিলেন। ভক্তপ্রধান রামানন্দ ইষ্টমূর্ত্তি দেখিয়া চরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ সকলে প্রাণ ভরিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

এইরূপে শ্রীচৈতন্য দেশকে ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন।

যাহা চায়—যাহা পাইলে হৃদয় সন্তুষ্ট হয়—অন্তর্যামী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাহাকে তাহাই দেখাইতে লাগিলেন। মুসলমান রাজার প্রবল প্রতাপে, হিন্দুধর্ম্মের তথা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দুর্গতির দিনে তাপে ভরা আত্মহারা মানবকে তিনি ভক্তিপথের পথিক করিয়া, সমস্ত ভারতে ভক্তির বাণ ডাকাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল ঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥

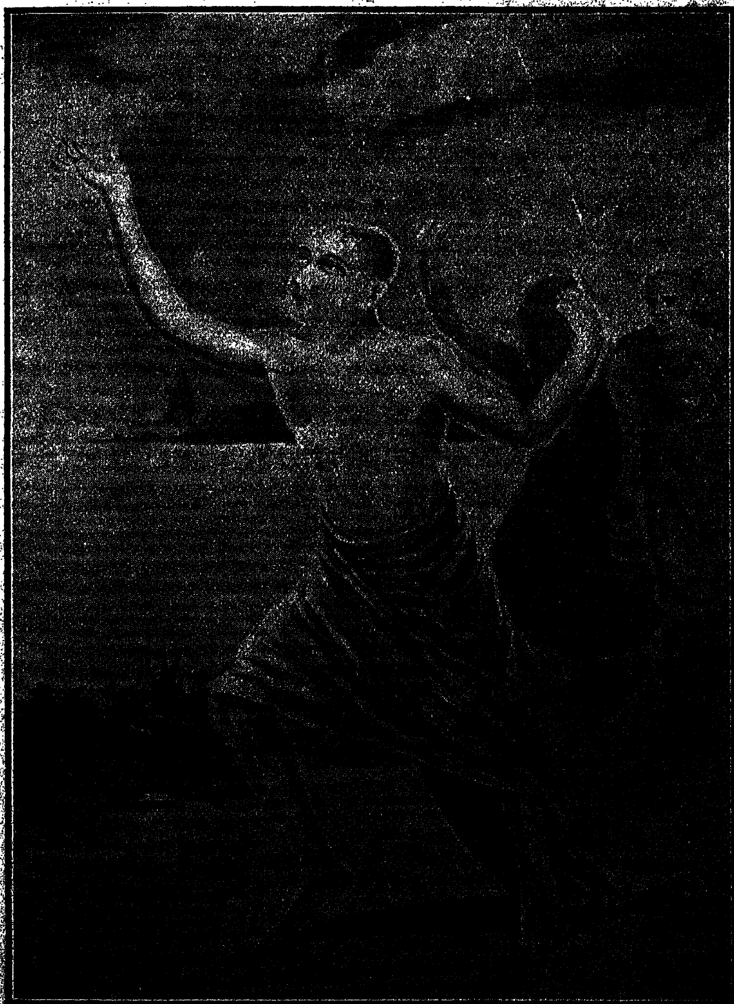
তৃণের মত সুনীচ হইয়া আর্ত্তের সেবা, জীবে দয়া প্রদর্শন না করিলে—হরিনামে রুচি হয় না। যেখানে অহঙ্কার—সেইখানেই কার্য্যহানী। অহঙ্কারীর ধর্ম্ম হয় না—তাহারা কখন মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যেখানে দীনতা—সহিষ্ণুতা, সেইখানেই ধর্ম্ম বিরাজমান। এইজন্য পাণ্ডব-জননী কুন্তিদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট দীনতাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই দীনতা-হীনতা এবং দরিদ্রতা থাকিলে, সদাই ভগবানকে মনে পড়িবে। তাই ধর্ম্ম উপার্জ্জনে অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

অহঙ্কারী রাজা, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের মুক্তি নাই; তাহারা মুক্তি-পথের পথিক হইতে পারে না। রাজা ধনের অহঙ্কারে মত্ত, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত এবং পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে মত্ত বলিয়া তাহারা অন্তিমে উত্তমাগতি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এইজন্য শাক্যসিংহ রাজপুত্র হইয়াও জীব-সেবার জন্য—তাহাদের দুঃখকষ্ট মোচনের জন্য রাজভোগ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী

হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্য করতলগত করিতে পারিতেন, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য এমন উৎকট বৈরাগ্য যে, এই সকল বিষয়ে একেবারে জলাঞ্জলী দিয়া তিনি ভিখারী সাজিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য—জগতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারিতেন? ভোগ-বিলাসে, জাগতিক উন্নতির পথে তিনি মনে করিলে সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন কিন্তু মর্ত্ত্যবাসী জীবের জন্য তাঁহার প্রাণ এমন কাঁদিয়া উঠিল—হৃদয় এমন শোকাবেগে আকুল হইয়া উঠিল যে, এত মান-সম্ভ্রম—এত বিলাস-আয়াস—এমন লক্ষ্মীস্বরূপা সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী ভার্য্যা—এমন স্নেহময়ী জননী—এমন শান্তিময় আবাস-ভবন ছাড়িয়া তিনি ভিখারীর বেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, ভুবনপাবন হরিনাম বিতরণ করত জীবের পরকাল নিস্তারের উপায় বিধান করিতে লাগিলেন। স্বয়ং শ্রীহরির অবতার হইয়া হরিনামে পাগল হইলেন; অশান্তি-গরলে অমৃতের স্নিগ্ধ-সিঞ্চন প্রদান করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গের মধুরতায় পূর্ণ করিয়া দিলেন। ভক্তগণ অকূলে কূল পাইয়া ধন্য হইল।

ভাবোন্মাদ।



পাগলের পারা গোরা কোথা কৃষ্ণ বলে।
দিশাহারা হয়ে ছুটে সমুদ্রের পানে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিনাম।

হরিনামামৃত-সিন্ধু মন্থন করিয়া ভগবান শ্রীচৈতন্য নামের তরণী লইয়া ডাকিলেন—"আয় পাপী, তাপী, ব্যথিত, মর্ম্মাহত জীব—কে কোথায় আছিস্ আয; আমি হরিনামের তরী আনিয়াছি, অবহেলায় কে ভবাব্ধী পারে যাবি আয়!" পাগলপারা শ্রীচৈতন্য দিশাহারা হইয়া নীলাচলে সমুদ্রের তীরে কেবল ডাকিয়া বেড়াইতেছেন আর লোকের হাতে ধরিয়া—বুকে করিয়া অজস্রুবে কাঁদিয়া বলিতেছেন—'বল ভাই! হরি হরি বোল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল। জীব! এ তরণী আরোহণ করিয়া পারে যাইতে হইলে কড়ি দিতে হয় না, মুখে কেবল হরিধ্বনি' করিলেই এই নাম-তরণী তোমাকে অবহেলায় বৈকুণ্ঠের দ্বারে লইয়া যাইবে। কলির মানব! ভবের মায়াতে ভুলিয়া এমন সুযোগ-সৌভাগ্য ত্যাগ করিও না; এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া হরিনাম করিতে অবহেলা করিও না। ভাই! মধুর হরিনাম নিজে কর, পরকে করিতে বল, অবিরল এই হরিনাম করিয়া হরিময় জগৎ দেখ। ভাই! হীরক-স্ফটীক প্রভৃতি বহুমূল্য ধনরত্ন যত্ন করিয়া রাখিয়া কি হইবে? তাহা ত পরকালে তোমার সঙ্গে যাইবে না; সেই দুর্গম পথে ইহারা তোমার কোন প্রকার সাহায্য করিবে না। সেই পরমরতন নিত্যধন হরিনাম বরং হৃদয়-মন্দিরে যত্নে তুলিয়া রাখ, যাহা তোমার ইহ-পরকালে,

সম্পদে ও বিপদে সমান ইষ্টকারক হইবে। নামী হইতেও নামের মাহাত্ম্য বেশী, তাই প্রভু শ্রীচৈতন্য আজ নিজে হরিনাম করিয়া পাগল হইয়াছেন, অহঙ্কার মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া, নীলাচলের সকল স্থানে—সকলের নিকট কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন। ছোট বড, ভদ্র-অভদ্র, দীন দুঃখী তাঁহার জ্ঞান নাই, যেখানেই হরিধ্বনি—শ্রীচৈতন্য সেইখানেই গমন করিয়া নৃত্যে রত হইতেন। সকলেই তাঁহাকে বেড়িয়া আকুল কণ্ঠে বলিতেছেন—"নাচেরে গৌরাঙ্গ নাচে সংকীর্ত্তনের মাঝে।' প্রভু নাচিতেছেন, সময়ে সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন, চক্ষের পলক নাই, কিন্তু অধরোষ্ঠ মৃদু মৃদু নড়িতেছে নামগানে যেন তাহাদের বিরতি নাই। এমনি করিয়া নাম না করিলে কি সাধনা হয়?

যেখানে সংকীর্ত্তন হইতেছে, সেখানেই জীবের চৈতন্যোদয় হইতেছে, তাই তাহারা নামে উন্মত্ত হইয়াছে। তাহার উপর স্বয়ং চৈতন্যদেব জগতের যাবতীয় সজীবতা লইয়া যখন সংকীর্ত্তনের প্রাণরূপে তথায় আত্মাহারা হইয়া নামরসে গলিয়া যাইতেছেন, তখন সেই প্রেমের স্রোতে যে পড়িতেছে—হাজার কঠিন হৃদয় হইলেও সে না গলিয়া থাকিতে পারে কি? জগতের আত্মা—প্রাণরূপী স্বয়ং মহাপ্রভু দ্রব হইলে শিষ্যগণ যে দ্রব হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

ভগবান নিজের নামে নিজেই গলিয়া যান। একদিন বৈকুণ্ঠে ভগবান মহাদেব সিদ্ধিদাতা গণপতির সহিত খোল করতাল সংযোগে প্রাণারাম কীর্ত্তন করিয়া প্রভুকে এমনি গলাইয়াছিলেন—এমন ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, আজও তাহার কীর্ত্তি জগতীতলে অতুল।

দেবাদিদেবের মুখে হরিনাম শুনিয়া শ্রীহরি এমন বিগলিত হইয়াছিলেন যে, তাহাতেই পতিতোদ্ধারিণী জীব-নিস্তারিণী মা জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়া আজও পতিত-জীবের গতিমুক্তি প্রদান করিতেছেন। যেখানে হরিনাম হয়, সেখানেই যে চৈতন্যময় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন; তিনি হরিভক্ত নারদকেও তাই প্রাণ খুলিয়া অভয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন—"নারদ! কোন চিন্তা নাই, আমি তোমাদের ছাড়া নই।"

নাহং তিষ্ঠামী বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামী নারদ॥

ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত এই প্রতিজ্ঞা-বাণীর কি কখনও অন্যথা হয়? তাই প্রভু চৈতন্য অবতারে স্বয়ং সংকীর্ত্তনের মাঝে "হরিবোলে আমার গৌর নাচে—নাচেরে গৌরাঙ্গ নাচে" বলিয়া তাথৈ তাথৈ ভাবে নাচিয়া ধরাতল কম্পিত করিতেছেন।

একদিন ভক্তবার রাজা প্রতাপরুদ্রের চৈতন্য মন্দিরে সংকীর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছে। ভক্তবর প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যকে পূর্ণব্রহ্ম ইষ্ট-দেবতা জ্ঞানে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মন্দিরে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীপাঠ নবদ্বীপ হইতে বহু ভক্ত আসিয়া সময়ে সময়ে প্রতাপরুদ্রের প্রতিষ্ঠিত এই মূর্ত্তির পূজা করেন এবং ভোগ দিয়া প্রসাদ পান; আর রাজা স্বয়ং ত সমস্ত বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া ঐ পথের পথিক হইয়াছেন। মুক্তিকামী রাজা মুক্তির জন্য অতি দীন-হীনের মত দরিদ্রের সেবা করিতেছেন, যাবতীয় বৈষ্ণব-লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত হইয়া মহাপ্রভুর পূজায় রতিমতি স্থির করিয়াছেন। আজ এই ভক্ত-সম্মিলনীতে মহাপ্রভুর

পদার্পণ হইবে, তাই সকলেই করযোড়ে দণ্ডায়মান, প্রভু ভাবে গদগদ হইয়া আপন বাসগৃহ হইতে হেলিতে দুলিতে বাহির হইয়াছেন।

এমন সময় দেখা গেল যে একটা চণ্ডাল লগুড় লইয়া একটা কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, অস্পর্শীয় কুকুর প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চৈতন্যদেবের পদতলে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সে কথা কহিতে জানে না, তথাপি তাহার ভীত চকিত নয়ন—তাহার আকুলি-বিকুলি পদলেহন দেখিয়া, ভগবান শ্রীচৈতন্য তাহার মনের ভাব, প্রাণের ভয় বেদনা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বুকে আবরিয়া ধরিলেন, অভয় দিয়া তাহার গাত্রে কোমল হস্তপদ্ম বুলাইয়া শীতল করিতে লাগিলেন। জীব-জীবন প্রভু চৈতন্যের প্রাণ আজ নিকৃষ্ট জীব কুকুরের দুঃখে গলিয়া গেল।

ইত্যবসরে চণ্ডাল লাঠী হস্তে চৈতন্যের নিকট আসিয়া বলিল—"এ সাধু! তুমি সাধু হইয়া বিষ্ঠাভোজী কুকুরকে স্পর্শ করিয়াছ? ছাড়িয়া দাও, আমি উহাকে মারিয়া ফেলিব। ও আমার প্রাণে বড় দাগা দিয়াছে, আমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়াছে—সমস্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। এই মধ্যাহ্ন সময়ে আর আমার উপায় নাই, তুমি ছাড়—আমি উহাকে দেখিব।"

কুকুরটী সেই লগুড় হস্তে যমসম ঘাতুককে দেখিয়া থর থর কাঁপিয়া আরও দৃঢ়ভাবে চৈতন্যের কোলে লুকাইতে লাগিল। প্রভু বলিলেন—"ঘাতুক! এই দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সকল জীবেরই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। তুমি অন্ন রাখিয়াছিলে—ও বুদ্ধিহীন জীব, না বুঝিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, আহার ত উহারও দরকার? তবে তোমার আহার হয়

নাই। আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে চল—তোমায় চব্য চূষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়া আহার করাইব।"

চণ্ডাল মনে করিল—চৈতন্য বুঝি সামান্য ভিখারী, রাজবাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া আমায় খাওয়াইবে। সেই কোথায় খায় তার ঠিক নাই, তার উপর আবার আমায় খাওয়াইবে। চণ্ডাল রাগত স্বরে বলিল—"আর বুজরুকী কর্ত্তে হবে না, তুমি ছাড়—আমি ওর প্রতিশোধ লইব।"

ভগবান শ্রীচৈতন্য বলিলেন—"না ভাই, ও যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তখন আমি উহাকে কিছুতেই ছাড়িব না। যদি এতই আক্রোশ হইয়া থাকে, তবে উহার প্রাণ বিনিময়ে আমার প্রাণ গ্রহণ কর।"

চণ্ডাল তখন ক্ষুৎপিপাসায় অন্ধ হইয়াছে, সে বুঝিতে পারিল না যে, আর্ত্তের সহায়—হীন কুকুরের বন্ধু এই মহাপ্রাণ মানবটী কে! আর চণ্ডালের এমন সুকৃতিই বা কোথায়! সে রাগান্বিত হইয়া সজোরে প্রভুর দেহেই আঘাত করিল, শ্রীচৈতন্যের সোণার দেহ ফাটিয়া রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তথাপি নিরভিমান—সহিষ্ণুতার প্রত্যক্ষ অবতার প্রভুর মনে রাগের কিছুমাত্র আবির্ভাব হইল না। রক্তধারা বহিতেছে, তথাপি প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভাই ঘাতুক। প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে ত, এইবার জীবটীকে ক্ষমা কর। উহাকে উহার গন্তব্য স্থানে যাইতে দাও—আর হিংসা করিও না।"

প্রভুর মলিনতা হীন হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া চণ্ডাল স্তম্ভিত হইল, জীব-নিস্তারণ প্রভুর আকর্ষণী শক্তি এবার চণ্ডালের কঠিন প্রাণ আকৃষ্ট করিল। সকলেরই একটা সীমা আছে, পাষাণ হৃদয় চণ্ডালের রাগ হইয়াছিল, কিন্তু জীবের প্রতি প্রভুর অপরিসীম দয়া দেখিয়া সে আর থাকিতে

পাবিল না—তাহাব ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুাবয়া গেল। সে প্রভুব চবণতলে পড়িয়া বলিল—'কে তুমি দযাময়। মানুষ'ত নয়, নিশ্চয়ই দেবতা। নতুবা বিনা অপবাধে এত নির্য্যাতন কি কেহ সহিতে পাবে? প্রভু! আমার মোহ ঘুচিয়াছে, কোন্ মহাপুরুষ তুমি, জগতেব হিতেব জন্য এমন সাধুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমাব অজ্ঞান অন্ধকাবময় জীবনেব পথে এমন জ্ঞানালোক ছড়াইতে কে তুমি আসিয়াছ প্রভু। পায়ে পড়ি ক্ষমা কব, আমি অতি অক্লান্ত—অধম—হীন চণ্ডালজাতি। কিসে পবিত্রাণ পাবো—কিসে তোমাব মত হবো, আমাকে বলে দাও প্রভু।"

শ্রীচৈতন্যেব উদাব হৃদয়ে প্রেমের উৎস উৎসাবিত হইল, তিনি পদে পতিত চণ্ডালকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"বৎস। আজ তোদেব জন্য দীনহীন আমি মুক্তির সম্বল হবিনাম আনিয়াছি, পবিত্রাণের ভাবনা কি বাপ। বদন ভরে বল, হরি হরি বোল—ভুবন মঙ্গল হরি বোল।"

ঘাতুক শ্রীভগবান চৈতন্যেব বাহু বেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া, অগাধ প্রেমভরে দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল—"কে কোথা আছিস্ দেখ, আজ গোলকের হবি ভূলোকে এসে, তোদেব জন্য হরিনাম বিলইতেছে। আয—নেচে এসে বল, প্রেমে গলে বল—হরিবোল।"

নিত্যানন্দ বাজবাটীতে বিবাট সংকীর্ত্তনের আয়োজন শুনিয়া আজ নীলচলে আসিয়াছিলেন। সেদিন যে দরজী প্রভুব ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, সেও আজ সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছে। নিতাই ও দরজী প্রভুর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া আগ্‌বাড়াইয়া তাঁহাকে লইতে আসিতেছেন। এমন সময় পথে

প্রভুর প্রেমলীলা দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন—"চৈতন্য অবতারে জাবোদ্ধারের জন্য নির্য্যাতন সহ্য করাই বুঝি বিশিষ্টতা? জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জয়, আজ প্রভু জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় আরও একজন মহাপাপী অধম চণ্ডালকে আলিঙ্গন দিয়া নিজের মহা-মহত্ত্ব পরিবর্দ্ধিত করিলেন। ধন্য! ধন্য দয়ার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ।"

প্রভু চণ্ডালকে রাজসভায় সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতে অনুমতি করিলেন। রাজবাটীতে যাইতে চণ্ডালের সাহসে কুলায় না, সে যাইবার জন্য পা বাড়াইতে পারিল না, কারণ সে জানিত যে, প্রভুর প্রতি তাহার তাড়নার কথা জানিতে পারিলে তাহার আর নিস্তার থাকিবে না, তাই সে যাইতে অস্বীকার করিল। প্রভু বলিলেন—"ভাই! চণ্ডালে কোল দেওয়া—তাহার সহিত মিত্রতা করা, আজ আমার নূতন নয়, ত্রেতাবতারে গুহক চণ্ডালই আমার প্রধান বন্ধু ছিল। ভাই চণ্ডাল! তুমি আমার মিতার স্বজাতি, তবে আবার পর হইতেছ কেন?"

চণ্ডালের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে তাহার নয়নে দরবিগলিত প্রেমধারা বহিতে লাগিল, অনুতাপ-অশ্রুজলের প্রবল প্রবাহে সে অভিষিক্ত হইল। প্রভু তাহাকে পতিতপাবন হরিনামের পবিত্র প্রেমজলে ধৌত করিয়া নিষ্পাপ করতঃ সভার মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। রাজা, রাজ-সভাপণ্ডিত প্রভৃতি মহা মহা রথীগণ প্রভুর এই মহাভক্তকে আলিঙ্গন দান করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনের বিরাট আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বহুলোক সমাগম হইতে লাগিল। আজ এ বিরাট সংকীর্ত্তন করিতে লোকবিচার নাই; অধিকারী-অনধিকারী ভেদ নাই। হরিনাম সাধনে

সকলেরই সমান অধিকার। তুমি পাষণ্ড, তুমি পাতকী, জ্ঞান-যোগাদির অধিকার তোমার নাই বলিয়া নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। পাষণ্ড-দলন, পাপী-নিস্তারণ এই নাম—প্রাণ ভরিয়া উচ্চারণ কর—দেখিবে, দেবদুর্লভ-আনন্দ-নিকেতন স্বর্গরাজ্য তোমার নিকট হইয়া আসিবে। তুমি অবহেলা করিয়া অথবা অশ্রদ্ধার সহিত যদি "হরি" এই দ্ব্যক্ষর যুক্ত নামটী অল্পক্ষণ উচ্চারণ কর—তাহা হইলে তোমার সমস্ত পাপ তাপ নষ্ট হইবে। তুমি জন্মজন্মান্তরের বহুতর দুষ্কৃতি ভারে কাতর হইলেও, এই নাম সেই সমস্ত কাতরতা নষ্ট করিয়া তোমায় অসীম শান্তি সলিলে অবগাহন করাইবে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের এমন মহামহৌষধ আর নাই। নদীয়াবতার শ্রীচৈতন্য জীবের মুক্তির জন্য এই আয়াসলভ্য সরল পথ আবিষ্কার করিয়া, জীবকে কাতর প্রাণে ডাকিতেছেন। প্রভু নিজে নামী হইয়া নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। কলির মানব! তুমি আজ ধন্য হইলে!

পূর্ব্বে স্বর্গে-মর্ত্তে হরিনাম-কীর্ত্তন প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এমন রসভরা নগর-কীর্ত্তন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই দেশে প্রচারিত হইয়াছে। সদলবলে নগরে নগরে গমন করিয়া প্রভু জীব উদ্ধার করিতেন—দেশের আধিব্যাধি বিনাশ করিতেন—লোকের প্রাণে শান্তি সুধাধারা ছড়াইয়া দিতেন বলিয়া তাঁহার কীর্ত্তন নগর-কীর্ত্তন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রভু নিজে এই দলের নেতা হইয়া অতি দীনহীনের মত নগরে নগরে ফিরিয়া, অযাচিত ভাবে এই অমূল্য হরিনাম বিলাইয়া আসিতেছেন। রাজা, মহারাজা হইতে অতি দীন-দরিদ্রের

কুটীব পর্য্যন্ত প্রভু পদব্রজে নামগান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ কবিতেন। পূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্ম-প্রচার কায্য ঘুবিয়া ফিবিয়া নগবে নগবে কবিবাব প্রথা ছিল না, বৈদিক যুগে নৈমিষাবণ্য প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে ঋষিগণ সমবেত হইয়া স্বত গোস্বামীব মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতেন। তাবপব বেদিতে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ গীতা, ভাগবতাদি গ্রন্থ ব্যাখা কবিতেন এবং কথকতা কবিয়াও অনেক পণ্ডিত ধর্ম্মকথা প্রচাব কবিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতাদি দ্বাবা প্রচার-কায্য বা কীর্ত্তনানন্দ দ্বাবা মুগ্ধ করিয়া নামে রুচি আনয়ন কবা কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গ ভাষার পুষ্টিসাধন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই বিশেষরূপে সংসাধিত হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যই বঙ্গভাষাকে পরিমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। তাহার পব হইতে এদেশে বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও কবি জন্মগ্রহণ করতঃ, ভাষা-জননীর সেবায় প্রাণপাত করিয়া আজ তাঁহাকে সমগ্রদেশে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন।

প্রভু হরিনামে যে অমোঘশক্তি প্রদান কবিয়া উদ্বোধিত কবিয়া গিয়াছিলেন, পববর্ত্তী কালে অনেক বৈষ্ণব-কবি তাঁহাদের কাব্যে সেই অমিয় মধুর নাম লিপিবদ্ধ করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন—দেশকে ধন্য করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য নগর কীর্ত্তনে অবতীর্ণ হইয়া নাচিয়া গাহিয়া নামগান করিতেন। প্রভুর মুখে সে নাম যে শুনিত, সেই আত্মাহারা হইয়া নামবসে মজিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত, গৃহ-সংসার ছাড়িয়া পাগলের মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। ভবভয়ে ভীত, দুঃখ-সন্তাপ-সন্তপ্ত জীব কিসে নিস্তার পাইবে—দুস্তর ভব-জলধী উত্তীর্ণ হইবে, তাহার

চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইত। চৈতন্য-চরণে পড়িয়া যখন তাহার উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিত, তখন তিনি নাচিয়া গাহিয়া বলিতেন—"ভাই। ভয় কিসের? ভবজলধি গোষ্পাদের ন্যায় উত্তীর্ণ হইবে—একবার প্রাণ ভরিয়া নাচিয়া গাহিয়া বল—হরি হরিবোল।"

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাসীর বেশে কটীতটে নামাবলী বাঁধিয়া—গলায় হরিনামের মালা পরিয়া প্রেমচকিত নয়নে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেন, তখন সকলে দেখিত যে, প্রেমের গৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে জীবের উদ্ধার সাধন করিতে মর্ত্তে অবতীর্ণ। তাঁহার এ নাম—বাস্তবিক ভবার্ণব উদ্ধারের তরণী; তিনি কর্ণধার রূপে দাড়াইয়া জীবকে অবহেলায়—এই ভীষণ আবর্ত্ত-সঙ্কুল মহাসাগর উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছেন।

মহাপ্রভু দলবল লইয়া নানাস্থানে নাম প্রচার করিয়া দেশ উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন; হরিনামের স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ধর্ম্মের যেমন গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল—মানব যেমন ধর্ম্মভাব পরিত্যাগ করিয়া অধার্ম্মিক পশুরূপে পরিণত হইয়াছিল, মহাপ্রভুর কৃপায় সেই দেশ, সেই দেশের মানুষ আবার তেমনি ধর্ম্মে মাতিয়া উঠিল। উন্মত্ত হইয়া সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র কেবল নামগান করিতে লাগিল। মুসলমানগণ আর তাহাদের এ প্রবল শক্তিকে বাধা দিতে পারিল না। শাক্ত-বৈষ্ণব যখন একভাবে বিভোর—তখন বাধা দেয় কার সাধ্য? ধর্ম্মভাবে একতা সাধন হইলে তাহা আর বাধা পাইবার নয়। স্বকার্য্য সাধন করিয়া, মহাপ্রভু এইবার নীলাচলে স্থির হইয়া বসিলেন এবং তাঁহার শক্তি-সঞ্চালিত ভক্তগণ কার্য্য করিতে লাগিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রয়াণ।

পঁচিশ বৎসর বয়সে মহাপ্রাণ চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশের কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ কাল অনন্যকর্ম্মা হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নাম প্রচার করিলেন।

এইবার প্রভু দেশান্তর হইতে নীলাচলে পুনরাগমন করিয়া শিষ্যদের প্রতি প্রচার-কার্য্যের ভার দিয়া সুস্থির হইলেন; অহরহঃ ভাব-বিভোর হইতে লাগিলেন। চৈতন্যের কখন চৈতন্য থাকে, কখনও চৈতন্য থাকে না। সকলেই বুঝিল—প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা, এই অবস্থাই লীলার চরমাবস্থা! যখন চৈতন্য থাকে না—তখন প্রাণহীনের মত পড়িয়া থাকেন, যখন সমাধি ভঙ্গ হয়, চৈতন্যের সঞ্চার হয়—তখন প্রলাপ বকিতে থাকেন। কখন "রাধা রাধা" বলিয়া চীৎকার করেন, কখনও বা কৃষ্ণ বিরহে একান্ত কাতর হইয়া "হা প্রভু—হা প্রাণনাথ" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। এ বিরহ রমণীর পতি-বিরহ অপেক্ষাও ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। ভক্তগণ সে যন্ত্রণা দেখিয়া এবং প্রভুর সেই প্রাণফাটা রোদন শুনিয়া কত সান্ত্বনা প্রদান করেন; কিন্তু সে বিরহ-বেদনা কি কথার সান্ত্বনায় মোচন হয়?

এক একদিন উন্মাদ অবস্থায় ভক্তদের অলক্ষিতে প্রভু কোথায় চলিয়া যান; ভক্তগণ বহু অন্বেষণ করিয়া আবার ধরিয়া আনেন—গৃহাবদ্ধ

করিয়া রাখিয়া দেন। কিন্তু কতক্ষণ, চক্ষের অন্তরাল হইলেই প্রভু আর গৃহে নাই। প্রভু এতদিন দেশান্তরে ছিলেন, এক্ষণে পুনরায় নীলাচলে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, নদীয়া হইতে ভক্তগণ তাঁহার দর্শনে আসিলেন। নিত্যানন্দ, মুরারী, রঘুনাথ প্রভৃতি সকলেই আসিয়া প্রভুর চরণ সমীপে উপস্থিত হইল; সমস্ত শ্রীপাট হইতে দলে দলে ভক্তগণ প্রভু দর্শনে সমুপস্থিত। কিন্তু কি জানি কেন—আজ তাহাদের প্রাণ উদভ্রান্ত হইয়াছে, যেন তাহারা আনন্দের মধ্যে কি এক বিষাদের ছায়া দর্শন করিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছেন। প্রভু আজ কোথায় গিয়াছেন তাহার সন্ধান নাই!

কিছুদিন হইল চৈতন্যের জননী শচীদেবী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর মৃত্যুর পর, স্ত্রীলোকের আরাধ্য ধন স্বামীর পাদুকা-পূজায় তন্ময় হইয়াছেন; আহার নিদ্রা তাঁহার এক প্রকার ঘুচিয়া গিয়াছে। স্বামীর মূর্ত্তি গড়িয়া পাদুকা দুখানি সম্মুখে রাখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী দিবারাত্র মনেপ্রাণে তাঁহারই উপাসনা-ভজনা করিতেছেন। তিনি যে আর বেশী দিন ধরাধামে থাকিবেন না—ইহা স্থির জানিয়াছেন; তাই দেবতাসমীপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন—প্রভু! তুমি ধরাধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই যেন আমি ধরাধাম পরিত্যাগ করিতে পারি। সধবা হইয়া সীমন্তে সিন্দুর লইয়া—তোমার স্বরূপ-মূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে আমার জীবাত্মা যেন তোমার শ্রীচরণে লীন হয়। প্রভু! কৃপাময়, দাসীর এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিও।”

ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোবাসনা অপূর্ণ রাখেন না; তাই

াঝ বিষ্ণুপ্রিয়ার শরীর ভাবিয়া ভাবিয়া কঙ্কালসার হইয়াছে। তথাপি স আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিলে—তাঁহার বদনের সে প্রফুল্লতা দেখিলে, ক বলিবে—তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। কে বলিবে—দেবী আজ জগৎ আঁধার করিয়া এত শীঘ্র অনন্ত-শয়ন করিবেন? সেদিন সঙ্গিনীগণ অনেক রাত্রি অবধি তাঁহার নিকট বসিয়া কত গল্প-গুজব করিল; দেবীও সহাস্য বদনে সকলের প্রীতি সম্পাদন করিলেন। তারপর তাহারা সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। অপর গৃহে কেবল একজন মাত্র দাসী নিদ্রিত রহিল। বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন সময়ে কাহাকেও কাছে লইয়া শুইতেন না। পরপুরুষের মুখদর্শন ত তিনি বহুদিন ত্যাগ করিয়াছিলেন, এতদিন কেবলমাত্র নিতাইকে পুত্রের মত দেখিতেন। নিতাইও আজ কয়েক দিন গৃহে নাই, সেও ত পাগল—পাগলের শিষ্য পাগল হইবে না ত কি?

কোন স্ত্রীলোককেও তিনি কাছে রাখিতেন না, কারণ তিনিও অনেক সময় ভাবে বিভোর থাকিতেন। পাছে সে ভাব দেখিয়া ব্যাধির লক্ষণ ভাবিয়া সঙ্গিনীগণ আকুল হয়—এইজন্য রজনীযোগে শয়নের সময় তিনি একাকিনীই থাকিতেন। দেবী গৃহে শয়ন করিয়াছেন—তাঁহার প্রাণ আজ পুলকিত এবং মন পরমানন্দিত। তিনি শয়ন করিয়া স্বামীর শ্রীচরণ ধ্যানে তন্ময় হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—"প্রভু! তোমার বিরহ-বেদনা আর সহ্য করিতে পারি না, দাসীকে চরণে স্থান দাও—আর কষ্ট দিও না।"

প্রাণের ডাক প্রাণের দেবতার কাণে পৌঁছিল। কষ্টহারী শ্রীমধুসূদন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব-দেহে বিষ্ণুপ্রিয়ার গৃহে উদয় হইয়া বলিলেন—উঠ, উঠ, প্রাণপ্রিয়া—উঠ চন্দ্রাননি! শ্রীকৃষ্ণ অবতারে শ্রীরাধারূপে তুমি

আমার লীলারসে রসময়ী হইয়াছিলে, এ গৌর অবতারেও তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সেই রসে রসিত হইয়া আমার নবদ্বীপ লীলার চরমোৎকর্ষ দেখাইলে। দেবী! লীলাবসানের সময় হইয়াছে, তুমি মহাপ্রয়াণ কর আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। রজনীযোগে শেষ সন্মিলনে সন্মিলিতা হইয়া সতী অনন্তধামে গমন করিলেন। পরদিন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে সকলে হায় হায় করিতে লাগিল।

জননী, পত্নী চলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু ব্যথিত অন্তরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীধামে কাশী মিশ্রের বাটীতে আসিলেন। সে সময় বর্ষাকাল, নবদ্বীপের ভক্তগণ আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিল এবং জননীর ও পত্নীর মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। প্রভু "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" এই সকল সংবাদ তিনি ইতিপূর্ব্বে মনে প্রাণে জানিয়াছেন, কাজেই সামান্য মনুষ্যের মত অধীর না হইয়া কিয়ৎক্ষণ সংকীর্ত্তন করিলেন, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়া ভক্তগণ মনে মনে কোন ভাবী বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন, ভক্তগণ ভ্রান্তভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মহাপ্রভু একেবারে মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া উঁকী ঝুঁকী মারিতে লাগিলেন। আশা মিটাইয়া যেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বদন দেখিতে পাইতেছেন না, এইজন্য মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা। ইহার পূর্ব্বে কতবার প্রভু জগন্নাথ দর্শনে অসিয়াছেন, কিন্তু কখন মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। আজ প্রভুকে আগ্রহ সহকারে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক দেখিয়া ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত চিত্তে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া প্রভু গরুড়স্তম্ভ কখনও পার হন না,

একান্ত আবশ্যক হইলে ঐ স্তম্ভের নিকট হইতে দেবদর্শন করিয়া চলিয়া যান। আজ প্রভু জগন্নাথের সম্মুখে যাইবার জন্য ব্যগ্র কেন? সঙ্গিগণ অন্তরে বিস্ময় এবং হৃদয়ে উদ্বেগ লইয়া সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভু অগ্রে, ভক্তগণ পশ্চাতে; প্রভু যেমন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের সম্মুখীন হইয়াছেন, অমনি কি জানি কোন্ দৈবমায়া বলে, সহসা দ্বার আপনি সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ আরও বিস্মিতচিত্তে অবাক্ হইয়া বহির্দ্দিকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেদিন রবিবার সপ্তমি তিথি—বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর হইয়াছে। চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, কলির দেবতা দারুমূর্ত্তি জগন্নাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কি করিতেছেন — ভক্তগণ তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। কারণ ইতিমধ্যে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; বহু চেষ্টায়ও তাহা খোলা যায় নাই। এমন সময় মন্দির মধ্যে অত্যন্ত কলরব হইতে লাগিল, বাহিরে ভক্তগণ মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন। তবে কি ভিতরে প্রভুর কোনও বিপদ হইল?

গুঞ্জবাড়ীতে একজন পাণ্ডা অবাক্ হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছিল। প্রভু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতার সম্মুখে কাতর হৃদয়ে নিবেদন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে তাঁহার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাই এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম:—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত স্মরণ॥

মরি মরি! অধমতারণ প্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিতে যাইতেছেন, তথাপি তিনি মর্ত্ত্যবাসীর দুঃখের কথা ভুলিতে পারেন নাই। পাণ্ডা দেখিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথদেবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সেই দারুময় পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পুরীধাম সকল তীর্থের সার, আজকাল কলের গাড়ী হইয়া সকলেই তথায় যায় বটে, কিন্তু পুরীতীর্থ শেষ তীর্থ। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মানব না হইলে, এ তীর্থে যথার্থ ফললাভ করিতে পারে না। পুরীতে কিনা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইতে হইবে—ভগবানকে তন্ময়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাতে লীন হইতে হইবে। এ মূর্ত্তি শুধু চক্ষে দেখিয়া আসিয়া আবার গৃহে ফিরিয়া যাহারা পুনরায় পাপ কর্ম্মে মত্ত হয়—তাহাদের পক্ষে পুরী যাওয়া না যাওয়া দুই-ই সমান। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে লীন হইয়া গেলেন। পাণ্ডাঠাকুর প্রভুকে চিনিয়াছিলেন, হঠাৎ দুই মূর্ত্তি এক হইয়া যাওয়ায়, তিনি ভীষণ ভাবে গোলমাল করিয়া উঠিলেন—চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এরূপ অপূর্ব্ব ব্যাপার তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই; কি সৌভাগ্যবলে যে তাঁহার আজ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে মানব-চক্ষের সার্থকতা লাভ হইল—তাহা ভগবানই জানেন। তিনি আবেগভরে চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ভক্তগণ এতক্ষণ বাহিরেই ছিলেন, কিন্তু মন্দির মধ্যে কলরব শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। পাণ্ডা দ্বার খুলিয়া দিলে, ভক্তগণ তাহাদের হৃদয়ের দেবতা—প্রাণের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবকে মন্দির মধ্যে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু কোথায় গেলেন?"

পাণ্ডা যথাযথ বর্ণনা করিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। ভক্তগণ আশ্চর্য্যভাবে শ্রীমূর্ত্তিপানে চাহিয়া দেখিলেন—যেন জগন্নাথদেব চৈতন্ত-সম্মিলনে মাধুর্য্যময়, অপূর্ব্ব-অব্যক্ত ভাবময় এবং অপরূপ লাবণ্যময় হইয়া মৃদু মৃদু হাস্ত করিতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর লীলা সম্বরণের ব্যাপার দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল, কেহ চৈতন্ত-বিরহে অচৈতন্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে কোন কোন ভক্তের আর চৈতন্ত ফিরিয়া আসিল না, তাঁহারা চৈতন্তের সহগামী হইয়া মর্ত্ত্যের মায়া-মমতা কাটাইয়া চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন। যাহাদের কিছুক্ষণ পরে চৈতন্ত সঞ্চার হইল—তাহারা শোকদুঃখে হাহাকার করতঃ সেইদিন নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম অভিমুখে গমন করিলেন। ইহাদের মধ্যে নিতাই, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। নবদ্বীপে আর কেহ নাই; প্রভুর জননী এবং পত্নী পূর্ব্বেই মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, প্রভুও সকলকে ফাঁকী দিয়া চলিয়া গেলেন; তবে আর কিসেব জন্ত গৃহবাস? এখন প্রভুর নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তাঁহারা প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চন্দ্র সেই অমার প্রাণ।"

এই বলিয়া প্রেমময় গৌর-হরির মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহাদের হৃদয়ের ধনকে দেখিতে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্ত ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ-লীলা সম্বরণ করেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য লীলা-মাধুর্য্য সম্যকরূপে প্রকাশ করা আমার মত সংসারাসক্ত অজ্ঞ লেখকের পক্ষে অসাধ্য ত বটেই, উপরন্তু যথার্থ ভক্ত হইলেও সেই লীলারস প্রকাশ করিতে যাইয়া ভাবাবেশে এমন আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, বলিতে বলিতে জড়জিহ্বা জড়াইয়া যায়, ভাবের উচ্ছাসে কণ্ঠ অবশ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাঁহার পক্ষেও এ মধুর লীলা প্রকাশ করা অসম্ভব। সাক্ষাৎ গোলোকের হরি চৈতন্যরূপ ধরিয়া প্রেম-ভক্তির আধার, অমিয়-মধুর হরিনাম আনিয়া ঘরে ঘরে—নগরে নগরে বিলাইয়া গিয়াছেন। সেই হৃদয়োন্মাদকর, কলিকলুষ-নাশন নাম রসনায় উচ্চারণ করিলে, মনেপ্রাণে শান্তির সুধাধারা বর্ষিত হয়। ক্ষণকালের জন্য সমস্ত ভয়-ভাবনা, বিষয়-বেদনা ভুলিয়া চিত্ত শান্তি-সাগরে অবগাহন করে, সর্ব্বাঙ্গে এক অপূর্ব্ব তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া অসীম ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান করে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—তাঁহার সমগ্র উপদেশ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষ নিশ্চয়ই দেবত্ব লাভ করিতে পারে। হরিনামের মাহাত্ম্য যে কিরূপ এবং সংখ্যায় কত, তাহা বলিবার সাধ্য কাহারও নাই। এক হরিনামের মাহাত্ম্যই যখন অসংখ্য, চতুরানন চতুর্ম্মুখে, পঞ্চানন পঞ্চমুখে বর্ণনা করিতে অক্ষম, তখন বহু সংখ্যক নামের মাহাত্ম্য আমরা কলির নারকী-জীব হইয়া কি বলিব? তবে তিনি নাম গানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। যখন আমরা বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া—পাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, দুঃখ-দারিদ্র্যে মর্ম্মাহত হইয়া একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, তখন মহাপ্রভুই শান্তির আশ্বাস বাণী দিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"নাম গান করিও, ভবে আর কোন ভাবনাই থাকিবে না;

ইহা সংসারের সকল বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভের মহা মহৌষধ!" এস ভাই। আমরা হৃদয়ের কপাট খুলিয়া, মনপ্রাণ নির্ম্মল করিয়া বলি—হরি হরিবোল; বদন ভরিয়া বলি—হরি হরিবোল, প্রেমে বিগলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলি—ভুবন মঙ্গল হরিবোল। ভক্তের কাতর ক্রন্দন ব্রহ্মকটাহ ভেদ করিয়া ভক্তাধীনের চরণতলে পৌছিলে, ভবের কোনও ভাবনা—কোনও কামনা অপূর্ণ থাকিবে না। পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ ভাণ্ডারে ভক্তের জন্য সকলই পূর্ণভাবে অবস্থিত; বাঞ্ছাকল্পতরু তোমাদের সকল সাধ পূর্ণ করিয়া শাশ্বত শান্তি প্রদান করিবেন। এস, ভাব-বিভোর চিত্তে বলি :—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে॥

অনেকে বলেন—মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তিনি যে কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া "হা কৃষ্ণ, হা প্রাণকান্ত" বলিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; নীলাম্বু দেখিয়া যে প্রভুর নীলকান্তকে মনে পড়িয়াছিল এবং সেই অনন্ত পয়োধী মধ্যে তিনি যে তাঁহার হৃদয়-দেবতার অস্তিত্ব দেখিয়া অর্জ্জুনের মত—"পশ্যামীদেবাং তব দেবদেহে—" বলিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলেন—সে কথা কেহ বুঝে না; তাই তাহারা সমুদ্রে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া বিবৃত করেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে; জগন্নাথে লীন হইয়া যাওয়াই শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কথা। সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া জীবকে তিনি দেখাইলেন যে, কৃষ্ণ-বিরহে এইরূপ আত্মহারা হইতে না পারিলে, প্রাণেশ্বরের জন্য জীবনকে এইরূপ তুচ্ছ করিতে না শিখিলে—শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ সুদুর্লভ!

সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার কয়েক দণ্ড পরে তাঁহার মৃতবৎ অচৈতন্য দেহ ধীবরের জালে উঠিয়াছিল। ভক্তগণ তাঁহার অচৈতন্যাবস্থা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া অপনোদন করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে একদিন কোনও এক সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম—কোন এক অভক্ত-পাষণ্ড শাস্ত্র পাঠ না করিয়া, প্রভুকে "Insane পাগল" এবং তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল, কাজেই "চৈতন্য আবার অবতার কসে" বলিয়া ভুবনপাবন শচীনন্দনকে বৃথা আক্রমণ করিয়া আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছে। আচ্ছা, প্রভু যদি জলে ডুবিয়াই মরিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অবতার অথবা মহাপুরুষ হইতে পারেন না কেন—তাহার কারণ কি? আমরা সংসারের কৃমি-কীট, মৃত্যুর ভাল-মন্দ আমাদেরই দরকার, কারণ তাহা না হইলে মৃত্যুর পর লোকে টিটকারী মারিয়া বলিবে—"দেখেছ, বেটা কি অধার্ম্মিকই ছিল, মৃত্যুর সময় কত যন্ত্রণা পাইয়া মরিল।" এইজন্য কথায় কথায় আমরা বলিয়া থাকি—"জপতপ কর কি, ম'রতে জানলে হয়।" মৃত্যুর ভাল-মন্দ আমাদেরই দরকার, কিন্তু যাঁহারা জীবন বা মৃত্যু বলিয়া কোনও অবস্থাকেই ভয় করেন না—জীবন বা মৃত্যুকে যাঁহারা অবস্থান্তর বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা জানেন—আত্মা অজর-অমর, তাঁহারা এই পঞ্চভৌতিক দেহ নাশের জন্য এত ভাবনা করিবে কেন? ইহা ত যেরূপে হউক পঞ্চভূতে মিশিবেই। আচ্ছা, যদি শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু ঐরূপেই হইয়া থাকে এবং তাহা যদি অপঘাতই হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুকে আমরা কি বলিব? তিনি ত জরা ব্যাধ কর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া প্রভাসতীর্থের তীরে লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন,

তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুও ত পরম অপঘাত এবং তাঁহাকেও তাহা হইলে "শ্রীকৃষ্ণস্তু ভগবানস্বয়ং" এই আখ্যা না দিয়া, অবতারত্ব হইতে খারিজ করিয়া দিতে হয়। এই ত গেল শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর কথা।

যেদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ভক্তচূড়ামণি পরমহংসদেব Cancer হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিয়াছিলেন? আধুনিক যুগে অমন মহাপুরুষ আর কেহ জন্মায় নাই, মৃত্যুর প্রাক্কালে ভক্তগণ যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! আপনার এরূপ কষ্টদায়ক মৃত্যু কেন হইতেছে?"

তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"কষ্ট কিসের বাবা! আমি ত ব্রহ্মময়ীর কোলে শুইয়া আছি, এ চিরশান্তিময় কোলে যন্ত্রণা কোথায়? তোমরা নাকি জগতের লোক, যন্ত্রণা-আরামের একত্ব বুঝ না, তাই দেখিতেছ—আমি যন্ত্রণা পাইতেছি। কিন্তু বাবা, মৃত্যুজনিত আমার কোন যন্ত্রণা নাই।"

আমরা অনেক মহাপুরুষের এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক এবং অপমৃত্যুর কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের যায় আসে কি? তাঁহারা ত জাগতিক লোকের সুনাম-দুর্ণাম, কেহ ভাল বলিবে কি মন্দ বলিবে, ইত্যাদির ভয় করেন না, তবে আমাদের কথায় তাঁহাদের যায় আসে কি? কিন্তু সামান্য লোকের মুখে মহাপ্রভুর নিন্দাসূচক এই সকল অযাচিত গালাগালির বিষয় পাঠ করিয়া প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়াই মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণে তাহার কথার দুই একটী প্রতিবাদ করিলাম মাত্র। নরকের কীট হইয়া অবতার-চরিত্রের দোষ দর্শন করা নিতান্ত অর্ব্বাচিনতার কার্য্য; মহতের সকলি মহৎ জ্ঞান

করিয়া তাঁহার মহত্ত্বের অনুসরণ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। যাহা জানি না বা বুঝি না, তাহার আন্দোলন না করিলে আর কোন দোষ পাইতে হয় না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবতারে সন্দেহ।

ভগবানের দশ অবতারের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের নাম নাই বলিয়া অনেকে তাঁহার অবতারত্বে সন্দেহ করেন, বলেন—"শ্রীচৈতন্য অবতার নহেন, একজন মহাভক্ত।" দশ অবতারের মধ্যে মহাপ্রভুর নাম নাই বলিয়া যে তাঁহাকে অবতার বলিয়া ধরা হইবে না, ইহার কোন কারণ দেখি না। এখানে প্রমাণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতারে নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি ভক্তশিরোমণী শ্রীরাধার প্রেমঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, নব বৃন্দাবন নদীয়ায় নব অবতার গৌরাঙ্গ রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। একাধারে রাধাশ্যাম রূপ ধরিয়া কলির জীবের উদ্ধার জন্য হরিনাম বিতরণ করিবেন। নিমজ্জমান বৈষ্ণবধর্ম্মকে প্রবল করিয়া সরল মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন—ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী; আমরা নানা পুরাণ ও সংহিতায় দেখিতে পাই। তারপর "অবতারাহ্যসংখ্যেয়া" শ্রীভাগবৎ হইতেও আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ অবতার না হইলে সাধারণ জীবের বা মহাপুরুষের এত শক্তি কখন থাকিতে পারে না। একজন দেহধারী সামান্য মানব সমগ্র দেশকে তথা পৃথিবীকে এমন করিয়া মাতাইতে পারে না।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যখন প্রকটাবস্থায় সশরীরে বর্ত্তমান, সেই সময়

হইতেই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি বিগ্রহরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে গৌরাঙ্গ বিগ্রহের পূজার বহুল প্রচার পরিলক্ষিত হয়। আর নৃসিংহ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, কূর্ম্ম, দেবী, বামন, শিব প্রভৃতি পুরাণে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়, অথর্ব্ববেদেও মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে অনেক প্রমান আছে। কুলার্ণব, রুদ্রযামল, বিশ্বসার প্রভৃতি তন্ত্রও বহু প্রমাণে ভগবান শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণা করিতেছেন। এই সকল শাস্ত্রে তাঁহার ধ্যান, মন্ত্র, স্তব ও কবচ পাঠ করিয়া কে বলিতে সাহস করিবে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতার নহেন? ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া যাহা করিয়া থাকেন—যে কার্য্যোদ্ধারের জন্য নারায়ণের অবতার গ্রহণ হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যে তাহার কিছুরই অপ্রতুলতা নাই। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতি নাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপন প্রভৃতি অবতার গ্রহণের যাহা উদ্দেশ্য—শ্রীচৈতন্য অবতারে তাহার কিছুমাত্র ক্রটী হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের সহিত গৌরাঙ্গ অবতারের অনেক সাদৃশ্য বর্ত্তমান। তিনি মুসলমানের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছেন। সাধু ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করিয়া জগাই-মাধাই প্রভৃতি পাষণ্ডগণকে প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মের পথে আনয়ন করিয়া যে মহত্ব বিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যকে অবতার না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। তিনি যে শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ভারতের তখন কি দুর্দ্দিন! হিন্দু-রাজত্বের অবসান—কালের কুটিল চক্রে জীব সমুদয় শ্রীভগবানের মধুর তত্ত্ব ভুলিয়া দারুণ দুঃখসাগরে নিমজ্জমান! ভক্তির মঙ্গলময় পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, জীব পথহারা

পথিকের মত দিগভ্রান্ত, তর্কের শুষ্ক জঞ্জালজালে আবদ্ধ হইয়া মানব যখন উচ্ছৃঙ্খল, বিকৃত মস্তিষ্ক দেশবাসীর প্রতি মুসলমানগণের প্রবল আকর্ষণ, যবন-ধর্ম্মী করিবার জন্য কাজীর ভীষণ আক্রমণে হিন্দু-সমাজ যবন ধ্বস্ত বিধস্ত হইতেছিল, ধর্ম্মভীরু হিন্দুগণ যখন দিশহারা, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দুঃখ-সাগরের অতল জলে পড়িয়া তলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল—ঠিক সেই দারুণ দুর্গতির অবস্থায় বেদপ্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাধন-ভজন জীবকে অবাধে শিক্ষা দান করিবার জন্য, করুণাময় শ্রীভগবান শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতার গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভয় আশ্বাস-বাণী শুনিয়া কাতর-প্রাণ জীবসকল নবজীবনে নববলে বলীয়ান হইয়া, এককালে সমস্ত কষ্ট-কঠোরতা বিস্মৃত হইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সকল জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া তাঁহারই ছায়া শীতল, অমল ধবল পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জুড়াইল, ওষ্ঠাগত তাপিত প্রাণ শীতল করিল। পতিতপাবন দীনতারণ গৌরবরণ গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণকে বুকে ধরিয়া প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া বলিলেন—"জীব। তোমাদিগকে যোগ-যাগ, ধ্যান-ধারণা, ব্রত-উপাসনা প্রভৃতি কিছুই করিতে হইবে না; কৃচ্ছ্রসাধ্য কোন তপস্যার আবশ্যক নাই, কেবল প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের কপাট খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বল—হরি হরি বোল! আমি তোমাদের সকল কষ্ট নষ্ট করিবার জন্য—মর্ত্ত্যভূবনে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য, এই ভুবনমঙ্গল হরিনাম লইয়া আসিয়াছি। নামে জাতিভেদ নাই, পণ্ডিত-মূর্খ নাই, পাপী-তাপী নাই, সক্ষম-অক্ষম নাই, ধনী-দরিদ্র বিচার করিতে হইবে না। সকলেই আইস—এই পবিত্র প্রেম-নীরে অবগাহন করিয়া পবিত্র হৃদয়ে একবার নামগান কর, মনের সমস্ত ময়লা মাটী

বিধৌত হইবে—তোমাদিগকে নিষ্পাপ করিয়া মুক্তি-পথের পথিক করিয়া দিবে। ভগবানের এই অভয় বাণী শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে তাঁহার চরণ সরোজে আশ্রয় লইয়া ধন্য হইল। হরিনামের বিজয় রোলে নদীয়ার গগন-পবন মুখরিত করিয়া আপনি উদ্ধার হইল এবং যাহাকে দেখিল—তাহাকেই সেই জীবনসম্বল হরিধ্বনি করিতে বলিয়া নিষ্পাপ হইবার পন্থা দেখাইয়া দিল।

শ্রীগোরাঙ্গ গৌড়ের নিজস্ব অবতার; শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের জন্য বাঙ্গালা দেশ ধন্য ও বরেণ্য হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য অবতার হিন্দুর নিজস্ব হইলেও, শ্রীচৈতন্য অবতারের জন্য বঙ্গ দেশ যত গৌরব করিতে পারিবে—তত আর কোন অবতারের জন্য পারিবে না। শ্রীচৈতন্যের অবতারে—তাই বাঙ্গালার বক্ষ এত পবিত্র এবং বাঙ্গালী এত বুদ্ধিজীবী ও মেধা সম্পন্ন। তাঁহারাই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী বিদ্যাধনে এত ধনবান—শিক্ষাগুণে এত গুণবান, এইজন্য বাঙ্গালী বিদ্যা-বিভবে এত বৈভবশালী। আর্য্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত-মেধাবী-মনীষী বুঝি বাঙ্গালার মত অধুনা আর কোথাও জন্মে নাই।

শ্রীচৈতন্য যে অবতার—ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। তাহা এস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিনা বলিয়া সে বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। ভগবান শ্রীচৈতন্য অবতার গ্রহণ করিয়া জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন—কলির জীবের পক্ষে কৃচ্ছ সাধ্য সাধনার আবশ্যক নাই; কেবল শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই ভব-বন্ধন মুক্তির প্রধান উপায়!

সময় থাক আর নাই থাক, শুচি হও আর নাই হও, যখন তখন

হেলায় বা অশ্রদ্ধায়ও নাম করিও। নামের একটা মাহাত্ম্য আছে—একটা পবিত্রকারিণী, জীবনিস্তারিণী শক্তি আছে; নাম করিতে করিতে, রসনায় এই মধুর হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে জীবের এমন একটা অবস্থা আপনাপনি আসিবে—যখন বিষয় বিষ বোধ হইবে—অহঙ্কার-অভিমান দূরে পালাইবে, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান হইয়া হৃদয়ে ব্রহ্মভাবের উদয় হইয়া আপন-পর ভেদাভেদ ঘুচিয়া যাইবে। তখন কৃষ্ণময় জগৎ দেখিয়া জীব "শিবোহং শিবোহং" বলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া আত্মানন্দ উপভোগ করিবে!

হরিনাম সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য। নামে রুচি, জীবে দয়া এবং সাধুসঙ্গ করিতে পারিলেই, পরকাল-নিস্তারের আর কোনও ভাবনা থাকিবে না। তাই প্রভু আপনা ভুলিয়া দিশাহারা হইয়া পাগলের মত নামগানে বিভোর হইতেন; জাতীয়তা ভুলিয়া সর্ব্বজীবে কোল দিতেন—সকলের সন্তাপ নাশের জন্য প্রাণপণ করিতেও ছাড়িতেন না। আর সাধুসঙ্গ ত তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল; প্রতিদিন শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতির আঙ্গিনায় সাধুগণ সঙ্গে নানারঙ্গে কীর্ত্তন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন এবং নাম যে নামী অপেক্ষাও মহৎ—তাই দেখাইবার জন্য আবার নাম শুনিয়াই চৈতন্য লাভ করিতেন। প্রভুর এমন মধুর চরিত্র, তাঁহার এমন পরকীয়া প্রেম—তাঁহার আপনাহারা হইয়া এমন নাম সংকীর্ত্তন—বাঙ্গালী! তুমি মনেপ্রাণে অঙ্কিত কর—তাহা হইলে আর জীবনে কোন ভয়-ভাবনা থাকিবে না, অবহেলায় ভবের ভাবনা এড়াইয়া অন্তে ভগবান শ্রীচৈতন্যের পদে লীন হইয়া জীবনের সকল জ্বালা জুড়াইবে।

ভক্তগণ তাই এখনও ডাকিয়া ডাকিয়া গাহিয়া থাকেন :—

কীর্ত্তন।

ওকে পাগলের পারা হ'য়ে দিশে হারা
সুরধনী কূল দিয়ে যায়।
আয় আয় বলি দিয়ে করতালি
বলে—যত বোঝা আছে নিয়ে আয়॥

কেঁদে কেঁদে বুঝি আঁখি রাঙ্গা রাঙ্গা,
ডেকে ডেকে বুঝি গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
গোরা গোরা বলে নাচে বাহু তুলে
ক্ষণেকে চেতন ক্ষণে হারায়।

ধূলি মাথা গায় ধেই ধেই নাচে,
হাসে কভু কভু কেঁদে প্রেম যাচে,
বলে—ভয় নাই এল রে কানাই
বলাইয়ের সাথে নদীয়ায়॥

সুধাব না কারেও জাতি নাম ধাম,
লব পাপ তাপ দিব হরিনাম,
গোলকের ধন তোদেরই কারণ
বিলাতে এনেছি নদীয়ায়।

আয় আয় তোরা চোখে দেখিবি রে,
জগন্নাথ আজ ফেরে দ্বারে দ্বারে,
আয় হরি ব'লে ফেরাবি রে তাঁরে
হরি হরি হরি বল সবাই॥

পরিশিষ্ট।

আমাদের পুস্তক শেষ হইল। শ্রীচৈতন্যের জীবনের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমাদের দুই একটী কথা বলিবার আছে। আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শিব ও শক্তির প্রতি বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ যত বিদ্বেষী, শাক্তগণ তত নহেন। শক্তির প্রতি বিদ্বেষ করিয়া অনেকানেক বৈষ্ণব মহাপ্রভু "কাটা" না বলিয়া "বনান" বলেন, কারণ শক্তির নিকট পশু ছেদন হয় বলিয়া তাহারা বিদ্বেষ ভাবে ঐ কথা বলিয়া থাকেন। এক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শক্তি ও শিব-বিদ্বেষী ছিলেন না, তদ্বিষয়ে কয়েকটী প্রমাণ দেখাইয়া আমরা এই পুস্তকের উপসংহার করিব।

শাক্তেরা বৈষ্ণবের প্রতি তত দ্বেষ করেন না, যত বৈষ্ণবেরা শাক্তের প্রতি করিয়া থাকেন। উপরে একথা বলা হইয়াছে। সকল দ্বিজ-জাতিই সংস্কারানুসারে শাক্ত হইয়াও বিষ্ণুপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। যে দ্বিজ বিষ্ণুপূজায় বিরত, সে দ্বিজ নামের অযোগ্য; কারণ, বিষ্ণুপূজাই দ্বিজত্বের লক্ষণ। অনেক শাক্ত-সাধক প্রাণ খুলিয়া গাহিয়াছেন:—"মন ক'র না দ্বেষাদ্বেষী, যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।" কিন্তু বৈষ্ণবগণের মধ্যে এরূপ বিদ্বেষ-বিহীন সঙ্গীত একটীও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শক্তি ও শিব-বিদ্বেষী ছিলেন না; পরন্তু তিনি বিশিষ্টরূপে

তাঁহাদেব ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার, যিনি পূর্ণ তাহাতে বিদ্বেষভাব থাকিতে পাবে না। তিনি শ্রীরাধার জন্যই চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তারপর স্ত্রীত্ব, পুংত্ব প্রত্যেক জীবেই বর্ত্তমান, নতুবা জীবদেহ গঠিতই হইতে পাবে না। এমত অবস্থায় শচীনন্দন চৈতন্যদেব যে শক্তি মানিতেন না, তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আগে জননী—তাবপব জনক, আগে জননীর প্রাণান্তকর পরিশ্রমে জীব জীবিত ও পবিবর্দ্ধিত হয়—তারপর পিতার আদব-ভালবাসায় পবিপুষ্টি লাভ করে। এ অবস্থায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শক্তি মানিতেন না—তাহা আমরা কখনই স্বীকাব করিতে পাবি না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা ও চরিত্র সম্বলিত যেসকল পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই তাঁহার ভক্তগণ প্রত্যক্ষ কবিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে শ্রীচৈতন্যদেবকে কখনই শিব ও শক্তিদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে সকল দেবতারই আবিভার হইত; রাধাভাব ত ক্ষণে ক্ষণেই হইত, কিন্তু তাঁহাতে যে মাতৃভাবেবও আবেশ হইত—চৈতন্যভাগবতে তাহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। একদিন প্রভুর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্নের গৃহে তাঁহার দেহে মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই বিষয় চৈতন্যভাগবত গাহিতেছেন:—

জগৎ জননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥
আদ্যাশক্তিবেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ॥

প্রভু আজ আত্মাশক্তি মহামায়া রূপে সিংহাসনে সমাসীন; আর ভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রভুর আত্মাশক্তি জগজ্জননী রূপের নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান। ইহাতে প্রভুকে আমরা শক্তিদ্বেষী বলিব—না, শাক্ত-ভক্ত বলিব? তারপর তাঁহার শিবভক্তির প্রমাণ এই:—প্রভু যখন ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন—পথে শ্রীভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ভগবান ভূতনাথকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন:—

নিপত্য ভূমৌ প্রণমাম দেবঃ শিবালয়ং শূলবিচিত্রচূড়ম্।

পরদিন প্রভু ভগবান সদাশিবের স্তব পাঠ করিয়া পূজা করিলেন, ভুবনেশ্বরের সেবাইতগণ তাঁহাকে গন্ধমাল্য দ্বারা সুশোভিত করিলেন। প্রভু বিন্দু-সরোবরে স্নান করিয়া মনে মনে মহাদেবের মহাপ্রসাদ ভোজনের চিন্তা করিবামাত্র, পাণ্ডাগণ তাঁহাকে মহাপ্রসাদ আনিয়া দিলেন। চৈতন্যদেব সেই অমৃতময় মহাপ্রসাদ সহচরগণের সহিত ভোজন করিলেন। ইহাতে বেশ প্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিব বা শক্তির বিদ্বেষী ছিলেন না।

"ভক্ত হ'তে হ'লে আগে শাক্ত হ'তে হয়।" তবে শাক্ত মানে—কেবল মদ্য-মাংসের প্রিয় অনাচারী শাক্ত নহে; আর জাতি হারাইয়া যে কোন জাতীয় একটী বৈষ্ণবী সঙ্গিনী করিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না। যে প্রকৃত ভক্ত—সেই শাক্ত। শক্তি না পাইলে ভক্তিতে হৃদয় ভরিবে কোথা হইতে? মা যে বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন, এইজন্য তাঁহার নাম—"বিষ্ণুভক্তিপ্রদা"। আর বৈষ্ণব-ভাব সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ।

যে কোন উপাসক হউন না কেন—নদী যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া একমাত্র সাগবেই আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ সকল উপাসকই শেষে নিষ্কাম ব্রহ্মভাবেব ভাবুক হইয়া বৈষ্ণব ভাবযুক্ত না হইলে, সাত্বিক ভাবে অনুপ্রানিত হইয়া জগৎ ব্রহ্মময় না দেখিলে মুক্তি-পথের পথিক হইতে পাবে না। তুমি শাক্তই হও, বৈষ্ণবই হও আর শৈব গানপত্যই হও—জীবেব শেষ ভাব বৈষ্ণবভাব। শেষে এই ভাব সাধক মাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন বা এই ভাবের ভাবুক হইয়া থাকেন, নতুবা মুক্তিব অন্য উপায় নাই। যে শাক্ত—সেই বৈষ্ণব, যে বৈষ্ণব—সেই শাক্ত। শিবের গুরু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণের গুরু—শিব।

ভগবান চৈতন্যদেব সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সতত ভক্তিভাবেই বিভোর থাকিতেন, এইজন্য সকল বিধিনিষেধেব অতীত হইয়া তিনি কখন কি করিতেন, তাহাব স্থিরতা ছিল না। তিনি সমাজ বহির্ভূত অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাই বলিয়া সকল বৈষ্ণবই যে তাঁহার কার্য্যের অনুকবণ করিবেন—তাহা হইতে পারে না। ভগবান অবতাব রূপে অবতীর্ণ হইয়া যাহা করিবেন, আর একজন সামান্য অধিকারীও তাহা কবিবে—ইহা কখনও সঙ্গত নহে। এইজন্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের একজন প্রধান শিষ্য হইলেও সমাজ-বন্ধনের জন্য তিনি সেই সময় হইতে বহু স্মৃতি-শাস্ত্র প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। যাহা অদ্যাবধি আমাদের সমাজে প্রচলিত হইয়া সমাজ-বন্ধন অটুট রাখিয়াছে।

আজ চৈতন্যদেব নাই, তিনি দেশকে প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লীলাবসান কবিয়াছেন। আছে তাঁহার ভক্ত প্রেমোমত্ত বৈষ্ণবগণ, আছে তাঁহার সাধের লীলাক্ষেত্র গৌডদেশ; যাহার প্রত্যেক

ধূলিকণা তাঁহার পবিত্র পদরজে পবিত্রীকৃত হইয়া স্বর্গের সুষুমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বৈষ্ণবগণ এখনও তাঁহার সুধামাখা প্রেমময় হরিনাম গাহিয়া তাঁহারাই প্রেমভাবে উন্মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তনানন্দে দেশ মাতাইতেছেন। গৌরাঙ্গের প্রচারিত সে নামগান প্রকৃত ভক্তের কণ্ঠোচ্চারিত হইয়া যখন পাপী-তাপীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়—যখনই সেই মধুর নাম শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া মর্ম্মস্পর্শ করে, তখনই জীব কি এক সু..নন্দ উপভোগ করিয়া জীবন সার্থক করে—কি এক তীব্র প্রেমতরঙ্গে স্নাত হইয়া প্রাণ মন পবিত্র করে, তাহা লেখনী দ্বারা বিবৃত করা অসম্ভব।

আমারা কয়েকজন সাধক-শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাপ্রভুর মুখে প্রভুর লীলা-রহস্য, তাঁহার অবতার তত্ত্ব ও প্রাণমন বিমোহন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, তাঁহারা প্রকৃত মুক্ত-পুরুষ; প্রকৃত বৈষ্ণবভাব তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈষ্ণবভাব যে জীবের তুরীয় অবস্থা এবং মুক্তির উপায়—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহারা প্রকৃত বৈষ্ণব তাহারা সেবা-ধর্ম্মের অনুরাগী এবং ত্যাগী; তাঁহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান নাই। আর যাহারা কেবল কথায় বৈষ্ণব—জাতিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারাই সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভোর।

শ্রীচৈতন্য লীলা অবসান করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শিখিয়াইয়া গিয়াছেন—জীব মাত্রেই শিব, সকলেই এক অভেদাত্মা; কাহারও মধ্যে কিছু পার্থক্য নাই। আদ্যাশক্তি জগতের মাতা এবং আমিই ব্রহ্মপরাৎপর জগতের পিতা। লীলা বিস্তারের জন্য—জীবের উদ্ধারের জন্য, সময়ে সময়ে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। আমি ছাড়া

জগতে কিছু নাই ; এই মায়ীক জগতে শক্তির রূপে আমারই বিকাশ। অতএব—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষায়ষ্যামী মা শুচঃ॥

ভাই সকল! ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব কলীর জীবের মুক্তির জন্য—অধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভের জন্য বলিয়া গিয়াছেন—"জীব! কোন চিন্তা করিও না, পবকালের সম্বল হরিধ্বনি করিয়া আনন্দে মত্ত হও—সাত্ত্বিকভাবে কেবল হরিনামে প্রাণ মোহিত কর, তাহা হইলে উদ্ধারের জন্য কোন ভাবনা করিতে হইবে না। কলিব জীব! অক্ষম অল্পায়ু বলিয়া তোমাদের ভাবনার কোন কারণ নাই। যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কষ্টসাধ্য বা ব্যয় সাপেক্ষ্য কোন অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই ; কেবল নাম কর—কেবল নামগানে চিত্ত সংযোগ কর। একমাত্র নামই তোমাদিগকে সকল পাপ-তাপ যন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত করিয়া, তোমাদের অভিপ্সিত মোক্ষধাম বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়া সকল কুণ্ঠাব হস্ত হইতে মুক্ত দান করিবে। প্রভু আমাদিগকে প্রাণেব আবেগে নাম গান কবিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, শান্তিরেব শান্তি।

ওঁ যদক্ষব পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥

সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

উপাদেয় গ্রন্থসমূহ।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ

১। [illegible]	১।০	২। [illegible]	[illegible]
৩। [illegible]	১॥০	৪। [illegible]	[illegible]
৫। [illegible]	[illegible]	৬। [illegible]	[illegible]
৭। [illegible]	॥০	৮। [illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মাধবী-মহিমা	।০
কর্ম্ম বিপাক	।০
[illegible]	[illegible]
সংসার [illegible]	[illegible]
নির্ব্বাণ	১৷০
[illegible]	[illegible]
[illegible] উপন্যাস	।০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গাদাস লাইব্রেরী।

১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।